ওয়াসিকা নুযহাত

বৃষ্টি মহল

বৃষ্টিমহল

ওয়াসিকা নুযহাত

বই বাজার

উৎসর্গ

পৃথিবীর সব
বন্ধু পাগল মানুষদের

এখন দুপুর। মাঘ মাসের মিষ্টি রোদে ডুবে আছে শহরতলী। রাস্তার মোড়ের টঙের চায়ের দোকানে বসে আছে একদল যুবক। তাদের প্রত্যেকের হাতে চায়ের কাপ। একটি রিকশা বেরিয়ে আসতে দেখা গেল চায়ের দোকানের পাশের এঁদো ঘুপসি গলির ভেতর থেকে। রিকশায় তিনটি মেয়ে বসা। মেয়েগুলোকে দেখে যুবকদের একজন বলে উঠল,

'তিনজনে এক রিকশায়? আমার বাসায় তিনটা গাড়ি, বললে পাঠায় দিতাম!' কথাটা শুনতে পেয়ে যে মেয়েটি রিকশাওয়ালাকে বলল, 'চাচা একটু থামেন তো!'

তার নাম অমৃতা চৌধুরী। নামটা তার নিজের দেওয়া। বাপ মায়ের দেওয়া নাম হলো নূরে নাজনীন নিপা। এ নাম তার পছন্দ নয় বলে নিজের নাম পাল্টে দিয়েছে সে। দূর থেকে দেখলে অমৃতাকে মনে হবে আঠারো কি উনিশ বছর বয়সী হ্যাংলা পাতলা এক ছেলে। উচ্চতায় পাঁচ ফিট পাঁচ। ছোট চোখ, ছোট নাক, ফরসা বিড়ালের মতো আদুরে চেহারা। বয়কাট চুল, ঢোলা শার্ট আর জিন্স। এই হলো অমৃতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স। ঢাকা জজ কোর্টে ল প্র্যাকটিস করছে।

অমৃতার পাশে বসা মেয়েটি চাপা গলায় বলে উঠল, 'রিকশা থামাবে কেন? আরে চাচা চলেন তো, ওর কথা শুনবেন না।'

এ মেয়েটির নাম হৃদিতা বিনতে জামিল। উচ্চতা পাঁচ ফিট তিন। গায়ের রং শ্যামলা, বড় চোখ, মাঝারি নাক। তাছাড়া বন্ধুরা বলে হঠাৎ তাকে পাশ থেকে হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত নায়িকা কাজলের মতো দেখতে লাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ করছে। পাশাপাশি খুঁজছে চাকরি জুতসই পাচ্ছে না।

বুড়ো রিকশাওয়ালাটিকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল। রিকশা থামাবে কী থামাবে না এ নিয়ে তিনি একটু দোলাচলে পড়ে গেছেন। ছোকরাগুলো ততক্ষণে গান জুড়ে দিয়েছে, 'ওরে সালেকা, ওরে মালেকা, ওরে ফুলবানু পারলি না বাঁচাতে...'

সেই গান শুনে রিকশায় বসে থাকা তৃতীয় মেয়েটি মুখ বাঁকিয়ে মন্তব্য করল, 'এইসব কী? ফালতু পোলাপাইন কতকগুলো।'

এ হলো বিভাবরী ভট্টাচার্য। উচ্চতা পাঁচ ফিট চার। মুখের ত্বক মসৃণ এবং লাবণ্যময়। প্রতিমার মতো টানা চোখ, খাড়া নাক, ঢেউ খেলানো চুল। ভারি সুন্দর নাচতে জানে সে। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স শেষ বর্ষে পড়ছে।

অমৃতা কারও কথা কানে নিল না। রিকশাওয়ালাকে বাধ্য করল রিকশা থামাতে। তারপর টুপ করে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে চায়ের দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল। নবাবি চালে দোকানদারকে বলল, 'মামা দুইটা বেনসন দাও তো।'

ছেলেগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল অমৃতাকে। তার গায়ে ঢিলা চেক শার্ট। জিন্সের প্যান্ট। কাঁধে ব্যাগপ্যাক। বয়কাট চুল।

কেউ একজন বলল, 'মাই গড এইডা ছেলে নাকি মেয়ে?'

আরেকটা গলা বলল, 'হিজড়া মনে হয়!'

বাকি কণ্ঠগুলো হো হো করে হেসে উঠল। অমৃতা দোকানদারের হাত থেকে সিগারেট দুটো নিয়ে ছোকরাগুলোর একজনকে বলল, 'ব্রাদার, লাইটার হবে?'

হাসিতে মজে থাকা কণ্ঠগুলো একটু হোঁচট খেল। হতচকিতভাবে একজন আরেকজনের মুখের দিকে চাইল। তারপর একজন খুব অনিচ্ছার সাথে একটা লাইটার এগিয়ে দিলো অমৃতার দিকে। অমৃতা সেটা হাতে নিয়ে একটু বেশি সময় খরচ করেই সিগারেট ধরাল। তার চোয়াল শক্ত চোখের দৃষ্টি স্থির।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে নিরুদ্বেগ গলায় বলল, 'কার বাসায় তিনটা গাড়ি, ভাই?'

কোঁকড়া চুলো হাড়গিলের মতো চেহারার একটা ছেলে একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বলল, 'আমার বাসায়। কেন লাগবে নাকি?'

'ওহ! জুয়েল ভাইকে তো চেনা আছে আপনার, তাই না?' বলে অমৃতা ছেলেটার দিকে উদাস চাউনি দিলো।

নামটা শোনা মাত্র একটা চাপা উত্তেজনা খেলা করে গেল দলটার মাঝে। একজন শুকনো গলায় বলল, 'এ পাড়ার জুয়েল ভাই?'

'হুম'

'কেন?'

'জুয়েল আমার ফুপাতো ভাই। ভাবছিলাম আপনারা যে এতটা দয়ালু, আমাদের লিফট দিতে চেয়েছেন, আর আমাকে দেখে আপনাদের হিজড়া মনে হয়েছে এ খবরগুলো জুয়েল ভাইকে তো দেওয়াই লাগবে, কী বলেন?'

কোঁকড়া চুলের ছেলেটার মুখ ঝুলে গেল, গম্ভীর গলায় বলল, 'ইয়ে... ওটা জাস্ট একটা দুষ্টুমি ছিল, ভাইকে বলার মতো কিছু না।'

অমৃতা দায়সারাভাবে বলল, 'আমার ভাইকে আমি কী বলব তা নিশ্চয়ই আপনি শিখিয়ে দেবেন না?' আর কথা না বাড়িয়ে খুব দাপট নিয়ে দুলকি চালে হেঁটে রিকশায় ওঠে বসল অমৃতা।

ছেলেগুলো প্রায় মিনিট দুয়েক সময় হকচকানো চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

হৃদি প্রশ্ন করল, 'জুয়েল ভাইটা কে?'

'এ পাড়ার মাস্তান বলতে পারিস।'

'তোর ফুপাতো ভাই এ পাড়ার মাস্তান, এ তথ্যটাতো আগে জানা ছিল না!'

'আরে না, চাপা মারলাম, জুয়েল আমার ফুপাতো ভাইটাই কিছু না। আকাশের পরিচিত, দেখি আকাশকে একটু জানিয়ে রাখব ব্যাপারটা।'

'তুই পারিস ও বটে! এ রকম খোলা রাস্তায় সবার সামনে সিগারেট হাতে নিয়ে এ কাণ্ডটা করার কোনো দরকার ছিল না। কেউ দেখে ফেললে কী ভাবত বলত?' বিভা বলল।

অমৃতা তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'দ্যাখ বিভা, কে কী ভাবল, কী দেখল, কী হতে পারত, এসব ভেবে চুপচাপ বসে থাকার দিন শেষ হয়ে এসেছে। এসব বখাইট্টা পোলাপাইন সারাটা জনম ধইরা আমগো লগে মজা নিব আর আমরা ভয়ে চুপ কইরা পালায় যামু সে দিন শেষ। হারামজাদাগুলোর বুঝাতে হবে যে আমরা মেয়েরা কোনো মজা নেয়ার বস্তু না! আর ওই অ্যাসহোলটা আমারে হিজড়া বলছে, শুনছস না?'

হৃদি আর বিভা চুপ করে গেল। ওরা জানে অমৃতার সাথে এসব নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। সে নির্ভীক, সাহসী আবার একই সাথে কিছুটা উড়নচণ্ডী আর পাগলাটে স্বভাবের। বাল্যকাল থেকে সে কোনো ধরনের অন্যায়কে মেনে নিতে শেখেনি। তার কোনো ভাই নেই। আছে একটি মাত্র ছোট বোন। ছিমছাম ছোট পরিবারটিতে অমৃতা বেড়ে উঠছে অবাধ স্বাধীনতা আর দৃঢ় মূল্যবোধ নিয়ে। কোনো মেয়েলি বেড়ি তার পায়ে বাঁধা হয়নি কখনো।

কফিহাউজের দোতলার একটা টেবিলে আকাশকে দেখা গেল। আকাশের পুরো নাম ইফতেখার আকাশ। উচ্চতা পাঁচ ফিট নয়। গায়ের রং হৃদির মতোই শ্যামলা। লম্বাটে মুখ। তীক্ষ্ণ নাক। চোয়ালের দিকটা একটু উঁচু। চেহারায় একটা ভদ্র ছেলে টাইপ ছাপ আঁকা আছে। চোখের পাপড়ি বড়। আকাশ হাসলে ওর চোখ হাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স শেষ করে বর্তমানে বেকার। ভালোবাসে ক্রিকেট, খেলেও দারুণ। জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখত এককালে। সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি বলে এখন কিছুটা হতাশ।

বিভাদের দেখে আকাশ অবাক হয়ে বলল, 'তোরা এখানে?'

অমৃতাও অবাক হবার ভান করল, 'তুই এখানে কী করিস?'

অমৃতার অভিনয়টা একটু হাস্যকর হয়ে গেল। হৃদি হাসতে হাসতে বলল, 'তুই এইটা কী করলি? এত বাজে অভিনয় তোর, আল্লাহ্!'

বিভা ওদের অভিনয়ে মনে মনে হাসল। আজকে তার জন্মদিন। সে জানে বন্ধুরা আগে থেকে প্ল্যান করেই সব একত্রিত হয়েছে। অন্য বন্ধুরাও হয়তো কিছুক্ষণের মাঝেই চলে আসবে। এখন ভাব দেখানো হচ্ছে যে কেউ কিচ্ছু জানে না।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অমৃতা আকাশকে বলল, 'বিভাদের এলাকার জুয়েল ভাই তোর কী যেন হয়?'

'আমার কাজিনের ফ্রেন্ড, কেন?'

অমৃতা পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে খুলে বলল আকাশকে। আকাশ শুনেটুনে বলল, 'তোরে এত কামড়ায় ক্যান? এত দাদাগিরি দেখাইতে যাস কেন?'

অমৃতা ঝাঁঝওয়ালা গলায় বলল, 'আমার জায়গায় তুই হইলে কী করতি?'

'আমার কথা আলাদা! তোরা তিনটা মেয়ে একা বাইর হইছস, মাথা নিচু কইরা রাস্তা দিয়া চলাফেরা করবি, অত বাহাদুরি কীসের?'

অমৃতা গম্ভীর মুখে বলল, 'আকাশ তুই জানিস না এ ধরনের কথাবার্তা আমি কতটা হেইট করি?'

ঠিক সে মুহূর্তে সামির আবির্ভাব। এসেই সে তীরের মতো কথাগুলো ছুঁড়ে দিলো অমৃতার দিকে, 'আমাদের অমৃতা কোনো পুরুষমানুষের চেয়ে কম কীসে? অমৃতাকে মেয়ে ভাবার কোনো কারণ নাই!'

ওর 'কোনো কারণ নাই' কথাটার মাঝে বুঝি কোনো একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল, যেটা বুঝতে পেরে আকাশ হো হো করে হেসে ফেলল।

অমৃতা ভ্রু কুঁচকে বলল, 'মজা নেও?'

সামি খুব ইনোসেন্ট একটা চেহারা বানিয়ে বলল, 'মজা নিলাম কই দোস্ত? সত্যি কথা বললাম!'

সামিউল হক গৌরবর্ণ যুবক। মাথার চুল কোঁকড়া। অতিরিক্ত সিগারেট খাবার অভ্যাস আছে বলে ঠোঁটের রং কালচে। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ পাশ করেছে। বর্তমানে বেকার। বড়লোক এবং পলিটিশিয়ান বাবার একমাত্র ছেলে। গেল মাসে তার বাবা ইলেকশনে জিতে এমপি হয়েছেন।

অমৃতা বলল, 'তাহলে এইটার মানে কী, যে অমৃতাকে মেয়ে ভাবার কোনো কারণ নাই? বল এটার মানে কী? তুই তো বলতে পারতিস যে অমৃতাকে দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নাই। আমি তো বলি নাই কখনো যে আমি মেয়ে না, আমি ছেলে!'

সামি বলল, 'না তুই তো বলিসনি, কিন্তু মনে মনে যে তুই খুব ছেলে হবার স্বপ্ন দেখিস সেটা আমরা জানি।'

অমৃতা একটু ভারী গলায় বলল, 'এসব জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন আমি দুই চোখে দেখতে পারি না।'

বিভা এবার ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'আজব! আমার বার্থডে আজকে, কোথায় তোমরা নেচে গেয়ে ফুর্তি করে আমার মনোরঞ্জন করবা, তা না, ঝগড়াঝাঁটি লাগায় দিচ্ছ।'

আকাশ ওঠে পড়ল, 'একটু অপেক্ষা কর আমি আসতেছি।'

'কই যাস?'

'আরে দাঁড়া। এত কথা কস ক্যান?'

আকাশ ওঠে গেল।

আকাশের সাথে অমৃতাদের বন্ধুত্বটা হয়েছিল বেশ নাটকীয়ভাবে। ওরা তখন উচ্চ মাধ্যমিকে ১ম বর্ষের ছাত্রী। আকাশ ছিল একেবারেই শান্তশিষ্ট গোবেচারা ধরনের ছেলে। তবে কিছু একটা ছিল ওর ভেতরে যা ভিড়ের মাঝে খুব সহজেই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিত। মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাত না। বিভা, হৃদিদের মতো সুন্দরী মেয়েদের দিকে সব ছেলেরাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত, মরিয়া হয়ে ফোন নম্বর চাইত। এসব ছ্যাঁচড়া প্রকৃতির স্বভাব আকাশের মধ্যে একেবারেই ছিল না।

একদিন কলেজ শেষে আড্ডায় আকাশের কথা ওঠে আসল।

বিভা বলল, 'ভাই আমার তো মনে হয় পুরা কলেজে একটাই মাত্র জাতের ছেলে আছে।'

'কোনটা?' অমৃতার প্রশ্ন। অমৃতার তখন ক্লাসের সবকটা ছেলেকেই মোটামুটি চেনা।

'ওই যে, আকাশ'।

হৃদি সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল, 'আসলেই! আমারতো অনেক ভাল্লাগে, মানে কী জানি একটা আছে!'

বিভা ফিচেল হেসে বলল, 'আমারও তো সেরকম লাগে!'

অমৃতাও চুপ করে থাকল না, 'হুম আমারও প্রথম দিনই অনেক গাটস আছে বলে মনে হইছে, চল নেক্সট দিন কথা বলি।'

'আরে না! মাথা খারাপ!' হৃদি আর বিভা দুজনই চমকে উঠল।

'কেন? অমন হিন্দি সিরিয়ালের গৃহবধূর মতো চমকে উঠলি কেন? এটা এমন কিছু না, তোদের সতীত্ব যাবে না। জাস্ট বলব, আমরা তার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই।'

হৃদি ঠোঁট উল্টে ঠাট্টার সুরে বলল, 'ধুর, এইটা কিছু হইল, আমি তো ভাবলাম, গিয়া বলি আমরা তোমার সাথে প্রেম করতে চাই।'

বিভা বলল, 'না, আমি একাই যামু কথা কইতে, গিয়া বলমু, যে ওই পোলা আমি তোমার গার্লফ্রেন্ড হইতে চাই, রাজি?'

অমৃতা বলল, 'তাহলে আমি কেন বাদ থাকব?'

'না না, তোরে নিমু না, আমার আর হৃদির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে।'

অমৃতাও নাছোড়বান্দা। সে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলো, 'অসম্ভব! আমার ভাগ আমি ছাড়ব না! তোমরা এভাবে আমাকে ঠকাতে পার না!'

পরে অবশ্য অমৃতা বলেছিল, 'যা তোদেরকে দিয়া দিলাম, ভাগাভাগি কইরা নিস, মিলামিশা থাকিস, আমার প্রেমট্রেম করার শখ নাই। আর তাছাড়া আমার মতো টমবয়ের সাথে ও প্রেম করতেও চাইব না।'

এসব ছেলেমানুষি কথাবার্তা কখনো আকাশের কান পর্যন্ত যায়নি। যাওয়ার কথাও না। কৈশোরের সেসব অনুভূতির বিন্দুমাত্র রেশও কারো মনের মাঝে এখন নেই। তবুও স্মৃতিগুলো ঠিক ঠিক মনের ডাইরিতে দিন তারিখসহ জমা হয়ে থাকে। আজ যেমন বিভার মনে পড়ছে এ মাঘ মাসের মিঠা রোদ্দুরের দুপুরে

কফিহাউজের জানালায় চোখ রেখে, আকাশের সাথে প্রথম কথা হওয়ার দিনটা

অমৃতাটা যে কী পাগল আর কী ভীষণ ছেলেমানুষ ছিল! কলেজ শেষের এক বিকেলে হুট করে একটা কাণ্ড করে বসল। আকাশকে ডেকে বলল,

'এই ছেলে, শুনো?'

আকাশ অবাক।

'জি বলুন!'

অমৃতা গলাটা খাদে নামিয়ে বলল, 'ইয়ে... লাইটার হবে?'

আকাশ একটু ভড়কে গেল। ঢিলাঢালা শার্ট, জিন্সের প্যান্ট আর বয়কাট চুলের ভীষণ স্মার্ট দেখতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল,

'জি না, আমি সিগারেট খাই না।'

অমৃতার মুখখানা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বিড়বিড় করে সে বলল, 'দূর শালা! মাদিপোলা কোথাকার! আমি সিগারেট খাই না! তাহলে আর কী, যাও বাবু, বাসায় গিয়ে দুদু খাও, বার্লি খাও! সিগারেটের উছিলায় আলাপ জমাইতে চাইলাম, সে রাস্তাও দিলি বন্ধ কইরা।'

আকাশ অমৃতার বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, 'কিছু বললেন?'

অমৃতা মুখে জোর করে একটা টানটান হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বলল, 'বলছিলাম সিগারেট খাও না, বেশ ভালো ব্যাপারটা, গুড হ্যাবিট।'

'আর কিছু জানার ছিল?' খানিকটা বিব্রত গলায় প্রশ্ন করল আকাশ। 'তুমি কি মোহাম্মদপুর থাকো?'

'জি।'

'হুম আমার বাসাও ওইদিকেই, সেদিন তোমারে দেখলাম তো, তাই ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি।'

'ও আচ্ছা!' আকাশের দায়সারা উত্তর।

অমৃতা হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'বাই দ্যা ওয়ে, তুমি কি মেয়েদের হেট করো?'

আকাশ এবারে একেবারে আকাশ থেকেই পড়ল, 'সে কী! কেন? হেট করব কেন?'

'না মানে, কখনো কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে দেখিনি তো তাই!'

'ওহ! না না সেরকম কিছুই না, আমি জাস্ট... মানে আমার মেয়ে বন্ধু খুব

কম, হয়ে ওঠেনি এখনো, আর খুব একটা মিশতেও পারি না, এটাই!'

অমৃতা তালে তাল মিলিয়ে বেশ আলাপ জমানোর ঢঙে বলল, 'আমারও।'

আকাশ অবাক 'তোমারও?'

'হুম, মানে আমারও মেয়ে বন্ধু খুবই কম, মেয়েদের সাথে আমি মেলামেশা খুব কম করি, মেয়েদের আড্ডায় আসলে শাড়ি, গয়না আর বয়ফ্রেন্ডের গল্প ছাড়া আর কিছুই নেই, খুব বোরিং! রাইট?'

আকাশ বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে কোনো রকমে বলল, 'রাইট।'

অমৃতার খুব কাছেই চটপটির গাড়ির পাশে হৃদি আর বিভা ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিল। হৃদি জ্বলে উঠে বিভাকে বলল, 'দেখেছিস? ছেমড়ি নিজেই লাইন মারতাছে, আমরা কিন্তু সিনেই নাই। ও ভুইলাই গেছে আমাদেরকে!

বিভা গলা মেলাল, 'আসলেই, কী পরিমাণ ফাজিলের ফাজিল, ও নাকি মেয়েদের হেট করে। তাইলে আমরা কী? আমরা কি পোলা? আমরা কি পানিতে ভাইসা আসছি?'

'আরে ওইটা তো চাপা মারছে, ভাব নেওয়ার জন্য, তবে এটা ঠিক ওর মেয়ে ফ্রেন্ড বলতে আমরা দুজনই শুধু, বাট আমার কথা হলো ফ্রেন্ডশিপ কর আর প্রেম কর, যাই কর না কেন, ডিল হইছে আমাদের তিনজনের মধ্যে, যা করব তিনজন এক সাথে করব, তুই বেটি একা একা লাইন মারবি কেন?'

এদিকে অমৃতা তখন বোকার মতো হাসছিল। একসময় খুব বিজ্ঞ গলায় বলে ফেলল, 'আমরা তাহলে বন্ধু হতেই পারি!'

প্রথমটায় আকাশ নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না, বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী বললে?'

অমৃতা হাসার চেষ্টা করল, 'না মানে বলছিলাম, আমরা তো বন্ধু হতেই পারি, তাই না?'

আকাশ হেসে ফেলল, 'শিওর, উই ক্যান বি ফ্রেন্ডস।

অমৃতা লাফিয়ে ওঠে বাচ্চাদের গলায় বলল, 'ফ্রেন্ডস ফর এভার?'

আকাশ হো হো করে ডাকাতিয়া হাসি হাসল, যেন এমন মজার কৌতুক সে এর আগে কোনো দিন শোনেনি। তারপর হ্যান্ডশেক করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

এরপর ওদের মাঝে ফোন নম্বর আদানপ্রদান হলো। পরদিন ক্লাসে একসাথে বসার প্ল্যান হলো। সবকিছু ঠিকঠাক মত হবার পর আকাশকে বিদায়

দিয়ে অমৃতা বিভাদের কাছে আসল। হৃদি আর বিভা বিস্ফারিত চোখ নিয়ে মিনিট দুয়েক যাত্রাপালা দেখার মত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল অমৃতার দিকে ১

অমৃতা ঘাড় নাচিয়ে বলল, 'কাহিনি কী? আমার মুখে কি কালি লাগছে নাকি? জোকার নাকি আমি? এমনে চেয়ে আছোস ক্যান?'

বিভা ফোঁস করে উঠল, 'কী করছিলি?'

অমৃতা অবাক, 'যা করার তোদের সামনেই তো করলাম!'

হৃদি একদম হিন্দি সিরিয়ালের ঝগড়াটে বউদের মতো চোখ মুখ বাঁকা করে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, দেখলাম, শুনলাম এবং জানলাম যে তুমি আসলে কতটা স্বার্থপর, কতটা বেহায়া, আর কতটা চোখ উল্টাইন্না পাবলিক।'

অমৃতা হা হয়ে গেল, 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! কী আবোল তাবোল বলছিস?

বিভা বলল, 'ঠিকই তো বলেছে হৃদি, তুই একা একাই সব করে ফেললি, আমাদের একবার ডাকলিও না।'

অমৃতা এবার একটু নিভল। করুণ চোখে কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোদের ডাকিনি কারণ তোদেরকে আমি ওই ছেলেটার সামনে ছোট করতে চাইনি। তোদেরকে পুরো কলেজে অনেকেই চেনে, তোরাই বল, কতগুলো ছেলে তোদের পিছনে ঘুরতেছে হিসাব আছে? এরকম অবস্থায় তোরা যদি এ ছেলেটার সাথে গায়ে পড়ে কথা বলতি দেন ইউ নেভার নো হয়তো এ ছেলে কালকে পুরো কলেজ রটিয়ে দেবে যে তোরা ওর সাথে গায়ে পড়ে কথা বলেছিস। একটা স্ক্যান্ডাল হয়ে যাবে। আর আমার যে অসংখ্য ছেলে বন্ধু সেটা সবাই জানে! সবাই এটাও জানে যে আমি একটা টমবয়, উড়াধুড়া চলাফেরা, আমার এমনিতেই কোনো কিছুর ঠিক নাই, তাই নতুন করে আমাকে নিয়ে কেউ কিছু বলতে যাবে না। আমি জানি না ব্যাপারটা আমি তোদের বোঝাতে পেরেছি কি না। আমার প্ল্যান ছিল, কাল পরশু তোদের সাথে আকাশের পরিচয় করিয়ে দেবো খুব নরমালভাবে, আমার ফ্রেন্ড হিসেবে, এভাবেই বিষয়টা স্বাভাবিক হয়ে যেত!'

অনেকগুলো কথা একসাথে বলে থামল অমৃতা। হৃদি বিভা বেশ খানিকক্ষণ মুখটাকে বাংলার পাঁচের মতো করে রেখে একসময় প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, 'সরি দোস্ত, আমরা বুঝতে পারিনি। মাফ করে দে।'

পনেরো মিনিটের মাথায় আকাশ চলে আসল, হাতে একটা কেকের বাক্স। আরেক হাতে অনেকগুলো মোমবাতি। বিভা বলল, 'এতগুলা মোমবাতি আনছিস কেন?'

'তোর বয়স কত হলো সেটার প্রমাণ রাখতে হবে না?' আকাশের সোজা সাপটা উত্তর।

বিভা মুখটাকে কচুর মতো বানিয়ে বলল, 'জীবনেও কমু না!'

'না কওয়ার কী আছে? কতইবা বয়স হবে তোর, ঊনত্রিশ কী ত্রিশ?'

বিভা হৈ হৈ করে বলে উঠল, 'না না! অত নাহ্, পঁচিশ হলো এবার।'

কথাটা মাটিতেও পড়তে পারল না, তার আগেই সকলে গলা মিলিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'পঁচিশ বছর! ইয়া আল্লাহ্! তুই তো বুড়া হইয়া গেছোস!'

ঠিক সে মুহূর্তে আকাশের ফোনে ওদের বন্ধু রুদ্র কল দিলো। স্কাইপে ভিডিও কল করছে সে।

রুদ্র রহমান, এ ছেলে বিড়াল চোখা। ক্যাটস আই। তামাটে গায়ের রং। উচ্চতা পাঁচ ফিট আট। গাল ভর্তি দাড়ি। ঘাড় অবধি চুল। গান বাজনা ভালোবাসে। গিটার বাজায়। মাঝে মাঝে গান লেখে। বুয়েট পাশ ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি নেই, করে তিন চারটা টিউশনি। এক সপ্তাহ হলো সে চট্টগ্রাম গেছে নিজের বাড়িতে।

কল রিসিভ করল আকাশ।

'কই বার্থডে গার্ল কই?' রুদ্রর প্রশ্ন। ক্যামেরার স্ক্রিনে তার আউলবাউল মুখখানা ভেসে উঠল। সে বসে আছে একটা রিভলভিং চেয়ারে। তার ঘাড় অবধি ঢেউ খেলানো চুলগুলো রবার ব্যান্ড দিয়ে ঝুঁটি বাঁধা। গাল ভর্তি এক আঙুল সমান লম্বা দাড়ি।

আকাশ বিভার দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে জন্মদিনের কন্যা এদিকে।'

বিভা হাত নাড়ল রুদ্রকে দেখে, 'হ্যালো দোস্ত!'

রুদ্র একগাল হেসে বলল, 'হাই দোস্ত! তোর বার্থডে উপলক্ষে আমি চার লাইনের একটা ছোট ছড়া লেখেছি, এখন সে ছড়ায় সুর দিয়ে গান বানায়ে গাব, ঠিক আছে? তারপর আমরা কেক কাটব। ওকে?'

কথাটা শোনা মাত্র অমৃতা নাক মুখ কুঁচকে ফিসফিস করে বলল, 'আল্লাহ্! কার মুখ দেখে যে আজকে উঠছিলাম ঘুম থেকে, রুদ্রর বিরক্তিকর প্যাথেটিক ছড়াগান শুনতে হবে এখন।

রুদ্র গিটার বাজিয়ে, চোখে মুখে নানা মুদ্রা ফুটিয়ে তুলে গান শুরু করল,

'বিভাবরীর আজ জন্মদিন
চারপাশটা তাই খুশিতে রঙিন
বয়স পঁচিশ বছর
জন্মদিনের প্রহর
বিভাবরীর হাসি
আমরা ভালোবাসি।'

ছড়াগান শুনে ওরা সবাই একচোট হাসল। হৃদি হাসতে হাসতে অমৃতার কাঁধে পড়ে বলল, 'আমার পাঁচ বছরের ভাগিনাও তো এর চেয়ে ভালো ছড়া লেখতে পারবে! আল্লাহ্!'

বিভা হৃদির হাতে চিমটি কেটে ফিসফিস করে বলল, 'থাক ওভাবে বলিস না, বেচারা ভালোবেসে লেখেছে এই বেশি।

বিভাদের দলটা কফিহাউজের অন্যান্য টেবিলে বসা মানুষজনের দৃষ্টি কাড়ল। কেউ কেউ চাইল অবাক চোখে, কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে, কেউবা আবার হাসির খোরাক হিসেবে উৎসাহ নিয়ে দেখতে লাগল ওদের কাণ্ড।

কেক কাটা হলে সামি বলল, 'চল তোর বার্থডে উপলক্ষে আজকে একটা ফাটাফাটি কাণ্ড করে ফেলি।'

'কী সেটা?'

'চল চিটাগাং যাই, রুদ্রকে সারপ্রাইজ দেই। তারপর সবাই মিলে যাব কক্সবাজার। দুই দিনের ট্যুর।'

বিভা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমার বাপ আমারে মাইরা ফেলবে।'

'পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেল, এখনো বাপ মায়েরে ভয় পেলে হবে দোস্ত?'

এ কথা শুনে বিভা খুব চিন্তিত হয়ে গেল। কপাল কুঁচকে কিছু একটা

গভীরভাবে ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর দৃঢ় গলায় বলল, 'ঠিকই তো! যথেষ্ট বড় হয়ে গেছি আমি, এখন আর কোনো বাধা মানব না। দুদিন পরে বুড়ো হয়ে যাব, এখন একটু মাস্তি না করলে কখন করব? এখন আমি পূর্ণবয়স্কা। আমার যা ভালো মনে হবে আমি তাই করব। রাইট?'

বন্ধুসকল সমস্বরে বলে উঠল, 'রাইট!'

'ওই ছ্যাড়া, সামনে বইছস ক্যান? পিছনে যা!' বলে অমৃতা আকাশের শার্টের কলার চেপে ধরে টেনে হিড়হিড় করে বের করে নিয়ে আসলো গাড়ি থেকে। আকাশ আরেকটু হলে চিৎপটাং হয়ে পড়েই যেত ফুটপাথে। রাস্তার সবকটা পথচারী কাণ্ডটা দেখল। একটা বছর বিশেকের সুন্দরী তরুণী তো ফিক করে হেসেই দিলো আকাশের সে মুহূর্তের গোবেচারা মতো চেহারাটার দিকে তাকিয়ে।

আকাশ অমৃতার সাঁড়াশির মতো শক্ত করে ধরা হাতের মুঠো থেকে নিজের শার্টের কলার ছাড়িয়ে নিতে নিতে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া কণ্ঠে বলল,

'প্রবলেম কী তোর?'

'আমি সামনে বসব, তুই জানোস না আমি সামনে বসি সবসময়? আমার জায়গায় কেন বসছস?'

'ক্যান তুমি কি জায়গাটা কিন্না নিছো? ওইটা কি তোমার বাপের জায়গা?'

আকাশের গলা চড়ল। বোঝা যাচ্ছে সুন্দরীর চোখে হাসির পাত্র বনে যাবার পর তার রাগটা সপ্তমে উঠেছে। মেয়েটাকে সে কফিহাউজের ভেতরে থাকা অবস্থা থেকেই লক্ষ্য করছিল। তাদের কয়েকটা টেবিল পরেই পরিবার নিয়ে বসেছিল মেয়েটা। বারবার তাকাচ্ছিল আকাশের দিকে। কয়েকবার চোখে চোখও পড়ে গিয়েছিল।

'হ কিনছি'

'কত দিয়া কিনছস, ওই সামির বাচ্চা সামি, অমৃতার বাচ্চি তোর গাড়ির সামনের সিট কত টাকা দিয়া কিনছে?'

সামি গাড়ির বনেট খুলে কিছু একটা করছিল মনোযোগ দিয়ে। আকাশের কথা শুনে সে অবাক হবার ভান করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

আকাশ হুঙ্কার ছাড়ল, 'এদিক ওইদিক কী দেখস? আমার প্রশ্নের উত্তর দে।'

'দেখি না খুঁজি, আমার বাচ্চা খুঁজি। তুই তো আমারে না, আমার বাচ্চারে

ডাকছস।'

হৃদি আর বিভা আগেই গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসেছিল। সামির উত্তরটা শুনে ওরা দুজন একচোট হাসল।

'ফাইজলামি করিস না। প্রশ্নের উত্তর দে।'

সামি বনেটের ঢাকনা বন্ধ করে নবাবি চালে বলল, 'আমার দোস্তো জান দিয়া কিনছে ওই জায়গাটা। তুই কী বুঝবি?'

আকাশ নাকের পাটা ফুলিয়ে প্রশ্ন করল, 'এইডার মানে কী? শালা ফাউল কোথাকার! ঢংয়ের আর জায়গা পাও না?'

'ঢং না, সত্যিই তো, ও আমারে একা মরতে দিতে চায় না। অ্যাকসিডেন্ট হলে যেন আমার আগে ওর ক্ষতি হয়, আমার আগে যেন ওর জানটা যায় সে জন্য ও সামনের সিটে বসতে চায় সবসময়। তাই না দোস্ত?'

অমৃতা খিক করে হেসে উঠে বলল, 'হ তাই।'

আকাশ দাঁড়িয়ে ছিল তখনো গাড়ির দরজার সামনে। অমৃতা দুহাত দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল,

'সর সর, ভিতরে যাইতে দে।'

আকাশ ধাক্কার চোটে দু পা পিছিয়ে গেল। ফোঁস করে বলে উঠল, 'বাপরে বাপ! গায়ে কী জোর, কী খাস তুই? জাম্বো মহিলা একটা!'

'জাম্বো মহিলা ডাকবি না কইলাম, আমি হচ্ছি সুপার গার্ল।' গদিতে বসে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল অমৃতা

আকাশ মুখটা কচুপানা করে পেছনে এসে বসল হৃদির পাশে। হৃদি আকাশের থুতনি ধরে আদর করার ঢঙে বলল,

'আহারে বাবুটা, মন খারাপ করে না, ওরা পচা, ওদের কাছে যায় না কেমন? আমাদের সাথে থাকো। আমরা কত ভালো!'

আকাশ মুখ বাঁকাল, 'আরে জানিস না তো ওই হারামি আমার পার্টটাই নষ্ট কইরা দিলো।

'কীসের পার্ট?'

আকাশ অত্যধিক হতাশ গলায় বলল, 'গত দুইটা ঘণ্টা ধইরা পার্ট নিতে ছিলাম, মাইয়াটা আমার ওপর এইটটি পার্সেন্ট ক্রাশ খাইয়াই ফেলছিল, এই অমৃতা সব নষ্ট কইরা দিলো।'

সামি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, 'কোন মেয়েটার কথা বলছিস? পিঙ্ক ড্রেস?

আমাদের পাশের টেবিল?'

'না না, পিঙ্কটা ভুয়া ছিল। আমাদের দুই তিনটা টেবিল পরে, ওই যে বাম দিকের কর্নারের টেবিলটায়, নীল টপ পরা মেয়েটা।'

'কী জানি আমি খেয়াল করি নাই, আমার তো পিঙ্কটারে ভালোই লাগছিল।' সামি বলল।

অমৃতা অবাক হয়ে বলল, 'আমি বুঝলাম না, আমি কী করে তোর পার্ট নষ্ট করলাম?'

আকাশ উত্তেজনার বশে প্রায় ছোটখাটো একটা স্পিচ দিয়ে ফেলল, 'তুমি আমাকে তার সামনে হ্যারাস করছ। গত দুইটা ঘণ্টা ধইরা সে আমার দিকে মুগ্ধ নয়নে চাইয়া ছিল, আর তুমি এক মুহূর্তে আমারে রাস্তার কুত্তা বানায় দিছ তার সামনে। সে যাইতে যাইতে আমারে করুণার হাসি উপহার দিয়া গেছে।'

অমৃতা হেসে ফেলল।

'হাইসো না, বুঝছ হাইসো না, আমি পুরুষ নির্যাতন আইনে মামলা করব।'

'আগে ওই আইনটা প্রণয়ন হয়ে নিক দোস্ত, তারপর করিস।'

'মানহানির মামলা করব।'

'লাভ নাই, আমি ল'ইয়ার, তোর চেয়ে আইনের প্যাঁচ ভালো বুঝি। আচ্ছা বাবা, সরি, যা ওই মাইয়ার চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর দেখতে মেয়ের সাথে তোর ডেট সেট করে দিব আমি। কথা দিলাম।'

'হ, পাবি কই তুই অত সুন্দর মেয়ে। কক্সবাজারে? খাসিয়া ধইরা আনবি আমার জন্য?'

বিভা বলল, 'কী জানিস, খাসিয়া মেয়েরা খুব সুন্দর হয়।'

'খাসিয়া, চাকমা, রোহিঙ্গা কোনোটাই চাই না আমার।'

'আচ্ছা, চিটাগাইংগা দিবনে তরে।' অমৃতা বলল।

সামি বলল, 'হ্যাঁ চিটাগাংয়ের মেয়েরা সুন্দরী হয়।'

'আর ছেলেরা আমাদের রুদ্রর মতো বান্দর হয়।' হৃদি বলল।

হেসে ফেলল বাকিরা। অমৃতা বলল, 'যা; আমাদের রুদ্রও দেখতে বেশ ভালো।'

বিভার যেন হঠাৎ মনে পড়ল, 'আচ্ছা, আমরা যে খুব চিটাগাং যাচ্ছি, কাপড়চোপড় তো কিছুই নাই সাথে। টাকা-পয়সাও নাই।'

সামি বলল, 'টাকা-পয়সা নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না। কাপড় কিনে নে

যেকোনো একটা মার্কেট থেকে। কারণ এখন বাসায় গেলে তুই আর বের হতে পারবি না।'

অমৃতা টিপ্পনি কেটে বলল, 'দেখেছিস, বড়লোক বন্ধু থাকলে কত্ত সুবিধা! যাই হোক আমি বাসায় যাব একটু বুঝছিস, ধর আধাঘণ্টার মত লাগবে।'

হৃদি বলল, 'আমিও যাব। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

অমৃতা আর হৃদিকে ওদের বাসায় নামিয়ে দিয়ে আকাশ আর সামি চলল বিভাকে নিয়ে শপিং করতে। বসুন্ধরা সিটির সামনের যানজটে ভরা রাস্তায় এসে বিভা আকাশদের বলল, 'আমাকে টাকা দিয়ে এবার তোরা ফোট।

'কেন? ইম্পসিবল! তোকে একা ছাড়লে তুই সময় বেশি নিবি '

'না নিব না। বরং তোমরা আমাকে বিরক্ত করবা। তোমাদের সাথে যাব না আমি।'

অগত্যা বিভার হাতে তিন হাজার টাকা ধরিয়ে দিলো সামি। বিভা তাচ্ছিল্য নিয়ে বলল, 'মাত্র তিন হাজার টাকায় আমি কী শপিং করব? একটা সুতাও তো পামু না এই টাকায়।'

'আমার তো ক্যাশ টাকা আর নাই, টাকা তোলা লাগব বুথ থেকে।' সামি বলল।

'ক্রেডিট কার্ড দে।' হুকুম করল বিভা।

'কপাল! এ মাইয়া আজকে আমারে ফতুর বানায়ে ছাড়বে।'

ক্রেডিট কার্ড বের করে দিল সামি। তারপর বলল, 'শোধ দিবি কবে?'

'চাকরি পাইলে।'

বলে বিভা আর দাঁড়াল না। আকাশ হেসে উঠে বলল, 'আর দিছে তোরে শোধ, আশা ছাইড়া দে।'

সন্ধ্যের মুখে মুখে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া বাড়তে থাকল। রিকশা, প্রাইভেট কার, সিএনজি, বাস সব কিছু থেকে নির্গত হতে থাকল কালো বিষাক্ত ধোঁয়া। শীতকাল বলে ধুলোর ছড়াছড়ি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিচ্ছিরি ট্রাফিক। চিৎকার, চ্যাঁচামেচি।

এমনই নিত্যদিনকার যান্ত্রিক ঢাকা ছেড়ে সামির লাল রঙের মার্সিডিজ বেঞ্চটা রাত আটটার দিকে ছুট লাগাল ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে।

রাত দুটার দিকে বেডরুমের জানালায় একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল রুদ্র। মনে হচ্ছে কেউ একজন ঝাঁপতালে তবলা বাজাচ্ছে তার থাই অ্যালুমিনিয়াম কাচের স্লাইড উইন্ডোতে। রুদ্র তখন ডিভানে আধশোয়া অবস্থায় ভারি উত্তেজিত হয়ে তার প্লে স্টেশন ফোরে ব্যাটেল ফিল্ড ওয়ান খেলছে। দুহাত দিয়ে পরম যত্নে ধরে আছে জয়স্টিক। ঘরের মূল বাতি নেভানো। একটা হলুদ আলোর ল্যাম্প শেড জ্বলছে এক কোণে।

তবলার ঠেকা ক্রমাগত চলছে। ধিনা। ধি ধি না। তিনা। ধি ধি না।

খেলা থামাল রুদ্র। তাকাল পর্দা টানা জানালাটার দিকে। দোতলার এ ঘরের জানালায় গ্রিল নেই। স্লাইড খুলে দিলেই ওপাশটা ফাঁকা। আগে হালকা চোরের উৎপাত ছিল তাদের দেবপাহাড়ের এ বাড়িটায়। গেল বছর বাড়ির পাঁচিলটা আরো উঁচু করে তুলে দেবার পর আজকাল চোরটোর একেবারে আসে না বললেই চলে। তাহলে ও কে? যে এই মাঝরাত্তিরে তার ঘরের জানালায় তবলা বাজাচ্ছে? জ্বীনটিন নয়তো আবার? দেবপাহাড়ের জিন মশাইদের আবার বেশ খ্যাতি আছে। রুদ্র শুনেছে দিনে দুপুরেও তারা লোকজনকে ভূতের ভয় দেখিয়ে বিরক্ত করে বেড়ায়। এত কাল দেখা পায়নি সে। তাহলে কি আজ এ রহস্যময় রাত্রির দ্বিপ্রহরে সেই সব খ্যাতিমানদের সাথে শেষমেষ সাক্ষাৎটা হয়েই যাবে?

‘কে?’ চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল রুদ্র।

তেজি জ্বীনটার রাগ বুঝি আরো বেড়ে গেল। এবার ধুম ধুম ধাক্কা।

সেই শব্দে হৃদপিণ্ডটা একদম তড়াক করে লাফিয়ে গলার কাছে চলে আসলো। দুরুদুরু বুক নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের বাতি জ্বালাল রুদ্র। তারপর সরাল জানালার পর্দা। পর্দা সরাতেই আবিষ্কার করল জানালার কাচের ওপর নাক চেপে দিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে একটা চেনা চেনা মুখ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল রুদ্র সেদিকে খানিকক্ষণ। চেনা চেনা মুখটাকে ঠিকঠাক মত চিনে নিতে একটু সময় লেগে গেল।

স্বপ্ন দেখছে নাতো সে?

মুখ দিয়ে বিস্ময়ে বেরিয়ে আসলো নামটা, 'আকাশ?'

আকাশ ওপাশ থেকে কিছু একটা বলল ঠোঁট নেড়ে, রুদ্র বুঝল না। তড়িঘড়ি করে স্লাইড খুলে দিলো জানালার। আকাশ পা তুলে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। ওর পেছন পেছন অমৃতা। আর অমৃতার পেছনে সামি।

রুদ্রর মুখ হা। চক্ষু চড়কগাছ।

'সিরিয়াসলি? মানে ক্যামনে কী?' বিস্ময়ে হাবুডুবু খেয়ে প্রশ্ন করে রুদ্র।

'উইড়া চইলা আইলাম দোস্ত, তোরে কতদিন দেখি না। পরানটা নাই নাই হইয়া গেছিল একদম।' সামি বলল।

বিস্ময় কেটে গিয়ে রুদ্রর মুখে তখন ধীরে ধীরে হাসির রেখা ফুটছে। এমন কাণ্ড শুধু তার বন্ধুরাই করতে পারে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আসমান ফুঁড়ে হাজির হওয়া একমাত্র এ বান্দরগুলোর দ্বারাই সম্ভব।

'আচ্ছা শোন, বিভা আর হৃদি নিচে অপেক্ষা করছে, তুই তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খোল।' আকাশ বলল পায়ের জুতো খুলতে খুলতে।

রুদ্র তড়িঘড়ি করে নিচে নেমে দরজা খুলল।

'বাসার সবাই ঘুম?' বিভার প্রথম প্রশ্ন।

'হ্যাঁ ঘুম। তোরা যে কী! গড! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'হা হা হা, তোকে ভয় পাওয়ানোর জন্যই তো এত কষ্ট করে ওই বান্দরগুলো বান্দরের মতো মই বেয়ে বেয়ে উঠছে ওপরে। অবশ্য তোদের কার্নিশটা একদম নিচু, ওঠা খুব সহজ।'

'মই পাইলো কই ওরা?'

'তোদের দারোয়ান দিয়েছে।'

'ও দারোয়ানকেও হাত করা হয়ে গেছে তাই না?'

রুদ্র তখন মহাখুশি। মনের এফোঁড়-ওফোঁড় জুড়ে তার খুশির জোয়ার। কদিন ধরে এমনিতেও মন টিকছিল না চট্টগ্রামে। পাশ করে ফেলার পর ঢাকায় যাবার আর কোনো অজুহাতও আপাতত খুঁজে পাচ্ছিল না সে। খুব মনে পড়ছিল বন্ধুদের। এমন সারপ্রাইজ জীবনে এই প্রথম পেল সে।

ওদের পাঁচজনের ব্যাগট্যাগ সব কার্পেটের ওপর বোঝাই করে রাখা হলো।

আকাশ বলল, 'শোন রুদ্র, আমরা কাল খুব ভোরে কক্সবাজার রওয়ানা হচ্ছি। তুই কিন্তু কোনো ঝামেলা লাগাবি না বলে দিলাম।'

'কালকেই কেন? আমার বাসায় থাক দুই একটা দিন, তারপর না হয়

যাওয়া যাবে কক্সবাজার।'

'না না, আমাদের খুব একটা সময় নেই, ওইদিকে বিভার আব্বা ওর গলা কাটার জন্য ছুরিতে ধার দিচ্ছে।'

রুদ্রর মুখ থেকে হাসি আর সরছেই না। সে হাসতে হাসতে বলল, 'আসলেই সব ক্যামনে ম্যানেজ করলি, মামা তোমরাতো পুরা ফাটায় দিলা।'

অমৃতা রুদ্রকে পেছন থেকে হালকাভাবে একটু জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই খুশি হয়েছিস দোস্ত?'

'খুশি হইছি মানে? খুশিতে খালি কান্দন বাকি এখন!'

'সব কথা পরে হবে, পেটের ভেতর ছুঁচো দৌড়াচ্ছে। খাওয়া দে আগে।' হৃদি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল

রুদ্রর আম্মা জেগেই ছিলেন। মাঝরাত্তিরে ছেলের ঘরে হৈচৈ শুনে তিনি উঠে আসলেন। দস্যুবাহিনীকে দেখে তিনিও হতবাক। কিন্তু তাঁর মুখের হাসিই বলে দিলো তিনি একটুও বিরক্ত হননি।

রাত দুপুরেই রান্নাঘরে ঢুকলেন ওদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে।

বিভা তার বাসায় বলেছে সে এসাইনমেন্টের কাজে ভার্সিটির এক ফ্রেন্ডের বাসায় থাকছে। অনেক কাজ, তাই পরপর দুরাত থেকে স্টাডি করতে হবে। আর হৃদি বাসায় সত্য কথাই বলল। প্রথমে একটু নিমরাজি থাকলেও শেষমেশ বাবা-মা আর না করলেন না। আর অমৃতার তো এসব বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা। মাকে সরাসরি বলে দিলো, 'আম্মা আজ রাতে আমরা কক্সবাজার যাচ্ছি।'

ঝামেলায় পড়ল সামি। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাবা-মায়ের আদিখ্যেতার শেষ নেই। একটা টেক্সট করে দিলো সে মায়ের মোবাইলে 'রাতে আকাশের বাসায় থাকছি।'

কিন্তু সামির আম্মা তার একমাত্র নয়নের মণি ছেলেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে চায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার ফোন আসতে লাগল। এক পর্যায়ে সামি ফোন ধরা বন্ধ করে দিলো।

রুদ্রর বাসার ডাইনিংয়ে সবাই মিলে খেতে বসার পর সামির আম্মা আকাশের মোবাইলে ফোন করল। আকাশের ডান হাতে ঝুটা ছিল বলে বাম হাত দিয়ে ফোন রিসিভ করে লাউডস্পিকারে দিলো। সামির আম্মা আকাশ হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল,

'আচ্ছা, আমার বাচ্চাটা কোথায়?'

সারা টেবিলে হাসির রোল পড়ে গেল। আকাশ পড়িমরি করে লাউডস্পিকার অফ করে দিলো। যেভাবে সব একসাথে হো হো করে হেসে উঠেছে তাতে মনে হচ্ছে সামির আম্মা হাসির শব্দ শুনে ফেলেছে।

সামি প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে আকাশের হাত থেকে ফোনটা নিল ১

'হ্যালো আম্মা, কী হয়েছে?'

'বাচ্চা তুই কোথায়?'

'আমি ভালো আছি তো আম্মা, একদম ঠিক আছি। তুমি প্লিজ টেনশন করো না। আমি দুটা দিন থাকব আকাশের বাসায়। একটু কাজ আছে।'

কথা শেষ করে ফোন কাটতেই হৃদি ন্যাকা গলায় বলে উঠল, 'এই বাচ্চা! তুমি মিথ্যা কথা বললা কেন তোমার আম্মুর সাথে? দুষ্টু বাচ্চা!'

অমৃতা তার সাথে আরো যোগ করল, 'মিথ্যুক বাচ্চা!'

সামি কিচ্ছু বলল না। সে জানে আরো অনেকক্ষণ তাকে এ দুষ্টুগুলো 'বাচ্চা, বাচ্চা' বলে ক্ষ্যাপাবে। সে রেগে গেলে আরো পেয়ে বসবে। সুতরাং চুপ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

নড়ে উঠতেই অমৃতার ডান পা টা সটান গিয়ে লাগল আকাশের মাথায় আকাশ গোঙানির মতো শব্দ করে ঘুমকাতুরে গলায় বলল, 'লাথি মারলি কেন?'

'দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে তুই আমার পায়ে আইসা পড়ছস, লাথি মারব না তো কি আদর করব?' অমৃতা ওঠে বসতে বসতে বলল।

আকাশ দাঁত কিড়মিড় করল, 'কেউ তোর পায়ে পড়ে নাই।'

কার্পেটের ওপর লেপটে বসে সোফার গদিতে মাথা হেঁট করে ঘুমিয়ে পড়েছিল আকাশ। অমৃতা শুয়ে ছিল সোফার ওপর লম্বা হয়ে। সুতরাং আকাশের মাথাটা ছিল অমৃতার দু পা থেকে তিন ইঞ্চি দূরত্বে। তাই অমৃতা নড়ে উঠতেই ঠশ করে লেগে গেল আকাশের দুভ্রুর মধ্যিখানের কপালে।

'ঘুম ভাঙার পর দেখি তুই আমার পা ধইরা মাফ চাইতাছস, এখন আবার মিথ্যা কথা বলে।'

আকাশ ওর রক্তবর্ণ চক্ষু দুটো মেলে অমৃতার দিকে চাইল, বিষাক্ত কণ্ঠে বলল, 'দূর হ এখান থেকে!'

অমৃতা ঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা বাজে। ঘরের ভেতরে এখনও অন্ধকার ঘাপটি মেরে বসে আছে। রাতে আড্ডা দিতে গিয়ে অনেক বেজে গিয়েছিল। মেয়েদের জন্য পাশের ঘরটা বরাদ্দ থাকলেও গল্প করতে করতে রুদ্রর ঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছে সব। হৃদি আর বিভা বিছানায়। অমৃতা সোফায়। সামি, রুদ্র কার্পেটে। আর আকাশটাতো আধশোয়া অবস্থায়ই কাটিয়ে দিলো পুরো রাত।

অমৃতা উঠে পড়তেই আকাশ চটপট সোফাটা দখল করল। কুশন বুকে নিয়ে ভারি আরামের ভঙ্গিতে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করল সে।

অমৃতা আকাশের পেটে একটা গুঁতা দিয়ে বলল, 'এই আকাশ! উঠে যা। রেডি হতে হবে।'

'বিরক্ত করিস না।' ঘুমকাতুরে গলায় বলে আকাশ।

'শেষে কিন্তু তোকে ফেলে রেখে চলে যাব।'

'জাহান্নামে যা!'

'জাহান্নামে না, কক্সবাজার যাব।'

'দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে।'

'আজিব কারবার!'

আকাশের কাছে ব্যর্থ হয়ে হাঁড়িপানা মুখ নিয়ে এবার অমৃতা আসল হৃদি আর বিভার বিছানায়। বালিশের কাছটায় বসে আলতোভাবে ডাকল হৃদিকে।

'ওঠে যা, ভোর হয়ে গেছে।

হৃদি ঘুমো চোখে একবার তাকাল অমৃতার দিকে। হাত প্রসারিত করে কোলবালিশের মতো জড়িয়ে ধরল অমৃতার হাঁটু দুটো। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। পরমুহূর্তেই আবার ঘুমে কাদা।

অমৃতা হৃদির বাহুবেষ্টনি থেকে নিজের হাঁটু উদ্ধারের চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আর ঘুমাবি না, ওঠ বলছি!'

হৃদি আবার মুখ দিয়ে একই রকম শব্দ করল।

অমৃতা হৃদির পাশে শুয়ে থাকা বিভাকে একটা ধাক্কা দিয়ে অধৈর্য হয়ে বলল, 'এই তোরা যাবি না কক্সবাজার?'

'উফ! গুল্লি মারি কক্সবাজারের! ঘুমাইতে দে!' বিভা বলল ধমকের সুরে।

হতাশ অমৃতা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হৃদির বাহুবেষ্টনি থেকে নিজের হাঁটুদ্বয় মুক্ত করল। হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হাওয়া ঠাণ্ডা। একটু আগে আজান পড়েছে। রুদ্রদের উঠানের সামনেই পাহাড় কাটা সরু রাস্তা। রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তার সাথে। বড় রাস্তার মোড়ে মসজিদ। মসজিদে ধীরে ধীরে মুসল্লিরা ভিড় করছে ফজরের জামাত ধরবে বলে। রাস্তার দুধারের পাহাড়ে আগাছা আর ঝোপঝাড়। ঘোলা কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে অন্ধকার এখনো মাকড়সার জালের মতো ঝুলে আছে ঝোপঝাড়ের ভেতর। পুবের আকাশে ছোপ ছোপ লাল নকশা। এক টুকরো মেঘের ওপর নতুন সূর্যের আলো এসে পড়েছে। মেঘটার রং এখন সোনালি। অমৃতা সোনাবরণ মেঘটার দিকে বেশ খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। আচ্ছা! মেঘ ছুঁতে কেমন লাগে? সে জীবনে কখনো মেঘ ছোঁয়নি!

পকেটে রাখা সেলফোনটা বিপবিপ করে শব্দ করে উঠল। হাতে নিয়ে দেখল আম্মি মেসেজ পাঠিয়েছে। লিখেছে, 'কক্সবাজার থেকে আচার নিয়ে আসিস আর দীপা বলেছে ওর জন্য চন্দন সাবান নিয়ে আসতে।'

অমৃতার মুখে একটা চিলতে হাসির রেখা ফুটল। দীপা ওর ছোট বোন।

রূপচর্চাই ওর জীবনের সব। অমৃতা জীবনে কখনো মুখে পাউডারটা পর্যন্ত লাগায়নি। অন্য কোনো রকম সাজসজ্জা তো দূরের কথা। মুখ ধোবার জন্য লাক্স সাবানই তার জন্য যথেষ্ট। আর দীপা হয়েছে ঠিক তার উল্টো। ভীষণ ফ্যাশনেবল, স্টাইলিশ এবং রূপসচেতন। একদমই বাস্তববাদী নয়।

অমৃতা রিপ্লাইতে লিখল, আচ্ছা আম্মি, তোমরা ভালো থেক। আমরা এখনো রুদ্রর বাসায়। আপডেট দিব তোমাকে

পেছনে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। অমৃতা ঘুরে তাকিয়ে দেখল, রুদ্র। ওর ঘাড় ছোঁয়া চুলগুলো এলোমেলো কাকের বাসা হয়ে আছে। গালভর্তি লম্বা লম্বা দাড়িগুলো দেখে মনে হচ্ছে জট পাকিয়ে গেছে। অমৃতার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে হাই তুলতে তুলতে সে বলল, 'ওঠে গেছিস?'

অমৃতা রুদ্রকে দেখে নাক মুখ কুঁচকে বলল, 'তোরে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

রুদ্র দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে উদাস গলায় বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

'কোন একটা জন্তুর মতো যেন লাগছে, এ মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না।

রুদ্র ভ্রু কুঁচকে তাকাল অমৃতার দিকে, চোখাভাবে বলল, 'মজা নেও?'

'মজা নিব কেন সাত সকালে ঘুম থেকে ওঠে? পেটে নাস্তা পানি কিছু পড়ে নাই এখনও, এখন কি মজা নেওনের মুড আছে?'

'তাইলে কী কইলি এইমাত্র?'

'কইলাম তোরে একটা জন্তুর মতো লাগতেছে দেখতে।' এটুকু বলে একটু থেমে অমৃতা আবার বলল, 'তোকে দেখাচ্ছে রিয়েল বিস্টের মতো, বিউটি এন্ড দ্যা বিস্ট এর বিস্ট না, রিয়েল বিস্ট, ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের শাসনকালে একবার সত্যিকারের বিস্ট পাওয়া গিয়েছিল, এ বিষয়ে একটা ডকুমেন্টারি দেখেছিলাম তোকে ঠিক সেরকম দেখাচ্ছে।'

রুদ্র দুহাত দিয়ে আউলা চুলগুলো ঠিক করতে করতে বলল, 'অন্য কাউকে কিছু বলার আগে নিজের চেহারাটা আয়নায় গিয়ে দেইখা আয়। চুলটুল কাইট্টা এরকম চোর সাজছস ক্যান তুই? তোরে দেইখা মনে হইতাছে রাস্তার টোকাই। মাথা ন্যাড়া টোকাই চোর।'

'আমারে ঠিকই লাগতেছে। শোন দোস্ত প্লিজ আগে, শেভ কইরা আয়।'

রুদ্র করুণ গলায় বলল, 'কেন?'

'খুব খারাপ দেখাচ্ছে। এ দাড়ি আর চুলের জঙ্গলের পেছনে যে একটা সুন্দর চেহারা আছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে না।'

‘আচ্ছা দেখি, তুই এখানে দাঁড়ায় আছিস কেন?’

‘তো কী করব? নাস্তা পানি কিছু পাওয়া যাবে?

‘আম্মা তো ঘুমে এখনও, কাজের মানুষগুলোও ওঠে নাই। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।

‘থাক তোর কিছু করা লাগবে না, আমি দেখছি।’

অমৃতা রান্নাঘরে আসলো। ফ্রিজে পাউরুটি, ডিম আর বিফ সালামি পাওয়া গেল। বেশ কয়েকটা রুটি টোস্টারে গরম করে নিল চটপট। চারটা ডিমের ওমলেট করল। টমেটো, শশা কেটে পাউরুটির ভেতরে দিয়ে ডিম আর সালামির স্যান্ডউইচ বানাল সে। চুলায় বসিয়ে দিলো চায়ের পানি। রুদ্র আর বিভা চা খায় না। ওদের জন্য গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নিল কমলার রস।

জানালা খুলে দিতেই ঝপ করে লাফ দিয়ে এসে মেঝেতে পড়ল ভোরের নরম আলো। সাথে শীতের ভারি বাতাস, কাকের কা-কা, আর চড়ু-ইয়ের কিচিরমিচির। অমৃতা কফি রঙের টিশার্টের ওপর একটা সাদা হাতাকাটা সোয়েটার পরেছিল। শীতল বাতাসটা তাই পাতলা সোয়েটার ভেদ করে ধারালো ছুরির মতো গিয়ে বিঁধল শরীরে। ঠাণ্ডায় সামান্য কাঁপলো সে।

রুদ্র হাতমুখ ধুয়ে তোয়ালে হাতে ডাইনিংয়ে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল।

‘বাব্বা! ব্রেকফাস্ট রেডি?’

‘হুম রেডি, কুম্ভকর্ণগুলা এখনো ওঠে নাই না?

‘না’

রুদ্র একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, ‘উঠুক ওরা ওদের সময়মতো। আমি খাই। আই এম ফ্রিকিং হাঙরি’

‘দেরি করলেই দেরি হয়ে যাবে বুঝছিস? চিটাগাঙে এমনি যানজটের অবস্থা কেমন?’

‘ভালো না। সন্ধ্যার দিকে খুব ভিড় হয় আজকাল, কয়েকটা জায়গা আছে যেগুলোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি আটকে থাকে। মানুষ বাড়ছে তো। তবে ঢাকা থেকে কম এখনো।’ স্যান্ডউইচে কামড় বসিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রুদ্র।

অমৃতা রুদ্রর জন্য গ্লাসে কমলার জুস ঢালতে ঢালতে বলল, ‘হুম, লাস্ট ইয়ার আমি আসছিলাম আব্বুর সাথে ফ্লাইটে। আমাদের প্লেন ল্যান্ড করছে তোর ইশে... ছয়টার দিকে, বুঝছস? এরপর আমার ফুপুর বাসায় পৌঁছেছি কখন জানোস? রাত দশটায়। মানে সে রকম ট্রাফিক ডিজাস্টার। পতেঙ্গার ওইখানটায়

মনে কর বইসা ছিলাম দুই ঘণ্টার মতো।'

'সেটাই, পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মন চায় কী জানিস, ইউরোপের কোনো একটা দেশে গিয়া সেটেল হই!'

'আরে না, যত যাই বলিস নিজের দেশের চেয়ে শান্তি আর কোথাও নাই।'

রোজ সকালে চোখ খুলেই একবার ফেসবুকের পাতায় চোখ বুলানোটা বিভার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন কমপক্ষে একটা ছবি আপলোড করা তার চাইই চাই। গতকাল রাতে ঘুমাবার আগে সব বন্ধুদের সাথে তোলা একটা গ্রুপ ফটো আপলোড করেছিল। ক্যাপশন দিয়েছিল, 'ফুল নাইট মাস্তি উইড ফ্রেন্ডস' এরপর একটা হাসির ইমো। আজ ভোরে ফেসবুকের পাতায় প্রথম নজরটা দিতেই দেখা গেল প্রায় পঞ্চাশটার মতো লাইক পড়ে গেছে। অনেকেই এটা-সেটা কমেন্ট করেছে। এরমাঝে আকাশের কমেন্টটা সবচেয়ে নজর কাড়ল। আকাশ লেখেছে,

'মাস্তি জিনিসটা কী? এটা কোন দেশি শব্দ? এসব খ্যাত মার্কা ক্যাপশনে আমারে ট্যাগ মারবি না।'

মেজাজটা বিগড়ে গেল। কপাল কুঁচকে মুখটাকে ছুঁচোর মতো বানিয়ে সে আশেপাশে আকাশকে খুঁজতে লাগল। ওইযে শুয়ে আছে তিনকোণা হয়ে সোফার ওপর। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় করে একটা আওয়াজ বের হচ্ছে ওর। রাগের চোটে ইচ্ছে হলো ওর পাছায় একটা লাথি মারে। সত্যি সত্যি আকাশকে মারার জন্য বিছানা ছাড়তে যাচ্ছিল সে। কিন্তু তার আগেই চোখে পড়ল রুদ্রর পোস্টটা। রুদ্রর ফোনে তোলা সেলফি। রুদ্রর পাশে অমৃতা। সামনে খাবার টেবিলের ওপর রাখা স্যান্ডউইচ আর অরেঞ্জ জুস। রুদ্র ক্যাপশন দিয়েছে, 'ব্রেকফাস্টঃ মেড বাই অমৃতা। ইটস ডিলিশাস!' খুব দাঁত কেলিয়ে হাসছে দুজন। মেজাজটা আরো খিঁচড়ে গেল। রেগে মেগে কমেন্ট করল সে, 'অমৃতা চুন্নি আর রুদ্র রাক্ষস! খা খা, আরো খা! পাশের ঘরে আমি ক্ষুধায় মইরা যাই আর তোরা ডিলিশাস খানা খাস! পেট খারাপ হবে অভিশাপ দিলাম!'

সেকেন্ডের ভেতরেই অমৃতার রিপ্লাই আসলো, 'কেন তুমি তো কক্সবাজারকে গুল্লি মাইরে ঘুম দিলা, ইট ওয়াজ ইওর কল বেবি! কতবার ডাকলাম, আমাকে কুত্তার মতো তাড়ায় দিয়ে এখন আবার খুব হিংসা হচ্ছে, তাই না?

হঠাৎ সামি ধড়ফড় করে শোয়া থেকে ওঠে বসল। তার চোখে ঘুম। কোঁকড়ানো চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপাল ছুঁয়েছে। সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, ‘বিভা! তুই ঠিক আছিস?’

বিভা পানসে মুখে উত্তর দিলো, ‘না ঠিক নাই। সকাল থেকে আমার বন্ধুরা আমারে বাঁশ দিতাছে। শালা তোরা বন্ধু নামের কলঙ্ক।’

সামি কিছু বলল না, মুখ হা করে বড় বড় নিশ্বাস নিতে থাকল।

বিভা অবাক গলায় বলল, ‘তর কী হইছে? তুই অমন কাতল মাছের মতো হাঁসফাঁস করতেছিস কেন?’

‘নাইট মেয়ার!’

‘কী দেখছিস?’

‘দেখলাম আমি আর তুই, আমরা দুজন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি, চারপাশে প্রবল ঝড়। বড় বড় ঢেউ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’

বিভা নাক মুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় বলল, ‘দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে আমারে নিয়াই কেন তোর স্বপ্নে পানিতে ডুইবা মরতে হইল বল তো? অমৃতা চুন্নি আর রুদ্র রাক্ষসটারে নিলে তো পারতি। চুন্নি আর রাক্ষস দুইজন মিল্লা খুব ব্রেকফাস্ট বিলাস করতাছে।’

সামি কিছুটা বিরক্তি আর কিছুটা হতাশার গলায় বলল, ‘দূর, তোর মতো ডুশব্যাকের সাথে কথা বলা আর না বলা একই কথা।’

গায়ের ওপরের কম্বলটা হাত দিয়ে তুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামি ওঠে পড়ল শোয়া থেকে।

'না, অসম্ভব, আমার এখনো বিয়া হয় নাই। মরতে রাজি না।' অমৃতাকে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসতে দেখে সামি বলে উঠল।

রুদ্রদের গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা সব। তখন সূর্যদেব মাঘ মাসের সকাল আটটার নির্মেঘ আকাশ থেকে নিশ্চিন্তে স্বর্ণালি কিরণ ছড়াচ্ছে। রোদ ঝকঝকে চমৎকার একটি দিন।

বিভা সুর মিলিয়ে বলল, 'আমারও বিয়া হয় নাই, আমিও মরতে রাজি না!'

'তোদের কথা শুইনা তো মনে হইতাছে তগো জীবনের একটাই এম্বিশান, বিয়া। আমি বললে বলব, আমার এখনো স্পেসে যাওয়া হয় নাই, চাঁদে যাওয়া হয় নাই, মঙ্গলে গিয়ে নাচা হয় নাই। সুতরাং আমি মরতে চাই না।' রুদ্র বলল।

'এগুলো হইল ঢং'

'ঢঙের কী আছে? আমি তো চাঁদে যাব হানিমুন করতে, জানোস না?'

'চন্দ্রে যাবি হানিমুন করতে, কোন দুঃখে? রোমান্সও তো করতে পারবি না।'

'রোমান্স করুম না খালি ভাসমু। ভাইসা ভাইসা চাঁদ থেকে পৃথিবী দেখমু। এইটা কি কম রোমান্টিক?'

'সাইকো'

আকাশ গাড়ির জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'সত্য সত্যই তুই গাড়ি চালাবি?'

অমৃতা গাড়ি থেকে নেমে ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচিয়ে শক্ত গলায় বলল, 'শোনো সবাই, আমি গাড়ি চালাব, তোমাদের কোনো সমস্যা আছে?'

বন্ধুরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। হৃদি মিনমিন করে বলল, 'না মানে তোকে তো এর আগে কখনো গাড়ি চালাতে দেখিনি তাই আরকি আমরা একটু ভয় পাচ্ছি।'

'কীসের ভয়?'

আকাশ ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'মৃত্যু ভয়।'

'কেন মৃত্যুকে এত ভয়ের কী আছে? কয় দিন আগেই না মাঝরাতে ফোন

দিয়া কইতাছিলি দোস্ত মইরা যামু কিছু ভাল্লাগে না! এখন যদি আমি গাড়ি চালানোর উছিলায় ফ্রিতে মইরা যাস তাইলে তো সোনায় সোহাগা। আপত্তি কীসের?'

'আহা তখন তো মন মেজাজ ভালো ছিল না, লাইফের ট্র্যাজিডি পার্টে ছিলাম। এখন তো আছি লাইফের ভালো জায়গায়, বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমোদ করতে যাইতেছি, এখন মরমু ক্যান?'

অমৃতা আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে ওঠে স্টার্ট দিলো, বলল,

'আমি চললাম, তোরা চাইলে আসতে পারিস।'

সবাই বাধ্য হয়ে ওঠে বসল গাড়িতে। পেছনে চারজন চাপাচাপি করে বসতে হলো। আসলেই কষ্ট হয়ে গেল খুব। রুদ্র আর বিভা মাঝখানে আর আকাশ আর হৃদি জানালার দু পাশে বসল। রুদ্র হাসফাঁস করতে করতে বলল, 'ও আল্লাহ্! এত মোটকা কেন তোরা? আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে!'

অমৃতা গাড়ি ব্যাকে নিয়ে চমৎকার পাশ কাটিয়ে বের হয়ে আসলো রুদ্রদের গ্যারেজ থেকে। তারপর দেবপাহাড়ের ঢালু গলি পার হয়ে চলে আসলো বড় রাস্তায়। তার আগ পর্যন্ত সবগুলা কাঠ হয়ে বসে ছিল। কারো মুখে কোনো কথা ছিল না। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল রোলার কোস্টারে উঠেছে। বড় রাস্তায় নামতেই আকাশ বড় করে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যাক, এ যাত্রায় মনে হয় বাইচা যামু। আলহামদুলিল্লাহ।'

রুদ্র অমৃতাকে প্রশ্ন করল, 'গাড়ি চালানো শিখলি কবে?'

'এইতো মাস দুয়েক হবে।' অমৃতা উত্তর দিলো।

'আংকেল গাড়ি কিনছেন?'

'না প্ল্যান করতেছে, কিনবে এইতো কিছুদিনের মধ্যেই।'

'লাইসেন্স আছে তো?'

'তোর কি ধারণা আমি আইনজীবী হয়ে নিজেই আইন ভঙ্গ করব?'

'ও আচ্ছা ভুলে গেছিলাম। তুই তো আবার লায়ার।'

'লায়ার নয়, ল'ইয়ার।

ওই একই।'

'লাথি খাবি রুদ্র।'

'লাথিমাথি সব পরে হবে, এখন তুমি মন দিয়া গাড়ি চালাও।'

আকাশের বুক পকেটে মোবাইলটা বাজছিল। কল রিসিভ করতেই ওপাশ

থেকে একটা নারীকণ্ঠ অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল, ‘বাবা তুমি কোথায়?’

প্রশ্নটা শুনে আকাশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার সটান ভ্রু দুটো কুঞ্চিত হলো। মুখে ফুটে উঠল বিরক্তির এক স্পষ্ট ছাপ। কয়েক সেকেন্ড পর সে গম গম করে বলল, ‘কেন জানতে চাইছেন?’

ধারাল প্রশ্ন শুনে নারীকণ্ঠটি একটু হোঁচট খেল বোধহয় কিন্তু পরমুহূর্তেই চমৎকার সামলে নিয়ে বলল, ‘না, তোমার আব্বা দুশ্চিন্তা করছিলেন তো তাই।’

‘আব্বাকে বলবেন আমি বন্ধুদের সাথে আছি, ভালো আছি। চিন্তার কিছু নেই।’ বলে আকাশ লাইন কেটে দিলো।

রাতে ভালোমতো ঘুম হয়নি বলে বিভার এখন একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। আকাশের কথা শুনে এক চোখ খুলে সে জড়ানো গলায় বলল, ‘কার সাথে কথা বলিস অমন ক্যাট ক্যাট করে?’

‘কার সাথে আবার, আমার বাপের মিস্ট্রেসের সাথে। বিরক্তিকর।’

‘ছি, দোস্ত এভাবে বলে না।’

আকাশ পাশ কাটানো গলায় একবার ‘হুম’ বলে চুপ করে গেল।

মহিলার ধৈর্য দেখে অবাক না হয়ে পারে না আকাশ। কাটল তো বেশ কয়েকটা বছর। এ এতগুলো বছর ধরে তার মায়ের জায়গাটা নেবার জন্য কী নিরলস চেষ্টাটাই না করে যাচ্ছে। সে প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে সে বুঝিয়ে দিয়ে আসছে যে মা কেন, কোনোভাবে একরত্তি জায়গাও তার জীবনে ওই মহিলার জন্য নেই। আর কী উপায়ে বোঝাবে আকাশ? মা মারা যাবার পর বছর না ঘুরতেই বাবা যে রাতে বউ করে এ মহিলাকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল সে রাত থেকেই আকাশ তাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছিল। বাবা নামক মানুষটার ছবিও সেদিন তার চোখের সামনে চকিতে পালটে গিয়েছিল। বাবা থেকে সেদিন সে রূপান্তরিত হয়েছিল শুধুমাত্র একজন মানুষে। রক্তমাংসের দলা পাকানো মাথামোটা বিবেকহীন এক সাধারণ মানুষ। আজকাল অবশ্য লোকটাকে মানুষ ভাবতেও কষ্ট হয় তার। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় মানুষরূপী এক ভয়ংকর জন্তু।

মা মারা যাবার পর আকাশ একা হয়ে গেল। মা নেই, ভাইবোন নেই, বাবা থেকেও নেই। মায়ের জায়গায়, মায়ের রান্নাঘরে, শোবার ঘরে, যে সমস্ত জায়গায় তার মায়ের হাতের ছোঁয়া জড়ানো, স্মৃতি জড়ানো, সে সব জায়গায় সর্বক্ষণ অন্য এক মহিলার উপস্থিতি! কী অসহ্য! কী করে পেরেছিল লোকটা

বছর না ঘুরতেই তার মায়ের জায়গায় অন্য একজনকে বসিয়ে দিতে? এতই সোজা? লোকটা জীবনে শুধুমাত্র দুটা বিয়ে করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। কন্ট্রাক্টরির ব্যবসা করত এক সময়। বার তিনেক মূলধন হারিয়ে পথে বসেছে। এখন শেয়ার ব্যবসা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারবে না, আকাশ জানে।

আকাশ তার কাছ থেকে কোনো হাত খরচ নেয় না। মায়ের বাপের বাড়ির দিক থেকে একটা ফ্ল্যাটের মালিক হতে পেরেছিল সে উত্তরাধিকার সূত্রে, সে ফ্ল্যাটের ভাড়ার টাকা দিয়েই তার দিন চলে। চাকরির পেছনে ছুটতে গিয়ে তার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা ক্রিকেটটাও ছেড়ে দিয়েছে। কই চাকরি তো আজও পেল না মন মতো।

রোদের তেজ বাড়ছে। সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে রোদ তাতানো রাস্তা দেখতে দেখতে ক্রমশ জীবনের থিকথিকে কাদাওয়ালা অংশগুলোর দিকে হেলে যাচ্ছিল আকাশ। ঘোর ভাঙলো হৃদির গলার স্বরে। হৃদি ফোনে কথা বলছে। তার গলার স্বর অদ্ভুত অন্যরকম শোনাচ্ছে। অনেকটা বিড়ালের মিউমিউ শব্দের মতো, 'হ্যালো জান! কী করো তুমি?'

জান নামক ব্যক্তি ওপাশ থেকে কিছু একটা বলল তাই শুনে হৃদি আহ্লাদে গলে গিয়ে বলল, 'কী যে বলো জান, আমি খুব মিস করতেছি তোমাকে।'

আকাশ বিস্মিত হয়ে বিভাকে বলল, 'ওর কী হইছে? জ্বীন পরির আছর লাগছে নাকি?'

বিভা হাসল, ফিসফিস করে বলল, 'বয়ফ্রেন্ড!'

সামনে থেকে অমৃতা বলল, 'সে একজন লায়িকা, লায়িকারা এমনে কথা কয়, জানোস না?'

হৃদি তখন মিউমিউ করে বলছিল, 'বেবি প্লিজ রাগ করে না, ডিসিশনটা হঠাৎ করে নেয়া হয়ে গেসে বুঝেছ? তোমাকে বলার চান্সই পাই নাই'

সামি ধমকে উঠল, 'ন্যাকামি করবি না, একটা থাবড়া লাগাব!'

হৃদি ফোনের লাইন কেটে দিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,

'এ রকম করতেছিস কেন তোরা? আমাকে একটু শান্তিতে প্রেমও করতে দিবি না?'

'প্রেম করবি তো কর না, ন্যাকামি করতেছিস কেন?' সামি বলল।

'কোনো ন্যাকামি করি নাই, আমার বয়ফ্রেন্ডের রাগ ভাঙাইতেছিলাম।

বেচারা মন খারাপ করছে ওরে ফেলায় চিটাগাং চলে আসছি তাই, তোরা কী বুঝবি পাষণ্ড কতকগুলো!’

‘ইস আমার গার্লফ্রেন্ড যদি এমন সিনেমার নায়িকাদের মতো ঢং করে কথা বলত তো সাথে সাথে ব্রেকআপ।’

‘ঢং করে কথা বলতে পারলে তো বলবে, সবাই কি পারে নাকি?’

‘ভাগ্যিস পারে না!’

রুদ্র বলল, ‘তুই এইরকম বিড়াল স্বরে কথা বলার প্রশিক্ষণ নিয়েছিস কোত্থেকে? কে শেখাল?

হৃদি উত্তর দেবার আগে অমৃতা বলল, ‘আমাদের হৃদি জন্ম থেকেই নাইকা, আমার মনে আছে স্কুলে ক্লাস ডাইরির ওপরে নিজের নাম লেখার পরিবর্তে ও লিখে রাখত, মিসেস সালমান খান।’

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। হৃদি তেড়েমেড়ে বলল, ‘অত হাসির কী আছে আমি সালমানের ফ্যান ছিলাম তাই অমন লেখতাম, আর তুই যে লিওনার্দোর পোস্টারে সকাল বিকাল চুম্মা দিতি সেইটা কি ভুইলা গেছি মনে করছস?’

অমৃতা লাল হলো একটু, ‘ওয়েল... আমি ছোট ছিলাম!’

‘হ মামা বুঝছি, কৃষ্ণ করলে লীলাখেলা আমি করলে পাপ!’ হৃদি বলল।

রিমঝিম হলদে দুপুরের বুক চিরে লাল গাড়িটা ছুটছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের আঁকাবাঁকা জিকজ্যাক রাস্তায়। ওরা প্রায় গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। সবাই ক্লান্ত। রাত্রি জাগরণের ষোলো আনা শোধ তুলে নিচ্ছে শরীর। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

সেরকম একটা ঘুম ঢুলু ঢুলু পরিবেশে রুদ্র হঠাৎ ভাবালু গলায় বলে উঠল, 'লইট্টা শুঁটকির ঝাল ভর্তা দিয়ে গরম গরম ভাত খাব'।

কথাটা প্রথমে কেউ খুব একটা পাত্তা দিল না বিধায় সে দ্বিতীয়বার বলল। বিভা একটু বিরক্তি নিয়ে বলল, 'প্লিজ না!'

'কেন, না কেন? খাবই খাব। দৃঢ় চিত্তে বুক ফুলিয়ে বলল রুদ্র।

'না না! তোর গা থেকে এমনিতেই কেমন যেন শুঁটকি শুঁটকি গন্ধ পাচ্ছি সকাল থেকে। তোরা চিটাগাইংগারা সারাদিন খালি শুঁটকি খাস তাই না?' নাক কুঁচকে বিভা বলল।

রুদ্র কিছু বলল না। আগুনচোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল একবার বিভার দিকে। বিভা ওর একদম গা ঘেঁষেই বসে আছে। চোরাভাবে রুদ্রর আগুনচোখটা দেখল সে। তারপর বলল, 'ডিওড্রেন্ট ইউজ করিস না? এমন শুঁটকি শুঁটকি গন্ধ কেন?'

'শোন বিভা, সব সময় ফালতু প্যাঁচাল করবি না। ঠিক আছে? ফালতু প্যাঁচালেরও একটা সময় আছে।'

'সত্য কথাই বললাম। সত্য সইতে না পারলে আমার কী করা।' উদাস গলায় বলল বিভা।

আকাশ ফোড়ন কাটল, 'আরে বিভার বাচ্চি মজা নিতেছে, তুই চেতিস না।'

হোটেল সি প্যালেসে দুটো ঘর ভাড়া করা হয়েছে। সামি আগে থেকেই বুকিং দিয়ে রেখেছিল। দোতলায় পাশাপাশি দুটো ঘর। দুটো ঘরের সাথেই লাগোয়া বারান্দা আছে। বারান্দায় দাঁড়ালেই সামনে সাগর সৈকত। দূরে চোখ রাখলে দেখা যায় নীল আকাশ আর নীলচে সমুদ্রের মিলন রেখাটি।

দুটো ঘর ভাগাভাগি করে নিল ওরা। একটা ছেলেরা, অপরটা মেয়েরা। ঘরে একটি ডাবল খাট। খাটের পাশের টেবিলে চমৎকার ল্যাম্বশেড। একটি ক্যাবিনেট। ড্রেসিং টেবিল আর টেলিভিশন। ব্যস আর কী চাই?

হৃদি আর বিভা ঘরে ঢুকেই হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। জুতাটাও পর্যন্ত খুলল না। অমৃতা তাড়া দিয়ে ওঠে বেশ মা মা গলায় বলল, 'এই যে মহারানিরা শুয়ে পড়লে হবে না। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে, এখুনি বেরিয়ে পড়ব।'

হৃদি পাশ ফিরে শুয়ে বিভার গায়ের ওপর একটা হাত তুলে দিলো। চোখ বুজে ঝিমানো গলায় বলল, 'কোথাও যাব না, আমরা এখন ঘুমাব।'

'ঘুমাইতে আইছস কক্সবাজারে? নিজের বাসায় ঘুমাইলেই তো পারতি। এত দূরে আসার কী দরকার ছিল?'

'সেটা তুই বুঝবি না, কক্সবাজারে আইসা, হোটেল সি প্যালেসের ২১৪ নম্বর রুমে মটকা মাইরা ঘুমানোর একটা বিশেষ মহত্ত্ব আছে।'

অমৃতা আর কথা না বাড়িয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। বিভা হাসিমুখে বলল, 'জানিস হৃদি আমার জীবনের বেস্ট বার্থডে এটা। এত জোস একটা বার্থডে হবে এবার আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

'হুম, ভালো তো পঁচিশ বছর বয়সের জন্মদিনটা সারা জীবন মনে থাকবে তোর।'

'আমার না খুব ভালো লাগছে! একটু বেশিই ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে সারাটা জীবন যদি আমরা শুধু এভাবেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারতাম!'

ওয়াশরুম থেকে অমৃতার গলার স্বর ভেসে আসলো, সে প্রায় চিৎকার করে বলছে, 'ওই ছেমড়িরা! আমারে তো খুব ঘুমের বাহানা দিয়া তাড়ায় দিলা, এখন তো খুব ইটিশ পিটিশ গল্প হচ্ছে।' বিভা আর হৃদি খিলখিল করে হেসে উঠল।

হৃদি বলল, 'দ্যাখ না কাণ্ড, ওয়াশরুম থেইকে লুকায় লুকায় কান পাইতা আমাদের কথা শুনতেছে। চোর কোথাকার!'

বিভা বলল, 'দোস্ত তুই মানুষ নাকি ভ্যাম্পায়ার? আমি যতটুকু জানি ভ্যাম্পায়াররা দূর দূরান্ত থেকে কথা শুনতে পায়।'

'আমি ভ্যাম্পায়ার!'

'তাই? আমার না অনেকদিনের শখ যে একটা ভ্যাম্পায়ারের সাথে প্রেম করব। আমার শখটা পূরণ করবি দোস্ত?'

'আচ্ছা করবনে, আগে পুরাপুরি ভ্যাম্পায়ার হয়ে নেই, এখন ট্রানজিশন চলছে।'

দরজায় ধুপধাপ ধাক্কা পড়ছে। বিভা শুয়ে থেকেই হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে এএএএ?'

উত্তর নেই, কিন্তু ক্রমাগত চলছে কাঠের দরজায় আঘাত। বিভা আবার চেঁচাল, 'কে?'

এবার ওপাশ থেকে আকাশের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'আমরা!'

'কী চাই তোমাদের?'

'আরে দরজা খোল!'

'এখন দরজা খোলা যাবে না।'

'কেন?'

'গোপন কাজ চলিতেছে'

'ছি, লেসবিয়ান নাকি তোরা?'

'লেসবিয়ান এখনও হই নাই তবে অমৃতা ফুল ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেলেই লেসবিয়ান হইয়া যামু আমি। ঠিক করলাম। কারণ ভ্যাম্পায়ারের সাথে প্রেম করা আমার অনেক দিনের শখ।'

'আজাইরা কথা বাদ দে, তাড়াতাড়ি বাইর হ, পেটের মধ্যে ক্ষুধায় বোমা ফুটতেছে, খাইতে যাব।' আকাশ বলল, দুর্বল গলায়।

হৃদি আর বিভাকে নড়তে দেখা গেল না। আঠার মতো লেগে রইল বিছানার সাথে। অমৃতা ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে এক হাতে তোয়ালে ধরে অন্য হাতে দরজা খুলল। তার পরনে একটা বেগুনি রঙের টি শার্ট। যার বুকে আঁকা একটা ছোট টিংকার বেল। সচরাচর যেমন ঢিলাঢালা পোশাক সে পরে এটা ঠিক ততটা ঢিলাঢালা নয়। একটু আঁটসাঁট হয়ে লেগে ছিল শরীরের সাথে। ওর ফরসা গায়ে চমৎকার ফুটেছে রংটা। আকাশ ওকে এর আগে কখনো এমন আঁটসাঁট পোশাকে দেখেনি। আজকে দেখে তো ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা।

অমৃতা দরজাটা খুলে সোজাসাপটা প্রশ্ন করল, 'কী চাই?'

আকাশের চোখ আটকে গেল টিশার্টের টিংকার বেলের ছবির ওপর। কয়েক সেকেন্ড গাড়লের মতো সেদিকে চেয়ে থাকল সে।

অমৃতা ধমকে উঠে বলল, 'হারামি, নজর ঠিক কর!

আকাশ হকচকানো গলায় বলল, 'টিংকারবেল দেখছিলাম, নো অফেন্স!'

বলেই মুখ লুকাতে ঘুরে দাঁড়ালো সে। একটু দূরে রুদ্র আর সামি দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গলা উঁচিয়ে অমৃতাকে বলল, 'তোরা প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি কর, খুব খিদে পেয়েছে।'

অমৃতা গায়ে লেদারের জ্যাকেট জড়িয়ে মিনিট পাঁচেকের ভেতর বের হয়ে আসলেও হৃদি আর বিভা আরো পাক্কা আধটা ঘণ্টা সময় বরবাদ করল তৈরি হতে গিয়ে।

হৃদি একটা জারদৌসি কাজের খয়েরি স্যালোয়ার কামিজ পরেছে। চুলগুলো খোঁপা করে বেঁধেছে উঁচু করে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে সামি চোখ কপালে তুলে তাকে বলল, 'বিয়া বাড়ির সাজ দিছস কেন?'

'এইটা তোর কাছে বিয়া বাড়ির সাজ লাগে? বিয়া বাড়িতে কখনো যাসনি? দেখিসনি মেয়েরা কীভাবে সাজে?'

'হ দেখছি তো, আলিফ লায়লার মতো কইরা সাজে। দেখলেই মনে মনে বাজনাটা বাজতে থাকে।' এটুকু বলে সামি সুর করে গাইতে থাকল, 'আলিফ ল্যায়লা! আলিফ ল্যায়লা!'

হৃদির মুখখানা অপমানে থমথম করে উঠল, 'এটার মানে কী? আমাকে এখন আলিফ লায়লা লাগছে?'

'তোকে লাগছে মালিকা হামিরার মতো, মনে আছে হাতে মাকড়সা নিয়া আকরাম আকরাম করত? মনে হচ্ছে এখনই তুই আমার মুখের সামনে এসে হাতে মাকড়সা নিয়ে বলবি আকরাম! ব্যস ম্যাজিক হয়ে যাবে।'

হৃদি নাক মুখ কুঁচকে বলল, 'মাঝে মাঝে না, তোর সাথে কথা বলতে আমার অসহ্য লাগে'

সামি হেসে ফেলল, চেতলি নাকি? দুষ্টুমি করলাম। তোকে আলিফ লায়লা লাগছে না। তবে মাথার ওপরে পাহাড়ের মতো কী একটা বানাইছস এইটাও ভালো লাগতেছে না।' বলে সামি নিজেই হাত দিয়ে হৃদির খোঁপা করা চুল খুলে দিলো। সারা পিঠময় ঝরঝর করে ছড়িয়ে পড়ল ঢেউ খেলানো চুলগুলো।

'এখন ঠিক আছে।' বলে হাসল সামি। হাসির উত্তরে মুখ ভেংচি কাটল হৃদি। এর মানে প্রশংসাটা মন মতো হয়নি। মন মতো কিছু না হলে ভেংচি কাটা হৃদির স্বভাব।

দুপুরে ওরা ভাত খেল হোটেল ঝাউবনে। সাদা ভাত, আলুর ভর্তা, শুঁটকি ভর্তা, বেগুন ভর্তা, মুরগির ঝোল আর ডাল। আকাশের এত ঝাল খেয়ে অভ্যাস

নেই। খেতে খেতে তার নাক চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। হু হা শব্দ করতে করতে সে বলে উঠল, ‘এত ঝাল মানুষ খায়? এ তো সুইসাইড এটেম্পট।

‘হ মানুষই খায়, কাকপক্ষীতে ঝাল খায় বলে আমার জানা নাই।’ অমৃতা বলল।

বিভা বলল, ‘আরো খাও তোমরা শুঁটকির ভর্তা? বলছিলাম তো এসব ভর্তা জাতীয় পচা খাবার না খেতে। এখন কাঁদো কেন? খাও আরো খাও।’

রুদ্রর পকেটে একটা কিটক্যাট চকলেট ছিল। ওটা বের করে আকাশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘নে চকলেট খা, ভালো লাগবে।’

আকাশ ডাঙায় তোলা মাছের মতো ছটফট করতে করতে বলল, ‘কোনো লাভ নাই, কোনো লাভ নাই।’ তার দুই চোখ তখন রক্ত লাল।

সে মুখ হা করে জিব বের করা অবস্থায় বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে।

বিভা চিন্তিত গলায় বলল, ‘অমন কুত্তার মতো জিব বাইর কইরা আছস ক্যান?’

আকাশ উত্তর দিলো না, ঠাণ্ডা পানি ঢকঢক করে গিলে খেতে লাগল।

রুদ্র হঠাৎ খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে উত্তেজিত গলায় আকাশকে বলল, ‘দোস্ত, ঠিক হ, জাস্ট চিল! পিছনের টেবিলের একটা হট মেয়ে তোর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকায় আছে। ঘাড় ঘোরালেই দেখতে পাবি।’

আকাশ চোখ ছোট করে মনোযোগ দিয়ে রুদ্রর কথাটা শুনল। তারপর সেকেন্ড না ঘুরতেই একদম পরিপাটি মানুষটি হয়ে গেল। চকিতে হাত দিয়ে চোখ আর নাকের পানি মুছে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল।

দুটো মধ্য বয়স্ক পুরুষ আয়েশ করে ঝোল দিয়ে মেখে ভাত খাচ্ছে। ধোঁকাটা বুঝতে পেরে জ্বলন্ত চোখে সে তাকাল রুদ্রর দিকে। রুদ্র দাঁত বত্রিশটা বের করে হেসে বলল, ‘বিংগো!’

সব্বাই হেসে উঠল হো হো শব্দ করে। অমৃতা বলল, ‘কী মামা? ঠাণ্ডা পানিতে কাজ হয় না, চকলেটে লাভ হয় না, হট মাইয়ার কথা শুইনাতো সেকেন্ডে সব ঠিক, হ্যাঁ?’

আকাশও হেসে ফেলল।

উষ্ণ বালুতটে চিকচিক করছে রুপালি রোদ্দুর। হাওয়া বইছে প্রবল বেগে। জোয়ারের টানে সমুদ্র উত্তাল। পাহাড়ের মতো বড় আর ভয়ংকর ঢেউ গর্জে এসে আছড়ে পড়ছে সাগর পারে।

বছরের এ সময়টায় পর্যটকদের প্রচুর ভিড় হয়। সকাল, দুপুর, রাত চব্বিশ ঘণ্টা নানা বয়সী মানুষে গিজ গিজ করে সাগর সৈকত। আজকের দুপুরটাও সেরকমই এক লোক লোকারণ্য ভরা দুপুর। কেউ কেউ নেমে গেছে জলে। কেউ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলায় ব্যস্ত, কেউ আরাম করে শুয়ে আছে বাংলালিংকের ছাউনির তলায়। পর্যটকদের পাশাপাশি

পাশাপাশি নানা বয়সী ফেরিওয়ালাদেরও বড্ড ভিড় সৈকত জুড়ে। চারপাশে একটা উৎসব উৎসব ভাব। জীবন এখানে বড্ড বেশি জীবন্ত, প্রকৃতির মতোই মনোরম আর সুন্দর।

ভিড়ের মাঝে আমাদের হৃদিতা বিনতে জামিলকে দেখা গেল। কোমরে হাত দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোদের তেজে চোখ মেলতে পারছে না সে পুরোপুরি।

‘এমন তেলাপোকার মতো চোখ বানাইছিস কেন? ঠিকমতো তাকা।’ ডিএসএলআর ক্যামেরা হাতে নিয়ে অমৃতা বলল।

‘সম্ভব না, রোদ অনেক, তাকানো যাচ্ছে না।’ কপাল আর চোখ কুঁচকে হৃদি বলল।

এ মুহূর্তে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তাকে কোনো কঠিন অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অথচ সকাল থেকে ফটোসেশন করার জন্য অস্থির হয়ে ছিল সে।

রুদ্র অমৃতার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, ‘তর কি বাথরুম আসছে? মুখ এরকম করে আছিস কেন?’

হৃদি কিছু বলল না। চোখ মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। অমৃতা ওর ওই শক্ত, থমথমে মুখটার কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল চটপট।

আকাশকে দেখা গেল মেটে রঙের মোটামুটি বড়সড় একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে। তার মুখে স্ফীত হাসি। সে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছে দুচোখে। মনে হচ্ছে তার চোখদুটোও হাসছে। শিরদাঁড়া সোজা। বসার ভঙ্গিতে বেশ রাজা রাজা ভাব। কাছাকাছি আসতেই ঘোড়া দেখে এক লাফ দিয়ে দূরে সরে গেল হৃদি। অমৃতার ক্যামেরা সে মুহূর্তটা চমৎকারভাবে বন্দি করে ফেলল ছবির ফ্রেমে। হৃদি লাফ দিয়ে সরতে গিয়ে তাল সামলাতে না পেরে বালুর ওপর পড়ে গিয়েছিল। আকাশ ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেই ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আবেগে গলে গিয়ে বলল, 'হে রাজকন্যে! আমি এক রাজ্যবিহীন রাজপুত্র, তুমি যাবে কি আমার সনে?'

হৃদি কিছু বলার আগেই রুদ্র হড়বড় করে বলে উঠল, 'রাজকন্যের বাথরুম পাইছে, যাইব না তর লগে, বাথরুমে যাইব।'

হৃদি কাপড়ে লাগা বালি হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'মোটেও আমার বাথরুম পায় নাই, কিন্তু ঘোড়া আমার ভয় লাগে, আমি ঘোড়ায় চড়ব না। আর তাছাড়া রাজ্যবিহীন রাজপুত্রের প্রতি কোনো আগ্রহ আমার নাই, রাজপুত্রবিহীন রাজ্য হলেও প্রবলেম আছিল না।'

আকাশ 'তাহলে আর কী করা রাজকন্যার সখীকেই নিলাম সাথে' বলে অমৃতার কোমর জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে নিল ঘোড়ার পিঠে। অমৃতার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল ক্যামেরা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘোড়া চিঁহি চিঁহি শব্দ তুলে ছুট দিলো। বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছিল অমৃতা ঘোড়ার পিঠ থেকে। আকাশ ধরে ফেলল তাকে, তারপর দুহাত বাড়িয়ে ঘোড়ার রাশ ধরল। আকাশের দুবাহুর মধ্যিখানে বন্দি হলো অমৃতা। ঘটনার আকস্মিকতায় কথা হারিয়ে ফেলেছিল সে। নিজেকে যখন নিজের মাঝে ফিরে পেল তখন দেখল আকাশ মুখে রাজ্যজয়ের হাসি নিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে। রেগে গিয়ে খুব খারাপ কিছু একটা বলে ফেলতে যাচ্ছিল সে। হুট করে এমন লঙ্কা কাণ্ড বাঁধানোর কোনো মানে হয়? তার সাধের ডিএসএলআর ক্যামেরাটা পড়ে গেল হাত থেকে, ওটার যদি কিছু হয় তো আকাশকে সে জ্যান্ত কবর দেবে।

কিন্তু মুখ খুলতে গিয়ে কেমন একটা বোবায় ধরল তাকে। আকাশের ওই হাসি হাসি চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। আকাশ হাসলে সত্যি ভালো দেখায়। চোখের আয়নায় ওর সাদামাটা হৃদয়টা ঝিকমিক করে।

ঘোড়া ছুটতে লাগল টগবগিয়ে সাঁই সাঁই বাতাস কেটে, ভেজা বালুর পথটি ধরে। একপাশে বিস্তৃত নীল সমুদ্র আর অন্যপাশে সবুজ পাহাড়। কানের কাছে সমুদ্রের গর্জন। প্রকৃতির তৈরি এত সব শব্দের মাঝে ডুবে থেকে ওরা আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সময়টি কথা বলার জন্য নয়, এ সময় শুধু চুপ করে থেকে মনের ভেতরের মনটাকে অনুভব করার!

'খাইছে দোস্ত! প্রিন্স চার্মিং তো প্রিন্সেসরে উঠায় নিয়ে গেল চোখের সামনে দিয়া' রুদ্র বলল ওর ক্যাটস আই চোখগুলোকে গোল গোল বোতামের মতো বানিয়ে। 'হ তাই তো দেখলাম, ক্যামেরা-ট্যামেরা সব ফিটকা মাইরা ফালায় দিয়া দিলো দৌড়! সেইরাম তো!'

'হুম, একদম!'

একটা বারো তেরো বছরের বাচ্চা ছেলে হাতে ট্রে নিয়ে কড়ির মালা বিক্রি করছে। রুদ্রর হাত ধরে একটা টান দিয়ে বাচ্চাটা বলল, 'বাইজান, বাবীর জন্য একটা মালা খিনেন!

বাচ্চাটার কথায় কক্সবাজারের আঞ্চলিক টান। রুদ্র ঠিক ওর সুরটাই নকল করে বলল, 'না খিনব না যে!'

ত্যাঁদড় পিচ্চি রুদ্রর ফাজলামো বুঝতে পেরে দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'খেনো? বাবীকে যে সোন্দর লাগবে! একটা খিনেন না'

হৃদি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে বলল, 'বাবী জিনিসটা কী?'

রুদ্র ফিচেল হেসে বলল, 'ভাবী!'

হৃদি বাচ্চাটাকে ধমকে ওঠে বলল, 'ওই ছ্যাড়া! এইডা আমার বন্ধু।'

পিচ্চি আবার হাসে দাঁত বের করে, বলে, 'বুশচি তো বয়ফ্রেন্ড আরখি!'

রুদ্র হো হো করে হেসে উঠল। হৃদি তো হাসলোই না উপরন্তু মুখটাকে ভয়াবহ রকমের গম্ভীর বানিয়ে ফেলল। যেন তাকে নিয়ে এইমাত্র কোনো মারাত্মক রসিকতা করে ফেলা হয়েছে।

'মোটেও বয়ফ্রেন্ড না, ফ্রেন্ড, আমার ভাইয়ের মতো। তুমি যাও এখান থিকা, তোমারে আর পাকনামো করতে হবে না।'

'আচ্ছা যাব আর খি, একটা মালা খিনেন না, তারপর ছলে ঝাচ্ছি।'

'না কিনব না, তোমার কথাবার্তা পছন্দ হয় নাই।'

রুদ্র একটা কড়ির মালা কিনল। পাঁচ টাকা দাম। হৃদির মাথায় মালাটা বসিয়ে দিয়ে বলল, 'নে, তোর ভাইয়ের মতো বন্ধু তোকে কড়ির মালা উপহার

দিলো, এখন চোখ-মুখ স্বাভাবিক করে সাগরপাড়ে পোজ মাইরা দাঁড়া, ছবি তুলি, সকাল থেকে মুখটাকে এমন তেলাপোকার মতো বানায় রাখছস কেন?’

‘মানুষের মুখ কখনো তেলাপোকার মতো হয় না বুঝছিস? ফাউ কথা বলবি না।’

‘আয়নায় নিজের চেহারাটা এ মুহূর্তে দেখলেই বুঝতে পারতি যে মানুষের মুখও হঠাৎ হঠাৎ তেলাপোকার মতো হয়ে যায়।’

রোদ একটু পড়ে যাওয়ায় হৃদি এবার চোখ মেলে চাইতে পারল। পেছনে ফেনিল সমুদ্র নিয়ে, মাথায় টিয়ারার মতো সাদা কড়ির মালাটি পরে চমৎকার ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে। তারপর রুদ্রর হাতের ক্যামেরায় ক্লিক পড়তে থাকল একটার পর একটা।

এবারের ঢেউটা বিভার গলা অবধি ভিজিয়ে দিলো। পায়ের তলা থেকে সরে যেতে থাকল বালি। নরম মাটিতে পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হয়ে পড়ল মুশকিল। সামি শক্ত করে চেপে ধরল বিভার হাত। আরেকটা প্রকাণ্ড ঢেউ তখন তেড়ে আসছে ওদের দিকে। বিভা চিৎকার করে বলে উঠল, 'এইবার মরে যাব, আমি সাঁতার পারি না!'

ঢেউ এসে ভাসাল ওদের। চারিদিকে থইথই করা রুপালি জল। মাথার ওপর বিস্তীর্ণ আকাশ। জলের ওপর চিকচিক করে ঝিকোচ্ছে রোদ্দুর। ঢেউ কেটে যাবার পর বিভা আকুলিবিকুলি হয়ে বলল, 'আর না, ফিরে চল।'

সামির চোখে চোখ পড়তে হঠাৎ কেমন একটু বুক কাঁপল। ওর এই চোখের দৃষ্টিটা বিভা এর আগে কখনো দেখেনি। এ যেন তার এত বছরের পুরোনো চেনা বন্ধুটি নয়, এ যেন এক অচেনা পুরুষ।

আবার তীরের বেগে ছুটে আসলো প্রকাণ্ড এক ঢেউ। ডুবল ওরা। মুখে নোনতা স্বাদ।

ঢেউ কাটল। সামি সম্মোহিতের মতো বিভাকে টেনে নিল কাছে। আকস্মিক ঠোঁট দুটো বসিয়ে দিলো বিভার ঠোঁটে। সামির সিগারেট পোড়া কালো ঠোঁট মিশে গেল বিভার নরম ঠোঁটে।

তারপর আবার ঢেউ ভাঙল। বিস্মিত বিভার মুখখানা ঢেকে গেল স্রোতে। পানি গিলল ওরা। তাকাল একে অপরের দিকে গভীর সম্মোহনের চোখে।

চুমু খেল.... ঢেউ আসল, ডুবল, ভাসল... উঠে দাঁড়াল, আবার ডুবল ...

'কী লিপস্টিক মাখিস? এরকম আঠা আঠা কেন?' খানিকটা উত্তপ্ত গলায় বলে ওঠে সামি।

তারপর হঠাৎ ফুঁসে ওঠা প্রলয়ংকরী কালবৈশাখী ঝড়ের মতো শক্তিশালী একটা চড় এসে পড়ে ওর বাম গালে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিভার কর্কশ চিৎকার এসে কানে লাগে, 'তোর এত বড় সাহস? নিজেকে কী ভাবিস? এটা কী করলি তুই? কীভাবে পারলি করতে? হ্যাঁ? লুইচ্চা কোথাকার!

বলেই বিভা চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে, জোয়ারের পানি পায়ে ঠেলে, ধীরে ধীরে সৈকতের দিকে হরেক মানুষের ভিড়ে অদৃশ্য হলো। চড় এসে পড়া গালটায় হাত রেখে বিস্মিত সামি বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল সে অদৃশ্য হওয়া দৃশ্যটির দিকে, অনেকক্ষণ।

'শোনেন ভাই, আপনার আচারে বালু!' অত্যধিক হতাশ গলায় কথাগুলো বলে উঠল হৃদি। মার্কেটে গিজগিজ করা মানুষের ভিড়। বিকেলের আলো মরল খানিক আগে।

দোকানদার ছেলেটি চোখ কপালে তুলে বলল, 'ও বাপ! কী বলতেছেন যে, বালু কোথায় পাচ্ছেন?'

হৃদি বাধ্য মেয়ের মতো উত্তর দিলো, 'এই যে, আমার মুখে' বলে মুখ হাঁ করে দেখাল দোকানদারকে। মুখের ভেতরে একটি বরইয়ের গোল বিচি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

দোকানদার ছোকরাটি খিক খিক করে হেসে ওঠে বলল, 'বালুত দেখা যাচ্ছে না, হুদা বিচি একখান!

হৃদি মুখ বাঁকাল, 'বালু দেখা না গেলে কী হবে, আমি টের পাচ্ছি, আমার সারা মুখে বালু কিচ কিচ করছে। না ভাই, আপনার আচার নিব না।

'আমারটা না নিলে আর কারোটা নিতে পারবেন না বুশচেন? এটা হচ্ছে যে এই মার্কেটের সেরা আছার।'

'থাক! বালু মিশাইন্না সেরা আচার আমার লাগব না।'

'না নিলে না নিবেন, কিন্তু মিথ্যা কথা তো বলতে পারেন না, আমার আছারে বালুর ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নাই।'

বাকবিতণ্ডার এ পর্যায়ে অমৃতা এসে হাজির হলো, হৃদিকে বলল, 'এ কী করিস? এদিকে আয়।'

অমৃতা হৃদির হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পরের আইলে। পেছন থেকে দোকানদারের কর্কশ গলার স্বর ভেসে আসতে থাকল। সে চড়া গলায় বলছে, 'ট্যাকা খরচ করার ইচ্ছা নাই সেইটা বললেই তো হয়, আমার আছারের দুষ কেন দিবেন?'

হৃদি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'দ্যাখনা ব্যাটা করতেসে কী! মনটা চাইতাছে একটা লাথি মারি হারামজাদার... '

'থাক মুখ খারাপ করিস না, তুইই বা অত কথা বলতে গেছিস কেন? এদের

সাথে বেশি কথা বলতে হয় না। কথা বললেই ফাজলামো করার চান্স পায়।

'আরে আচারটা তো ভালোই আছিল, নিতে চাইছিলাম, কিন্তু মুখে দিয়া দেখি খালি বালু আর বালু, কিন্তু খাইতে বেশ।'

অমৃতা চোখ পাকিয়ে বলল, 'গাধার মতো কথা বলিস না তো, বালু হইলে আবার খাইতে বেশ হয় কেমনে?'

হৃদি স্বগতোক্তি করল, 'তাও ঠিক, কোনো এক রহস্যজনক কারণে, বালু মিশ্রিত আচারটা খাইতে বেশ ছিল, শুধু পেট খারাপ হওয়ার ভয়ে নিলাম না।'

মার্কেট থেকে বেরোতেই মুখোমুখি বিভাকে পেয়ে গেল ওরা। বিভার সারা গা ভেজা। ভেজা চুল থেকে টুপটাপ মাটিতে ঝরে পড়ছে পানি। চোখে লেপ্টে আছে কাজল। সব মিলিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা তার।

'কী মহারানি? কই থিকা আইলেন? সারা দুপুর কোনো খবর নাই আপনার?' অমৃতা বলল।

'হুম, সমুদ্রে নামছিলাম, শোন আমি হোটেলে যাচ্ছি, চেঞ্জ করতে হবে। কাপড়চোপড় ভিজে গেছে।'

'তাই তো দেখছি, কিন্তু ভিজা কাপড়ে তোমাকে খুব সেক্সি লাগছে, একদম সেরকম!' বলে এক চোখ টিপল হৃদি।

'আজাইরা কথা বলিস না তো, আমি গেলাম।

বিভা আর দাঁড়াল না।

'ওর কী হইছে?' অমৃতার মুখ থেকে কথাগুলো ছিটকে বেরিয়ে এলো।

'ঢং হইছে, ঢং ছাড়া আর কিছু হয় নাই। আচ্ছা শোন, বলত রবিনের জন্য আমি কী গিফট নিয়ে যাব?'

হেঁটে হেঁটে রাস্তায় ওঠে আসল ওরা। রোদ পড়ে যাওয়ায় এখন একটু শীত শীত লাগছে। পায়ে আঠার মতো লেগে থাকা বালুগুলো অস্বস্তির উদ্রেক করছে। অমৃতা স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'কোন রবিন?'

প্রশ্নটা শুনে হৃদি বেশ বিরক্ত হলো, ঝাঁঝালোভাবে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করল, 'কয়টা রবিনকে চিনিস তুই?'

অমৃতা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'অনেকগুলা রবিনকে চিনি, রবিনহুড, তিন গোয়েন্দার রবিন মিলফোর্ড, হাও আই মেট ইওর মাদারের রবিন...'

'আমি আমার রবিনের কথা বলছি!' অমৃতাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে

হুঙ্কার ছাড়ল হৃদি।

'তোর রবিন মানে? ও, তোর বয়ফ্রেন্ড?' দায়সারাভাবে বলে অমৃতা

ওই দায়সারা কথার ধরন হৃদির মনটা খারাপ করে দিলো। দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা। সে জানে কারণে বা অকারণে অমৃতা রবিনকে পছন্দ করে না। কিন্তু তাই বলে কি প্রতিবার রবিনের প্রসঙ্গ উঠলেই ভাব ভঙ্গিতে এই বিরূপ মনোভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হবে? বেস্ট ফ্রেন্ডের কাছে জীবনের বিশেষ মানুষটির মূল্য না থাকাটা যে কতটা কষ্টের তা হৃদির চাইতে ভালো আর কেউ জানে না।

সন্ধ্যাতারাটি মিটমিট করে জ্বলছে। কাছেই উঁকি দিয়েছে গোল চাঁদ। আকাশ পরিষ্কার। ঝাউ বনের মাথায় জমেছে পাতলা কুয়াশার প্রলেপ। হাওয়া ঠাণ্ডা। ভাটার সময় বলে লোকজন কমে গেছে কলাতলির সৈকতে। কোনো কোলাহল নেই এ মুহূর্তে। শুধু সমগ্র চেতনা সঙ্গে নিয়ে জেগে আছে সাগর। নিরবচ্ছিন্ন ভেসে চলেছে তার হুঙ্কার সন্ধ্যার বাতাসে।

অন্ধকার বালুতটে হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে ছিল আকাশ। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সন্ধ্যাতারাটির দিকে। এ মুহূর্তে যেন মিটমিটিয়ে জ্বলতে থাকা তারাটিই তার একমাত্র আপনজন। চারদিকে যেন আর কেউ নেই, কিচ্ছু নেই।

কাছেই রুদ্র বসে আছে বালুর ওপর লেপ্টে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। অন্ধকারে তার মুখখানি দেখা যায় না, শুধু দেখা যায় অগ্নি বিন্দুর ওঠানামা।

‘কী ভাবিস?’ রুদ্র প্রশ্ন করল।

‘শৈশব।’

হেসে উঠল রুদ্র, ‘হঠাৎ এত নস্টালজিক হয়ে গেলি?’

আকাশ কয়েকটা মুহূর্ত চুপ থেকে কেমন অন্য গলায় বলল, ‘আম্মাকে মনে পড়ছে।’

‘আই এম সরি।’ রুদ্র বলল।

‘শেষ বার কক্সবাজার এসেছিলাম আম্মার সাথে। তখন কে জানত আর কটা বছর পরেই আম্মা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এ পৃথিবী থেকে।’

রুদ্র চুপ করে থাকল। চারপাশ নীরব। শুধু বাতাস বয় শোঁ শোঁ আর ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ এসে ধাক্কা খায় সাগরপারে।

‘আম্মা মারা যাবার পর জানিস পৃথিবীটা কেমন বদলে গেল! হারিয়ে গেল শৈশব। সে সুন্দর সুন্দর ঘ্রাণগুলো আর পাই না এখন।’ আকাশের গলাটা অন্যরকম শোনায়।

‘জীবন গতিশীল, পৃথিবী গতিশীল। শুধু তোর জীবন না, পুরো পৃথিবীটাই তো পাল্টাচ্ছে প্রতিনিয়ত তাই না? পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখ, পৃথিবীটা ভালো

নেই একদম, সে তুলনায় তুই, আমি আমরা অনেক ভালো আছি।’

‘ভালো নেইরে, কেউ ভালো নেই, যারা ভালো আছে বলে ধারণা করছে তারা আসলে ভুলে আছে। এ পৃথিবী ভালো থাকার জায়গা না, ভুলে থাকার জায়গা।’

‘হুম অথচ এ সমগ্র মহাকাশমণ্ডলীতে, এই এত গ্রহ নক্ষত্রের ভিড়ে পৃথিবী এক এবং অনন্য। পুরো মহাকাশে শুধুমাত্র পৃথিবীই একা একা প্রাণের বোঝা মাথায় নিয়ে চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, হায়রে পৃথিবী! সুবিশাল মহাকাশের বুকে শুধু একটা ব্লু পেল ডট ছাড়া কিছুই না।’

‘সেটা কী?’

‘কার্ল সেগানকে চিনিস? তিনি একজন আমেরিকান এস্ট্রোনমার ছিলেন। উনার একটি উক্তি আমার খুব ভালো লাগে। যেখানে তিনি পৃথিবীকে একটি ব্লু পেল ডটের সাথে তুলনা করেছেন। একটি ক্ষীণ নীল বিন্দু।’

‘আসলেই!’ আকাশ বলল অনেকটা স্বগতোক্তির মতো।

‘হয়তো একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীর সাথে অন্যান্য গ্রহের যুদ্ধ লাগবে, ম্যান ভার্সাস এলিয়েন। সেদিন নিশ্চয়ই মানুষে মানুষে যুদ্ধ বন্ধ হবে, তাই না রে? পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্য জাতি সেদিন এক হবে। একটি পক্ষ হবে। আমার খুব সে দিনটাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

আকাশ হাসে, বলে ‘চাইল্ডিশ, বাট ইন্টারেস্টিং।’

‘কী করিস তোরা?’

কথাটা হঠাৎ ভেসে আসলো অন্ধকারে। সামির কণ্ঠস্বর। আকাশ শোয়া থেকে ওঠে বসতে বসতে বলল, ‘কী রে তুই সে দুপুরের পর থেকে হাওয়া। কই ছিলি?’

সামি ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, ‘এইতো ছিলাম কাছেই। একটা বিড়ি দে তো!’

রুদ্র পকেট থেকে সিগারেট বের করে দিলো সামির হাতে, বলল, ‘তোর গলা এরকম শোনাচ্ছে কেন? কিছু হয়েছে নাকি?’

সামি সিগারেট ধারাল। লাইটারের আগুনের হলকায় তার চিন্তিত মুখটা খানিকক্ষণের জন্য আলোয় ভাসল। নীরবে দু তিনটা টান দেবার পর সে খুব চিন্তিত গলায় বলল, ‘শোন একটা ঝামেলা হয়েছে।’

‘কী ঝামেলা?’

‘আজকে দুপুরে... একটা কাহিনি হইছে।’

‘কী কাহিনি?’ রুদ্রর আর তর সইছে না।

‘আমি আর বিভা, আমরা সাগরে নামছিলাম।’

‘তো? বিভা ঠিক আছে তো? ডুবে যায় নাই তো?’

‘আরে না!’

‘তাহলে?’

‘সবকিছু ঠিকই ছিল, বাট সাডেনলি... আই ডিড সামথিং অফুল।’

‘কী করছিস তুই?’ উত্তেজনার ঠ্যালায় মরি মরি অবস্থা তখন বাকি দুজনের।

‘আই কিল্ড হার’

‘কী?’

রুদ্রর চোখদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। আকাশ অবিশ্বাসের গলায় বলল, ‘আমি বুঝলাম না, তুই কী করেছিস? আবার বল তো?’

সামির মেজাজ মর্জি ভালো না। সে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘তুই একটা বাল। কানে শুনিস না? আমি ওরে কিস করছি, এন্ড দেন শি কিস্‌ড মি ব্যাক।’

আকাশ আর রুদ্র দুজনেই সামির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন পৃথিবীর ইতিহাসে এহেন আজগুবি কাণ্ড এই প্রথম ঘটল।

‘তোদের দুজনের ভেতর কি কিছু চলছে?’ রুদ্র প্রশ্ন করল সাবধানে।

‘হেল, নো! কিছু চললেতো আর কোনো প্রব্লেমই ছিল না, এতটুকু বুদ্ধিও মাথায় নাই, অ্যাসহোল কোথাকার!’

‘কিন্তু ব্যাপারটা তো এক তরফা ছিল না তাই না?’ আকাশ বলল।

‘একতরফা ছিল না, কিন্তু সবশেষে সে এমন রিঅ্যাকশন দেখাল যে মনে হচ্ছিল পুরাটা আমারই দোষ।’

‘মানে?’

সামি চুপ করে একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর থমথমে গলায় বলল, ‘সে আমাকে থাপ্পড় মারছে।’

‘কী কস?’

‘শুধু তাই না, সে আমাকে লুইচ্চা ডাকছে, ক্যান ইউ ইমাজিন?’

‘আজব তো!’ মুখ দিয়ে শব্দটা আনমনে বেরিয়ে আসলো রুদ্রর

তারপর কিছুটা সময় নীরব কাটল। অপলক সামির অন্ধকার মুখের দিকে কিছু সময় চেয়ে থেকে আকাশ বলল, ‘এ কাজটাতো ঠিক হলো না। এইটা ও কী

করল!'

সামি আগের চাইতেও গম্ভীর গলায় বলল, 'দ্যাখ আমি জানি আমার ভুল হয়েছে। বিভা আমার ফ্রেন্ড। আমার কাছে তোরা যেমন বিভাও ঠিক তেমনই। সবাই সমান। কোনো বিভেদ নেই।'

এ কথা শুনে আকাশ লাফ দিয়ে সামির কাছ থেকে এক হাত দূরে সরে গেল। জমানো গলায় বলল, 'খাইছে, কস কী দোস্ত? বিভার সাথে আমাদের কোনো তফাত নাই? আল্লাহ্! দূরে যা, দূরে যা! বলা যায় না কোন সময় আবার আমাদেরকেও ধইরা চুম্মা দিয়া দিবি।'

রুদ্র হো হো করে হেসে উঠল।

সামি গমগম করে বলল, 'ইফ ইট ওয়াজ আ জোক, দেন লেট মি অ্যাশিওর ইউ, আই এম নট ইন দ্যাট মুড। সো ব্যাক অফ!'

'ভয় পাইছি!' বলে রুদ্র বুকে ফু দিলো। আকাশ রুদ্রর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দেবার ঢঙে বলল, 'ফু দিয়া লাভ নাই দোস্ত, ছেপ দে, ভয় কমব!'

রুদ্র তাই করল। সামি ভ্রু কুঁচকে বলল, 'মামা তোমরা কি মজা নিতাছ আমার লগে?'

'একটু একটু।' রুদ্র বলল।

'ওকে, তাহলে এখন টপিকটা বাদ দেই। কারণ আমার এ মুহূর্তে মজা করার মুড নাই।'

'আচ্ছা শোন, আমি বলি কি, যা হবার হয়েছে, তুই বিভার সাথে সরাসরি কথা বল। ফ্রেন্ডই তো!' আকাশ বলল।

'অসম্ভব! আমি ওর সাথে কোনো কথাই বলব না। দোষ তো আমার একার ছিল না? তাহলে ও কেন আমাকে চড় মারবে? কেন আমাকে অপমান করবে? আই উইল নেভার ফরগিভ হার। নেভার এভার!' সামি দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

অমৃতা বিভার দিকে সরু চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'ঘটনা ঘটার সময় কি তোর ভেতরে কোনো ফিলিংস কাজ করেছে?'

বিভা চমকে উঠল, 'ফিলিংস? নো ওয়ে! নো ফাকিং ওয়ে!'

অমৃতা বিছানায় পা তুলে বসতে বসতে বলল, 'তাহলে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটানোর মানে কী? শয়তান ভর করছিল মাথায়?'

বিভা মিনমিন করে বলে, 'তাই হবে!'

হৃদি বলল, 'শোন এখন আমার কথা হচ্ছে যা হবার হয়েই গেছে, ভুলে যা ব্যাপারটা। একদম ভুলে যা। লেট বাই গনস বি বাই গনস।'

বিভা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'ভুলে যাওয়া কি অত সোজা? আর তাছাড়া আমি ওকে থাপ্পড় মারছি, এখন মনের মধ্যে একটা গিলটি ফিলিংস কাজ করতেছে।'

'থাপ্পড় মারছস ক্যান? আল্লাহ্ পাগল নাকি? থাপ্পড় মারলে তো সবার প্রথমেই তোমার মারা উচিত ছিল। তুমি নিজে আকামটা করার পর তো থাপ্পড় মারার কোনো মানে হয় না!'

'ও আমাকে ইনসিস্ট করেছে, তাই থাপ্পড় মেরেছি।'

হৃদি আর অমৃতা একে অপরের দিকে চাইলো। কেউ কোনো কথা খুঁজে পেল না। তাদের এই এত বছরের বন্ধুত্বে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটল এই প্রথম।

অমৃতা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ওর সেলফোনটা বেজে উঠল। চেম্বারের নাম্বার। ফোন ধরতে ওপাশ থেকে রাজু মোক্তার বলল, 'ম্যাডাম, স্যার বলছে কালকে সকালের মধ্যে একটা বেইল পিটিশন লাগব। এখন ড্রাফট কইরা রাইতেই ইমেইল করতে বলছে উনারে। আমি আপনারে পিটিশনারের নামধাম আর ফ্যাক্ট মেইল করতাছি। খুব আর্জেন্ট।'

'রাজু শুনো, আমি ঢাকার বাইরে আছি, একটা ব্যক্তিগত কাজে খুব ব্যস্ত। তাছাড়া কাল আমি কোর্টেও আসছি না।'

রাজুর স্বভাব হচ্ছে কথায় কথায় জিব কাটা। অমৃতা বুঝল তার কথাটা

শোনা মাত্র রাজু মোবাইলের ওপাশ থেকে জিব কাটল, তারপর বলল, 'ম্যাডাম কী কন? স্যাররে আমি কী কমু?'

'স্যারকে তোমার কিছু বলা লাগবে না, যা বলার আমিই বলব, তুমি পিটিশনের কাজটা আপাতত রাশেদ ভাইকে দাও। হি উইল টেক কেয়ার অফ ইট।'

'ওকে, কিন্তু আফনে কবে আইবেন?'

'দু একদিনের মধ্যে ফিরছি।' বলে অমৃতা ফোন কাটল। কিন্তু চিন্তার একটা ক্ষীণ রেখা তার কপালে ফুটে রইল অনেকক্ষণ।

বন্ধুদের হই হুল্লোড়ে চেম্বারের কথা বেমালুম ভুলে বসে ছিল সে। আগামীকাল রবিবার। এইমাত্র মনে পড়ল সকাল দশটার সময় নারী ও শিশু নির্যাতন ৩ এ একটা টাইম পিটিশন আছে। যার দায়িত্ব ছিল অমৃতার ওপর। ইস! স্যারকে এখন সে কী করে বলবে এই হঠাৎ ঢাকা ছেড়ে পালানোর গল্পটা?

আড্ডায় মন বসল না আর তার। মোবাইল হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে আসলো। রহমান স্যার আজকাল তার ওপর একটু বেশিই নির্ভর করছেন। স্যার বর্তমানে পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ঢাকা শহরের সেরা ফৌজদারি আইনজীবীদের তালিকায় তার নাম এখন সবার ওপরে। চেম্বারে স্যারের জুনিয়র আছে অমৃতাসহ মোট পাঁচজন। এদের মাঝে রাশেদ ভাইয়ের মতো অভিজ্ঞ প্র্যাক্টিশনারসও আছেন। অমৃতা খুব অল্প সময়ে স্যারের প্রিয় জুনিওরদের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে। জায়গাটা তাকে কেউ দয়া করে দিয়ে দেয়নি। কষ্ট করে অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু এই হুট করে না বলে কয়ে চেম্বার কামাই করাটাকে স্যার কীভাবে নেবেন কে জানে। সে রাশেদ ভাইয়ের নম্বরে ডায়াল করল। স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলার সাহস হচ্ছে না। রাশেদ ভাইকেই অনুরোধ করা যাক বিষয়টা দেখভাল করার।

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। হৃদি ওঠে গিয়ে খুলল। রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। রুদ্রর চোখের দিকে তাকানো মাত্র কী করে যেন হৃদি বুঝে গেল সামি আর বিভার ঘটনাটি রুদ্ররও অজানা নেই। ওর চোখের চাউনিতে যে ভাবটা স্পষ্ট তা হলো, 'ঘটনা শুনছস নাকি?'

হৃদি ওর ওই চাউনি পাশ কাটিয়ে বলল, 'কী চাই?'

'তোদের প্ল্যান কী? সারারাত দরজা বন্ধ কইরা কাটায় দিবি, এটাই প্ল্যান?'

'না আপাতত প্ল্যান হলো হান্ডিতে গিয়া ডিনার করব। তারপর ফুল নাইট

পার্টি অন!'

'তাহলে বের হ, হোটেলে বইসা থাইকা লাভ নাই।'

'হুম, বের হবো, আমাদের অ্যাডভোকেট আপা জরুরি আলাপ করছেন ফোনে, আপার কথা শেষ হইলেই বের হচ্ছি।'

'ওকে' বলে রুদ্র সরে গেল দরজার ওপাশ থেকে।

হান্ডি রেস্তোরাঁয় এসে দেখা গেল জনসমাগম প্রচুর। ফাঁকা টেবিল পাওয়া গেল না। আশপাশের অন্য রেস্তোরাঁগুলোয় আগে খাবার অভিজ্ঞতা নেই বলে ওরা আবার চলল ঝাউবনে। এবার শুধু সাদা ভাত, আলুর ভর্তা, ডাল আর মুরগির ঝোল। তাতেই ছয় জনের খাবারের বিল আসলো সাতশ বিশ টাকা। সামি ক্রেডিট কার্ড বের করতে যাচ্ছিল, অমৃতা থামাল ওকে, বলল, 'প্রতিবার তুই কেন টাকা খরচ করবি? এবার আমি দিচ্ছি।'

সামি চিমটি কেটে বলল, 'তাইতো, আমি তো তোদের দত্তক নেই নাই। অল দ্যা টাইম আমিই কেন টাকা খরচ করব? দে তুইই দে বিল'

সামির বলা কথাগুলো কানে ঢোকা মাত্র বিভার হঠাৎ জ্বলে ওঠা ফ্ল্যাশ লাইটের মতোই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। এখানে আসার আগে সামির কার্ড দিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকার বাজার করেছিল সে। সে টাকা দিয়ে কেনা জামা এ মুহূর্তে তার পরনে। সামির মাত্র বলা কথাটায় কি এ ব্যাপারটার দিকে কোনো চাপা ইঙ্গিত ছিল? এ মুহূর্তে ইচ্ছে করছে সামির ধার করা টাকাগুলো ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে। ইস! যদি পারত!

চব্বিশটা ঘণ্টা আগেও সামির টাকা নিজের জন্য খরচ করতে তার মনের মাঝে এতটুকু বাধেনি। অন্যের টাকা ধার করে খরচ করছে এ অনুভূতিটাই কাজ করেনি ভেতরে। সামি যে তার বন্ধু! বন্ধুরা যে তার আপনের চাইতেও বেশি আপন! বন্ধুরা যে তার আত্মার অংশ। বন্ধুর টাকা খরচ করতে কেন ইগো কাজ করবে? কিন্তু হায় এত বছরের পুরোনো, আপনের চাইতে আপন বন্ধটি হঠাৎ কেন অমন বন্ধুত্বের খোলস ছাড়িয়ে পুরুষমানুষ হয়ে উঠল? তার নিজের ওপরেও বা কোন সর্বনাশ ভর করেছিল সে রোদ দুপুরের নীল সমুদ্রে? হঠাৎ মনে পড়ল সামি স্বপ্ন দেখেছিল ওরা দুজন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে।

হায়! ভগবান কি তাহলে স্বপ্নের মাঝে এ সর্বনাশের ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন? কথাটা মনে হতেই চকিতে তাকাল বিভা সামির দিকে। তাকাল সামিও। সে চোখের দৃষ্টিতে রাগের চাইতে অভিমান বেশি। চোখ সরিয়ে নিল সামি। বিভা

বিড়বিড় করে বলল, ‘তোর দেখা দুঃস্বপ্নটি সত্যি হয়ে গেলরে সামি! সত্যি হয়ে গেল!’

‘তারপর, প্ল্যান কী?’ অমৃতার প্রশ্ন।

রাতের খাবার শেষ করে সবেমাত্র হোটেলে ফিরেছে ওরা। ফিরে আসার পর দলটা আবার দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বিভা আর হৃদি নিঃশব্দে ঢুকে গেছে ওদের ঘরে, আর অমৃতা রয়ে গেছে ছেলেদের দলে। কার্পেটের ওপর গোল হয়ে বসেছে ওরা চারজন। হলুদ আলোর একটা ল্যাম্বশেড জ্বলছে ঘরের ভেতর। বারান্দার দরজা খোলা। মাঘ মাসের শীত শীত হাওয়া ঢুকছে সে দরজা দিয়ে।

'কী আর প্ল্যান, মদ খাব, ডাইল খাব, পার্টি করব' এটুকু বলে সামি আবার সুর করে যোগ করল, 'গাঁজা খাব আটি আটি, মদ খাব বাটি বাটি।'

'ছি!' তাচ্ছিল্য নিয়ে বেশ জোরাল গলায় বলে উঠল অমৃতা।

সামি নাক মুখ কুঁচকে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছতে মুছতে বলল, 'এমনে কইরা 'ছি' বলিস না। মুখ দিয়া থুতু বাইর হয়।'

অমৃতা আবারো শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বলল 'ছিইইই!' এবার ওর বলা 'ছি'টা শুনতে লাগল 'ছ্যা!' এবং এবার সত্যিই বাতাসে ছিটকে কিছু তরল পদার্থ এসে পড়ল সামির মুখে। ল্যাম্বশেডের হলদে আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল সে দৃশ্য। আকাশ ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে বলল, 'এগুলো তোরা কী করতেছিস? ছি!' রুদ্রও তাল মেলাল, 'ছি! ছি! ছি!'

সামি আগুনের মতো জ্বলে উঠল, 'ফাইজলামি করিস? নোংরা মহিলা কোথাকার! একদম থুতু মারব মুখের মধ্যে!

অমৃতা হাসে, 'থুতু মারবি কেন? আমি কি তোকে থুতু মারছি? আমি শুধু বলছি, ছি!'

'তুই জানিস না কীভাবে কথা বলতে হয়, তোর দাঁতে সমস্যা আছে, তুই ঢাকায় ফিরেই ডাক্তার দেখবি।' সামি হুকুম করল।

'সমস্যা একটু আছে, তবে আমি এটাকে সমস্যা মনে করি না, স্কিল মনে করি, কারণ ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত। যখন কারো মুখে থুতু মারতে মন চায় তখন 'ছি' বলার ফাঁকে কাজটা করে ফেলি।

'ইউ আর আ সাইকো!' বলে সামি ওঠে পড়ল।

'কই যাস?'

'মুখ ধুইতে।'

'ফেসওয়াশ দিয়া ধুইস, তোর মুখটা এমনিতেই কেমন যেন কালা কুচকুইচ্চা দেখাইতেছে।'

সামি ওঠে যাবার পর আকাশ একটু চাপা গলায় অমৃতাকে বলল, 'কী রে তুই ওর লগে মজা নিতাছস কেন? বেচারার মেজাজ মর্জি এমনিতেই ভালো নাই, জানোস না বিভার সাথে কী ঘটনা ঘটছে?'

'ও আচ্ছা! এ জন্যেই দেবদাস মার্কা কথাবার্তা কইতেছিল? মদ খাব বাটি বাটি! তাই বল! আমিতো ভুইলাই গেছিলাম।'

অমৃতাকে তবুও দমানো গেল না। সামি ওয়াশরুম থেকে বেরোতেই সে ফিনফিনে গলায় বলল, 'দোস্ত, তুই বরং শুয়ে পড়, ঘুম দে একটা। তর দিনটা আজকে ভালো যাইতাছে না। দুপুর বেলা থাপ্পড় খাইছস, রাইতের বেলা থুতু, জাগনা থাকলে আরো কী না কী হইয়া যায় তার চেয়ে বরং ঘুমায় যা, অভিশপ্ত রাত্রির সমাপ্তি ঘটুক।'

সামি অমৃতার দিকে একটা আগুন দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

রুদ্রও ওঠে পড়ল। আকাশকে বসে থাকতে দেখে অমৃতা বলল, 'তুমি কেন বসে আছ? যাও যাও দেবদাসকে সান্ত্বনা দাও।'

আকাশ ভ্রু কুঁচকে তাকাল অমৃতার দিকে, 'তোর প্রবলেমটা কী?'

অমৃতা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই রুদ্র বারান্দা থেকে দৌড়ে এসে অমৃতার মুখের কথা কেঁড়ে নিয়ে বলল, 'পাশের ঘরে কিছু একটা হচ্ছে!'

পাশের ঘর বলতে বোঝানো হচ্ছে হৃদি আর বিভা যে ঘরে বর্তমানে অবস্থান করছে। বারান্দাগুলো একদম পাশাপাশি হওয়ায় এক ঘরের কথা বারান্দার পাতলা দেয়াল ভেদ করে অনায়াসে অন্য ঘরে চলে আসে।

'কী হচ্ছে? মারামারি?' নির্বিকার গলায় বলল অমৃতা।

'আরে না! সামথিং সিরিয়াস!'

'মারামারি জিনিসটাকে কি তোর সিরিয়াস কিছু মনে হয় না? মানুষ কি আনন্দে মারামারি করে?' আকাশের প্রশ্ন।

'সবসময় ফাজিল কথা বলিস কেন? হৃদি কিংবা বিভা কেউ একজন কান্নাকাটি করছে। কান্নার আওয়াজ পেলাম মনে হলো।'

অমৃতা বসা থেকে ওঠে দাঁড়াল। সাথে আকাশও। বারান্দার ডান দিকের

শেষ অংশ থেকে সাত কি আট ইঞ্চি ফাঁক রেখেই শুরু হয়েছে অপর বারান্দাটি। সে বারান্দার রেলিঙের কাছে কোনো মানুষ নেই। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ভেতরের দিকে কেউ একজন আছে এবং সেই কেউ একজনের গলার স্বর স্পষ্ট কানে আসছে ওদের।

হ্যাঁ, হৃদি কাঁদছে। চাপা কান্না নয়, একেবারে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

একটা ভয় খেলে গেল সবার মধ্যে। অন্ধকারে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। তারপর দৌড় দিয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে হামলে পড়ল পাশের ঘরের দরজায়।

অসংখ্যবার দরজা ধাক্কা দেবার পরেও হৃদি দরজা খুলছে না। এমন কী বিভারও কোনো সাড়া শব্দ নেই। ঠিক উল্টো দিকের ঘর থেকে বুড়ো এক ভদ্রলোক খালি গায়ে বের হয়ে ঘুম চোখে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে বাচ্চারা? মাঝরাতে হল্লা করছ কেন?'

রুদ্র শুকনো গলায় উত্তর দিলো, 'কিছু হয়নি চাচা, আপনি ঘুমাতে যান।

বুড়ো কিছুক্ষণ বডি গার্ডের মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওদের কাণ্ড। তারপর ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেল।

আকাশ হঠাৎ ঝড়ের বেগে ছুটল নিজেদের ঘরে। ঘর পেরিয়ে বারান্দায়। চোখের পলকে লোহার পাতলা রেলিং ডিঙিয়ে দাঁড়াল কার্নিশে। পেছন থেকে ছুটে আসল বন্ধুরা। অমৃতা চিৎকার করে বলল, আকাশ খবরদার! রিস্ক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!'

সামি আর রুদ্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে থাম থাম! করছিস কী?'

আকাশ কানকাটা হয়ে ঝুঁকিটা নিয়েই নিল। আঁধার রাতে অন্ধের মতো চোখ বন্ধ করে লাফ দিলো চার ফিট দূরত্বে অবস্থানরত অপর বারান্দার কার্নিশে। একটু এদিক-সেদিক হলেই দোতলা থেকে পড়ে হাত পা ভাঙার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেল সে গন্তব্যে। রেলিং ডিঙিয়ে দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল বারান্দার মেঝেতে। অন্ধকারে আবছা দেখতে পেল হৃদিকে। হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে। মাঝরাত্তিরে আকাশকে ওরকম আকাশ থেকে ঝপ করে পড়তে দেখে হৃদি পিলে চমকে উঠল।

'ও আল্লাহ! এইটা কী!' বলে গগনবিদারী চিৎকারে ফেটে পড়ে সে পড়িমরি করে ওঠে ঘরের ভেতরে ঢুকে বারান্দার দোর আটকে দিলো।

আকাশ কিছু বুঝে উঠতে না পেরে গাড়লের মতো বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

হৃদি দ্রুত পায়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসলো ঘর থেকে, হোটেলের লবিতে। বেরোতেই অমৃতাদের মুখোমুখি।

হৃদির কান্নাজড়ানো ফোলা চোখ দুটো ভয়ে বোতাম হয়ে গেছে তখন। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কোনো রকমে সে বলল, ‘আমাদের বারান্দার রেলিং বেয়ে কী যেন একটা উঠে আসছে! খাড়া খাড়া চুল, শজারুর মতো! অন্ধকারে ঠিক মতো বোঝা যায় না। চোর ডাকাত কিছু একটা হবে! সিকিউরিটি ডাক! এখুনি!’

তিন মূর্তি স্তব্ধ চোখে চেয়ে রইল তার দিকে। কয়েকটা সেকেন্ড অমন থ মারা ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে রইল ওরা। চোখে বিস্ময়। মুখে রা নেই।

হৃদি অধৈর্য হয়ে বলল, ‘দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সিকিউরিটি ডাক, চোর এসেছে!’

জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা অদ্ভুত এবং দুর্লভ ঐতিহাসিক বস্তুর দিকে মানুষ যেমন কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমনভাবেই তাকিয়ে রইল ওরা হৃদির দিকে।

সামিই নড়ল প্রথম। কোনো কথা না বলে পা বাড়িয়ে হৃদিদের ঘরে ঢুকল আকাশের খোঁজে।

সামি ঘরের ভেতর ঢুকতেই বাম পাশের দরজাটা খট করে খুলে গেল। মাথায় তোয়ালে পেঁচিয়ে বাথরুম থেকে বেরোল বিভা। তার পরনে একটা হলুদ টপ আর লাল স্কার্ট। বেরোতেই সে পড়ল সামির মুখোমুখি। ভালোই চমকাল। ঘরের ভেতর জ্বলছে ল্যাম্বশেডের টিমটিমে হলদে বাতি। সে টিমটিমে আলোয় বিভার চমকে ওঠাটা সামি স্পষ্ট টের পেল। বিব্রতভাবে তাকাল একবার বিভার দিকে। চারটা চোখ চুম্বকের মতো আটকে রইল কয়েকটা মুহূর্ত।

বিভা চোখ সরাল। বিব্রত সামি হেঁটে এগিয়ে গেল বারান্দায় এবং এই প্রথম সে আবিষ্কার করল, তার বুক কাঁপছে। দ্রিম দ্রিম ড্রাম বাজছে বুকের ভেতর। বিভা ঠিক সে আগের বিভা নেই। সে নিজেও ঠিক আর আগের মতো নেই। পৃথিবীটা পাল্টে গেছে।

বারান্দার দরজা খুলে দেখা গেল রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ উদাসভাবে সিগারেট টানছে।

'খুব তো হিরোগিরি করলি, বাঁশটা কেমন ছিল?'

আকাশ কিছু বলল না।

ঠিক সে সময় ঝড়ের গতিতে হৃদি প্রবেশ করল দৃশ্যপটে। ওর পেছন পেছন বাকিরাও। ছুটে গিয়ে আকাশের দুহাত শক্ত করে চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'ওহো দোস্তো! ভুল হয়ে গেছে, আমি খুব সরি, তুই আমার জন্য রিস্ক নিয়া সুপারম্যানের মতো জাম্প করছস, আর তোরে আমি শজারু মনে করছি, চোর ডাকাত মনে করছি, সরি দোস্ত, সত্যি আমি খুব সরি। আমাকে মাফ করে দে!' এই বলে হৃদি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আকাশ ওর মাথায় একটা হাত রেখে বলল, 'তুই কাঁদছিস কেন এভাবে সেই তখন থেকে? কী হয়েছে বলবি তো? আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' হৃদি কান্নার দমকে কথা বলতে পারল না। বিভা বলল, 'রবিন ভাইয়ের সাথে ব্রেকআপ হয়ে গেছে।

কথাটা মাটিতে পড়তে পারল না। তার আগেই অমৃতা বলে উঠল, 'আলহামদুলিল্লাহ্'

অমৃতার 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা শুনে হৃদির কান্না আরো বেড়ে গেল। রুদ্র খুব সিরিয়াসভাবে বলল, 'খারাপ সংবাদ শুনলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে হয় না, বোকা!'

ওরা হৃদিকে অসুস্থ মানুষের মতো ধরে ধরে ঘরে নিয়ে আসলো। হৃদি হাঁটতে পারছে না। ভ্যা ভ্যা করে বাচ্চাদের মতো কাঁদছে। লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। সে এক ভারি সিনেমাটিক দৃশ্য।

বন্ধুরা সব তিন চার মিনিট ঝিম ধরে বসে ওর কান্না দেখলো। কী করা যায়, কী বলা যায় কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না তারা।

রুদ্র এক সময় থমথমে গলায় বলল, 'তুই যদি এভাবে কাঁদতে থাকিস না হৃদি, তাহলে শুনে রাখ ওই হারামজাদার গায়ে একটা হাড্ডিও আস্ত থাকবে না। ভেঙে গুঁড়া গুঁড়া কইরা দিমু অর অস্থি মজ্জা সব!'

এ কথা শুনে হৃদি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কান্না থামানোর চেষ্টা করে বলল, 'না না ওর কোনো ক্ষতি করিস না।'

'কেন করব না? আমার ফ্রেন্ডরে এমন কান্দাইতেসে, ওই খানকির পোলার সাহস কত বড়!'

অমৃতা বলল, 'আহ্ মুখ খারাপ করিস না!'

সামি বলল, 'না সিরিয়াসলি, ওই ব্যাটার প্রবলেম কী? আমারতো শালারে প্যাদাইতে মন চাইতেছে। কী বলছে ও তোকে হৃদি? বল আমাদেরকে?'

হৃদি কোনো কথা বলল না।

বিভা বলল, 'আচ্ছা দাঁড়া, আমি রবিন ভাইরে ফোন দিতেছি। দেখি কী বলে সে।'

হৃদির বয়ফ্রেন্ডের সাথে বিভারই যা একটু সুসম্পর্ক আছে। অমৃতা যেমন দু চোখে দেখতে পারে না রবিনকে ঠিক তেমনি রবিনও অমৃতাকে একটা ফোঁটা পছন্দ করে না। কোনো এক অজানা কারণে দুজনের ভেতরে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

বিভা রবিনের নম্বরে ডায়াল করল। হৃদি সোফায় আধশোয়া অবস্থায় ভূতগ্রস্তের মতো চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। বাকিরা সব বিছানায় পা তুলে বসা। বিভা ফোনটা লাউডস্পিকারে দিলো। বেশ কটা রিং পড়ার পর ওপাশ থেকে একটা গলার আওয়াজ ভেসে আসলো। কান পাতলো সবাই।

'হ্যালো রবিন ভাইয়া?'

'হুম বিভা, বলো।' ভারী গলায় বলল ফোনের ওপাশের মানুষটা।

'ইয়ে, ভাইয়া আপনাদের মধ্যে কি কিছু হয়েছে? মানে হৃদি খুব আপসেট তো, তাই ভাবলাম আপনাকে একটা ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'আমাদের ব্রেকআপ হয়ে গেছে।' নির্বিকার এবং নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি। ওরা সবাই একে অপরের মুখের দিকে চাইলো। হৃদি প্রাণপণে কান্না চাপাচ্ছে।

'হঠাৎ করে এসব কী হলো ভাইয়া? মানে কেন? আপনাদের এত বছরের রিলেশন।'

'হুম আমাদের দু বছরের সম্পর্ক। এ দু বছরে একটা ব্যাপার আমি খুব ভালো মতো বুঝে গিয়েছি যে হৃদির জীবনে ওর বন্ধুরাই সব, আমি কিছু না।

'কী বলছেন ভাইয়া?'

'ঠিকই বলছি। হুট করে আমাকে না বলেকয়ে কক্সবাজার চলে গেল, আজকে কক্সবাজার গেছে, কালকে কোথায় যাবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে?'

'যেখানেই যাক আপনি তো জানতে পারবেন ভাইয়া, ও তো কিছু লুকোয়নি আপনার কাছ থেকে তাই না? কক্সবাজার আসার ডিসিশনটা আমরা নিয়েছি। ওর কোনো দোষ নেই।

'দোষ গুণের কথা বলছি না, ব্যাপার হলো ওর প্রায়োরিটি আমি নই, প্রায়োরিটি ওর বন্ধুরা।

'এটা কোনো কথা না ভাইয়া।'

'এটাই কথা, হুটহাট একগাদা ছেলেপেলে নিয়ে কক্সবাজার চলে যাবে, এগুলো কোন দেশের নিয়ম শুনি? এটা কি বিলাত আমেরিকা নাকি হ্যাঁ? সবকিছুর একটা সীমা আছে বিভা! দুটা বছর ধরে আমি ওকে বহুবার বলেছি বন্ধুদের নিয়ে এতটা বেলেল্লাপনা আমার পছন্দ না। ঠিক আছে ছেলে বন্ধু থাকতেই পারে, কিন্তু তাই বলে এতটা বাড়াবাড়ি কেন? আমারও মেয়ে বন্ধু আছে! তাই বলে তো আমি রাতের পর রাত আমার মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি করছি না।'

শেষের কথাগুলো দলটির মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তির উদ্রেক ঘটাল। স্বাভাবিকভাবেই দলের ছেলেরা একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ল।

বিভা আমতা আমতা করে বলল, 'আমাদের বন্ধুরা আসলে শুধুই বন্ধু ভাইয়া। ওরা ভালো, ভদ্র ছেলে। আপনার টেনশন করার কিছুই নাই।' কথাটা গুছিয়ে বলতে পারল না বিভা। কেমন এলোমেলো লাগছিল।

'ওরা কেমন তা আমি জানি বিভা। আমি চিনি সবাইকে, তোমার বন্ধুদের পক্ষে সাফাই না গাইলেও চলবে।'

'তাহলে প্রবলেমটা কোথায় তাই তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমার গার্লফ্রেন্ড একটা ছেলেঘেঁষা মেয়ে, এটা আমি মানতে রাজি নই! প্রবলেম এটাই, বুঝলে?' রবিন বলল।

নির্বিকার গলায় মাত্র বলা সংলাপটা ঘরের ভেতর একটি চাপা বিস্ফোরণ ঘটাল। মুহূর্তের মাঝে সকলের মুখে একটা বিষাদময় অপমানের ছায়া টলমল করে উঠল। কেউ কোনো কথা বলল না। মনে হয় কিছুটা সময় হাতে নিয়ে কথাটা হজম করার চেষ্টা করল ওরা।

বিভা অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'এটা আপনি কী বলছেন? হৃদি ছেলেঘেঁষা মেয়ে হবে কেন? দিস ইজ এবসার্ড!'

রবিন ওপাশ থেকে কাঠ হেসে বলল, 'তোমার কাছে এবসার্ড লাগাটাই স্বাভাবিক। ওই তোমরা সব তো একই নদীর জলের মাছ, তুমি কী বুঝবে?'

অমৃতা হঠাৎ বন্য হিংস্র জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মোবাইলটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আক্রোশে ফেটে পড়ে বলে উঠল, 'ছেলেঘেঁষা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন

আপনি?'

অমৃতার গলার স্বর চিনতে পেরে রবিন বোধ করি একটু থমকাল। দু তিনবার কেশে গলা পরিষ্কার করল, তারপর বলল, 'এর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দিতে যাব কেন? আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি। ওর সাথে আমার এখানেই সমস্ত সম্পর্ক শেষ।'

'সম্পর্ক শেষ হয়েছে সেটা খুব খুশির খবর। কেন জানেন? কারণ আপনি ওর যোগ্য কোনোকালেই ছিলেন না।'

'হ্যাঁ, তাতো বটেই আমার যে তোমাদের মতো বন্ধু বিলাস করে বেড়ানোর সময় নেই! যোগ্য হবো কী করে?'

'বন্ধুবিলাস করার মতো মন থাকলে তো করতেন! বন্ধু কী তাই তো আপনি জানেন না! আপনি কী করে বন্ধুবিলাস করবেন?'

রবিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, এখন তোমার ফালতু প্যাঁচাল শোনার সময় নেই আমার, ছাড়ছি।'

'ছাড়ুন, তবে ছাড়ার আগে একটা কথা কান খুলে শুনে রাখুন, আমার বন্ধুকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলার আগে একশ বার ভেবে নেবেন, আর যা জানেন না, যে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই সে সম্পর্কে কথা বলতে আসবেন না। একটা মেয়ের দু তিনটা ছেলেবন্ধু থাকলেই সে ছেলেঘেঁষা হয়ে যায় না, বুঝলেন? আর যদি হয়েও থাকে, তাতে আপনার কী? সে যেমন আছে সেভাবেই তো আপনি তাকে ভালোবাসবেন তাই না? মেয়েটা এখানে আসার পর থেকে শুধু আপনার কথাই বলছে, আপনাকেই মিস করছে আর আপনি কি না সে মেয়েটাকে এভাবে অবিশ্বাস করলেন? অপবাদ দিলেন?'

'শোনো অমৃতা, তোমার বন্ধুকে আমি দুটো অপশন দিয়েছিলাম আজ, বলেছিলাম যে হয় বন্ধুরা না হয় আমি, এ দুটোর মাঝে যে কোনো একটিকে চুজ করতে হবে, তোমার বন্ধু তোমাদেরকে চুজ করেছে। সে বলছে তোমাদেরকে ছাড়া সে বাঁচবে না। এর মানে সে আমাকে ছাড়া দিব্যি বাঁচবে। আমি ওর জন্য আমার পৃথিবী ছাড়তে প্রস্তুত ছিলাম। আর ও কি না সামান্য কজন বন্ধু আমার জন্য ছাড়তে পারবে না? সুতরাং তার ভালোবাসার পরীক্ষা আমার নেওয়া হয়ে গেছে। আমাকে ওর ফিলিংসের কথা শোনাতে এসো না।'

স্তব্ধ হয়ে গেল অমৃতা। ঘরের বাকি সদস্যরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকাল হৃদির দিকে।

হৃদি চোখ বন্ধ করে সোফায় পড়ে আছে। সে যেন এ ধরাধামে নেই, তার বিচরণ এখন অন্য কোনো অলীক জগতে।

'আর আপনার ভালোবাসার পরীক্ষা? সেটাও তো হয়ে গেল।'

'এর মানে কী?'

'এর মানে হচ্ছে আপনি যদি হৃদিকে সত্যিই ভালোবাসতেন তাহলে ওকে এত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করার আগে আপনি নিজেই মরে যেতেন।'

'কঠিন পরীক্ষা?' বলে রবিন বোধহয় একটু শ্লেষের হাসি হাসল।

'হ্যাঁ কঠিন পরীক্ষা। থাক, ও আপনি বুঝবেন না। শুধু জেনে রাখুন রবিন সাহেব, আপনি হৃদিকে ভালোবাসতে পারেননি। ভালো কী করে বাসতে হয় তা আপনাকে শিখতে হবে। দোয়া করি কোনো একদিন শিখে উঠবেন। রাখছি।'

অমৃতা ফোন কেটে দিলো। তার চোখদুটো ঈষৎ জলসিক্ত হয়ে উঠেছে এখন। রুদ্ধ হয়ে আসছে কণ্ঠস্বর।

হৃদিতা তাদেরকে বেছে নিয়েছে! আর তাদেরকে বেছে নিয়েছে বলেই ওই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ছেলেটা তাকে এত বড় শাস্তি দিলো। অমৃতা জানত। অমৃতা কী করে যেন টের পেয়েছিল রবিনের মাঝে কিছু একটা গোলমাল আছে। তাছাড়া হৃদিকে হারিয়ে ফেলার একটা চাপা, অপ্রকাশ্য ভয় ওর মাঝে কাজ করত। মনে হতো এ ছেলেটা একদিন তার কাছে থেকে হৃদিকে দূরে সরিয়ে দেবে। অমৃতা জানত একদিন ঠিক বলে বসবে এই আগন্তুক, বন্ধুদের ছেড়ে দাও। আজ তাই-ই হলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! বন্ধুত্ব আর প্রেমের লড়াইয়ে, আজ জিতে গেল বন্ধুত্ব!

হৃদি তখনও সোফায় আধশোয়া। রুদ্র হেঁটে এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে হৃদির কাঁধ চেপে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'হৃদি! এই হৃদি!'

হৃদি অস্ফুটে বলল, 'উঁ?'

'এমন করছিস কেন? তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'উঁহু!'

'তাহলে ওঠে বয়।'

'আচ্ছা'

হৃদি বাধ্য মেয়ের মতো উঠে বসল। এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করল হাত দিয়ে। গায়ে উলের চাদরটা ঠিকমতো জড়িয়ে নিল। বাকি চারজন এসে ওর পায়ের কাছে বসল কার্পেটের ওপর।

অমৃতা ওর হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, 'হৃদিতা, যে মানুষটা তোকে ভালোইবাসতে পারেনি তার জন্য কেন চোখের জল ফেলছিস? হুম?'

আকাশ বলল, 'দোস্ত, তোকে যে ভালোবাসবে সে তোর দোষ গুণ মেনে নিয়ে সত্যিকারের ভালোবাসবে, এত কন্ডিশন দিয়ে ভালোবাসা হয় না রে!'

বিভা বলল, 'সেটাই, আর আজকে তোর ফ্রেন্ডদের ছাড়তে বলছে, কালকে বলা যায় না বলে বসবে তোমার বাবা-মাকে আমার ভালো লাগে না, তোমার ফ্যামিলির মানুষজন আমার ভালো লাগে না, ছেড়ে দাও, সব ছেড়ে দিয়ে শুধু আমার বউ হয়ে বসে থাকো। এসব প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। লুক, হানি! ইউ ডিড দ্যা রাইট থিং। হি ডাজ'ন্ট ডিজার্ভ ইউ।'

রুদ্র বলল, 'যে মানুষটা তোর পছন্দ-অপছন্দের দাম দিলো না, তোকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে পারল না, তার কথা ভেবে তুই কেন কষ্ট পাবি?'

'আমি জানি, সব কিছুই জানি আমি, শোন তোরা, এখন একটু একলা থাকতে চাই। আমাকে একটু একা থাকতে দে কেমন?' এলোমেলোভাবে কথাগুলো বলেই ওঠে পড়ল হৃদি। কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল বারান্দার দিকে।

সামি পেছন থেকে ডাকল ওকে, 'যাওয়ার আগে একটা কথা শুনে যা হৃদিতা!'

হৃদি দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বন্ধুদের দিকে। মলিন মুখ বানিয়ে সব মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। দেখে কেমন মায়া লাগল।

'বল!'

সামি দৃঢ় গলায় বলল কথাটা, যা এর আগে কোনোদিন বলেনি, 'আমরা তোকে ভালোবাসি!'

এবার বাকি চারটি কণ্ঠস্বর এক যোগে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমরা তোকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি!'

হৃদি ধরা গলায় কিছু একটা বলল। স্পষ্ট বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল কান্নার দমকে তার কণ্ঠ জড়িয়ে আসছে। সে কথা বলতে পারছে না। হেঁটে বারান্দায় চলে গেল সে। তারপর মন খারাপের একটা দম বন্ধ করা বাতাস ঘরটার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকল।

একসময় রুদ্র বলল, 'চল সৈকতে যাই।'

'এত রাতে?' চমকে উঠল বিভা।

'হুম, মাঝ রাত্তিরের সমুদ্র না দেখলে আর দেখলিটা কী জীবনে?'

অমৃতা রাজি হয়ে গেল, 'চল, যাওয়া যাক।'

আকাশ বলল, 'এক কাজ কর, তোরা রওয়ানা দে, আমি হৃদিকে নিয়ে আসছি।'

তাই করল ওরা।

বিস্তৃত কালো জলের সাগরে জোয়ারের সাদা রেখাটি স্পষ্ট দেখা যায়। সমুদ্র বক্ষে জমে আছে ঘোলা কুয়াশা। হঠাৎ চোখ পড়লে মনে হয় আকাশ থেকে এক রাশ মেঘ পৃথিবীতে নেমেছে জলের সাথে সন্ধি করবে বলে। মহাকর্ষীয় শক্তির টানে ফেনিল ঢেউ বহুদূর থেকে ফুলে ফেঁপে গড়িয়ে আসছে সৈকতে। দূর সমুদ্রের বুকে একটা দুটা জাহাজের আলো দেখা যায় শুধু। দিগন্ত অন্ধকার। বাতাস বন্য। জানুয়ারির শীতল রাত্রি।

ঠাণ্ডা বালুর ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছিল ওদের

রুদ্র শিস দিয়ে একটা গানের সুর তুলছিল। অন্ধকার নীরব রাতের গায়ে মিশেমিশে সে সুরটা মনের মাঝে কেমন এক ভয়ঙ্কর সুন্দর অনুভূতির জন্ম দিচ্ছিল। শীতের বাতাসে সে সুর মিশে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ছিল যেন।

সামি একটা সিগারেট ধরিয়েছে। চিবিয়ে চিবিয়ে রুদ্রকে বলল, 'এই লাইটার দে তো!'

রুদ্র পকেট হাতড়ে বেড়াল গোটা একটা মিনিট। তারপর ঠোঁট উল্টে বলল, 'ছিল তো পকেটে, এখন তো পাই না।'

'ভালো মতো দ্যাখ, পকেট থেকে কই যাবে?'

রুদ্র আবার খুঁজল, পেল না। বিভা পার্স থেকে একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্স বের করে রুদ্রকে দিলো। রুদ্র মুখ দিয়ে ছোট করে শব্দ করল, 'বাহ!'

বাক্সটা নিয়ে সামিকে দিলো, বলল, 'কাজ হয়ে গেল, ইউ আর লাকী।'

'হুম, থ্যাংকস।'

'আমাকে থ্যাংকস দিচ্ছিস কেন? যে উপকারটা করল তাকে দে।'

সামি কিছু বলল না। রাগী ভঙ্গিতে দিয়াশলাইয়ের বাক্সে কাঠি ঘষে সিগারেট ধরাল। ম্যাচের কাঠির আগুনের দমকা আলোয় এক ঝলক দেখল বিভা সামির রাগী মুখটা। ভারি আজব কাণ্ড! দিয়াশলাইয়ের আগুনে ওই রাগী থমথমে মুখখানা সুন্দর দেখাচ্ছে! সামিকে মোটেও তার এর আগে কোনোদিন এমন সুন্দর বলে মনে হয়নি। আজকে হঠাৎ সব আচমকা এমন ওলটপালট হয়ে

যাচ্ছে কেন?

সুন্দর মুখের গুণেই বোধহয় বিভার মনটা একটু নরম হলো। কী করবে সে? এক্ষুনি ডেকে সরি বলবে কি? পরমুহূর্তেই মনে হলো কেনই বা সে ছোট হবে? থাপ্পড় মেরেছে, বেশ করেছে। কাজটা করার আগেই সামির বোঝা উচিত ছিল যে সে থাপ্পড় খাওয়ার মতো কাজই করছে। এখন ভাবটা এমন দেখানো হচ্ছে যেন থাপ্পড়টা তার প্রাপ্য ছিল না। যত্তসব ঢং!

কিছুক্ষণের মাঝে হৃদি আর আকাশ চলে আসলো। হৃদি বুদ্ধি করে একটা চাদরও নিয়ে এসেছে। বালুর ওপর শতরঞ্জি বিছিয়ে গোল হয়ে বসল ওরা।

রুদ্র বলল, 'এখন কী হবে?'

অমৃতার যেন উত্তরটা আগে থেকেই তৈরি ছিল, 'এখন আমরা সবাই জীবনের এমন একটি সত্য ঘটনা বলব যা এর আগে কোনোদিন কাউকে বলা হয়নি, আর এর সাথে একটি করে স্বপ্ন শেয়ার করব।'

'ওরে বাবা! এ তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার!' আকাশ আঁতকে উঠল

'কে শুরু করবে?' রুদ্রর প্রশ্ন।

'তোকে দিয়েই শুরু হোক!' বলল অমৃতা।

'আমি শুরু করব?' বলে রুদ্র একটু নড়েচড়ে বসল।

বাকিরা কেউ কিছু বলল না। উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল রুদ্রর দিকে

রুদ্র মাথার ওপরের বিশাল নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। কেশে গলা পরিষ্কার করল। তারপর ভারি নিষ্পাপ গলায় বলল, 'পুরোপুরি সত্য বলতে হবে? নাকি একটু মিথ্যা মিশিয়ে বললে হবে?'

'তোর লাইফের এমন কোনো ঘটনা যেটা তুই কাউকে কখনো বলতে পারিসনি, মানে বলা যায় না। কিন্তু যেটা বলতে পারলে তোর ভেতরটা হালকা হবে।' অমৃতা বলল।

রুদ্র খুব বোঝা বুঝেছে এমন গলায় বলল, 'ও মানে লুকিয়ে লুকিয়ে প্র্ণ দেখার মতো সত্য ঘটনা?'

সবাই একসাথে হইহই করে উঠল। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে অমৃতা আবার বলল, 'যে কোনো কিছু, যেটা তোর কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কখনো কারো সাথে শেয়ার করতে পারিসনি।'

রুদ্র মাথা চুলকাতে লাগল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারখানা আসলে কী

তা এখনো তার বোধগম্য হয়নি।

সামি বলল, 'ওকে, তুই চুপ যা, তুই দুধভাত। আমি শুরু করি।' বলে সামি সকলের মুখের দিকে একবার করে চাইল। অমৃতা নেতার মতো নির্দেশ দিলো, 'শুরু কর'

'ছোটবেলায় আমি একবার আমার আব্বার খাওয়ার পানিতে থুতু মিশিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কী খারাপ!' বলে উঠল একসাথে তিন চারটা গলা।

হৃদি বলল, 'নিজের আব্বা? আল্লাহ্! তুই এত খারাপ!'

অমৃতা বলল, 'জীবনে আর কোনো দিন তোর হাতে পানি খামু না।'

'এরকম রিয়্যাক্ট করলে তো খেলা যাবে না।'

'কেন করেছিলি এটা?'

'তখন আমার বয়স আট। আব্বার কাছে একটা খেলনা চেয়েছিলাম, আব্বা না করে দিয়েছিল। ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। তাই আব্বার ঘরে রাখা পানির বোতলের মুখ খুলে একদম... পরে অবশ্য আব্বা আমাকে খেলনাটা কিনে দিয়েছিল। ঘটনাটা মনে পড়লে খুব খারাপ লাগে।

'আর স্বপ্ন? মানে তোর জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্নটা কী?' অমৃতা বলল।

'হুম, আমার স্বপ্ন হলো আমেরিকায় যাব, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় বড় কোম্পানিগুলোর যেকোনো একটাতে কাজ করব। যেমন ধর মাইক্রোসফট বা অ্যাপল, কিংবা ফেসবুক। ক্যালিফোর্নিয়া, হ্যাঁ ক্যালিফোর্নিয়া হলো আমার স্বপ্নের জায়গা। অবশ্য ট্রাম্প দাদু ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমেরিকায় যাবার ইচ্ছেটা একটু একটু কমছে, তবে দেশে থাকব না আমি, চলে যাব অন্য কোথাও।'

এবার রুদ্র বেশ আত্মবিশ্বাসের গলায় বলে উঠল, 'ও এই হলো খেলা? এইটা তো পারবই।'

হাসল সবাই। রুদ্র আবার বলল, 'আমার জীবনে সিক্রেট আছে। যেটা কোনোদিন কাউকে বলা হয় নাই।'

বিভা গালে হাত দিয়ে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'সত্যি? তোমার জীবনে লুকিয়ে পর্ণ দেখার চাইতেও বড় সিক্রেট আছে? এতো অষ্টম আশ্চর্য!'

'হুম, আছে। কিন্তু তোমরা প্রমিজ করো যে কোনোরকম ওভার রিঅ্যাকশন দেখাবে না।'

সামি অধৈর্য হয়ে বলল, 'মাঝে মধ্যে না তুই একদম মাইয়াদের মতো

করতে থাকিস, বিরক্ত লাগে!'

ধমক খেয়ে রুদ্র আর সময় নষ্ট করল না। হড়বড় করে বলা শুরু করল, 'ইয়ে, আমার খুব কাছের বন্ধুদের মাঝে একজনের ওপর আমার বছর দুয়েক আগ পর্যন্তও ভয়ঙ্কর ক্রাশ ছিল।' এটুকু বলে আবার সাফাই গাইবার ঢঙে বলল, 'এখন নাই, এখন কিচ্ছু নাই, গড প্রমিজ!'

আকাশ বলল, 'কাছের বন্ধুদের মধ্যে? খাইছে! দোস্ত আমি না তো?'

রুদ্র আকাশের প্রশ্নের উত্তর দিলো না। মেয়ে তিনজনের মুখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য উটকো একটা অস্বস্তি এসে ভর করল। অবশ্য অমৃতা অনেকটাই সাবলীল। সে মুখে রহস্যের হাসি ঝুলিয়ে রেখে কৌতুকের গলায় বলল, 'আমি মনে হয় একটু একটু জানি, কী বলিস?'

রুদ্র পরনের জ্যাকেটের চেইন লাগাতে লাগাতে বলল, 'আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগের কথা। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের মিড টার্ম পরীক্ষা চলছিল। হায়ার ম্যাথ পরীক্ষা ছিল। তো আমার সামনের বেঞ্চে একটা ছেলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছিল।'

সামি প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'ছেলে?'

বিভা প্রতিবাদের গলায় বলল, 'ছি! ছেলে? শেষ পর্যন্ত তুই? হায় ভগবান! কী শুনলাম আমি!'

আকাশ কঠিন রহস্যের সমাধান করতে পারা নামি দামি গোয়েন্দাদের মতো ভারী গলায় বলে উঠল, 'আমি আগেই বলছিলাম যে এইটা নিশ্চয়ই আমি। রুদ্রর ক্রাশ আকাশ, ইফতেখার আকাশ!' বলে আকাশ বিশ্বজয়ের হাসি হাসল।

হৃদি আকাশের পেটের মধ্যে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'কেন? কী করেছিস তোরা লুকিয়ে লুকিয়ে?'

সামি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'রুদ্রর বাচ্চা! তুই যে একটা গে, মানে লিটারেলি একটা গে, এইটা তুই আগে বলবি না?'

রুদ্র এই বিস্ফোরণের মুখে পড়ে একটু কেমন হকচকিয়ে গেছে। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল যে তার মুখখানা মলিন। সে বিস্ময় নিয়ে বলল, 'কাহিনি কী? তোরা এমন রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছিস কেন? আচ্ছা ধর আমি ওইটা, আসলেই আমি ওইটা'

'ওইটা মানে কী?' রাগান্বিত স্বরে প্রশ্ন করল অমৃতা।

'মানে আমি সম। তাহলে তোরা কী করবি?'

সামি রুক্ষ গলায় বলে উঠল, 'কী করব মানে? তালাক দিবো তোকে!'

অমৃতা যোগ করল, 'হুম, আমিও তালাক দিবো।'

বিভা খিল খিল করে হেসে ওঠে বলল, 'তোরা ওকে বিয়ে করলি কবে? যে তালাক দিবি?'

'এটা বিয়ের তালাক না, বন্ধুত্বের তালাক।' সামি বলল।

অমৃতা বসা থেকে ওঠে দাঁড়িয়ে রুদ্রর দিকে হাতের আঙুল তাক করে তেজি গলায় বলল, 'তোরে আমি তালাক দিলাম, এক তালাক!!'

রুদ্র দশ আঙুল দিয়ে কান চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল, 'না!'

'দুই তালাক!'

'না আ আ...'

'তিন তালাক!'

এবারে 'না!!' বলে রুদ্র বসা থেকে লুটিয়ে পড়ল বালুর ওপর। মনে হলো এ মুহূর্তে তার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা শেষ হয়ে গেছে।

সামি বলল, 'আমিও দিলাম তোরে তালাক, আইন তালাক! বাইন তালাক!'

হৃদি আর বিভা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল। হৃদি হাসির দমক সামলে নিয়ে বলল, 'ওরে বাঁদরগুলো! আমার এ দুঃখের দিনেও তোরা আমাকে হাসিয়ে দিলি!'

আকাশ খুব আবেগ নিয়ে বলল, 'সবাই তোকে তালাক দিলেও আমি তোকে কখনোই তালাক দেবো না, ওরা জেলাস। নো প্রবলেম, আমি আছি তোর সাথে!'

বিভা বলল, 'এখন তোরা একটু থামবি? রুদ্রকে তো বলতেই দিচ্ছিস না কিছু!'

অমৃতা আদেশ দিলো, 'আচ্ছা শুরু কর, কোন ছেলে, কী নাম, কী কাম, সব ক আমাদের'

রুদ্র গলা পরিষ্কার করল, তারপর বলল, 'তো আমি একটা অঙ্কের এনসার মিলানোর জন্য ছেলেটারে ডাক দিলাম, আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, ছেলেটা একটা চেক শার্ট পরে ছিল, মাথার চুলে ছিল আর্মি ছাট। আমি ছেলেটার পিঠে টোকা দিলাম। ছেলেটা ঘুরল। তারপর... তারপর আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম এমন একটা আদুরে চেহারা আমি এর আগে কোনোদিন দেখিনি! একদম বিড়ালের মতো কিউট।' এটুকু বলে রুদ্র তাকাল অমৃতার দিকে।

অমৃতা চোখ নামাল। একটু কাঁপল কী সে? চোখের সামনে কোনো গোপন

প্রেমিক ধরা পড়ে গেলে অন্য যেকোনো নারীর বুক যেমন ক্ষণিকের জন্য হলেও আন্দোলিত হয়, সেরকম কিছু হলো কি অমৃতার মাঝেও?

না, ওর পরবর্তী চাউনিই বলে দিলো, সেরকম কিছুই হয়নি। তবুও বাতাসে একটা অস্বস্তি মিশল। কয়েক সেকেন্ড সবাই চুপ। শুধু সাগর পারে জল এসে ধাক্কা খায় ছলাৎ ছলাৎ আর বাতাস কাঁদে শোঁ শোঁ শব্দে।

অস্বস্তি কাটানোর জন্য অমৃতা সিগারেট ধারাল। একটু অন্য গলায় বলল, 'বুঝেছি, আর বলা লাগবে না। তুই এবার তোর স্বপ্নের কথা বল'

বিভা বলল, 'না না, পুরোটা শেষ করতে হবে, আমি পুরোটা জানতে চাই, কে ছিল সে? সত্যিই কি তুই কোনো ছেলের প্রেমে পড়েছিলি?'

হৃদি ফিসফিস করে বিভার কানে কানে বলল, 'তুই এত গাধা কেন? কিচ্ছু বুঝিস না?'

রুদ্র বলল, 'না ঠিক আছে, ওকে বকিস না আমি পুরোটাই বলছি।'

অমৃতা রুদ্রর মুখের কথা কেঁড়ে নিল, 'পরের গল্পটুকু আমিই বলছি, রুদ্র গাধা আমার মুখের দিকে কয়েকটা মিনিট হা করে তাকিয়ে থাকল, তারপর স্যার আইসা খাতা টান দিয়া নিয়া গেল। হ্যারে দোস্ত তুই পাশ করছিলি ওই পরীক্ষায়?' অমৃতা কিন্তু একটুও নার্ভাস না।

বিভা বিস্মিত, 'অমৃতা? মানে? রুদ্র তুই...'

বিভা এভাবেই অবাক সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকল অনেকটা ক্ষণ।

রুদ্র একটু লাজুক গলায় বলল, 'কিন্তু অমৃতা, আমি এটা বুঝিনি যে তুই ব্যাপারটা জানতি।'

'আমি জানতাম কে বলল? আমি জানলাম এখন!' অমৃতা নির্বিকার। 'একটুও অবাক হোসনি তুই?'

'হলেই কী?'

'বিশ্বাস কর, এখন আমার মনের মাঝে কিচ্ছু নাই, অনেকদিন আগেই কেটে গেছে ব্যাপারটা। তুই আমার বন্ধু, শুধুই বন্ধু!'

'আমি জানি।'

হৃদি পৃষ্ঠা পাল্টাল, বলল, 'আচ্ছা, ওসব বাদ দে, রুদ্র বল, তোর স্বপ্ন কী?'

'ওয়ার্ল্ড ট্যুর, আর স্পেসে হানিমুন।'

'স্পেসে কেমন করে মানুষ হানিমুন করে? দোস্ত ভাসতে থাকবি তো, কিসু করতেও পারবি না বউয়ের সাথে'

‘স্পেসে গিয়া, মহাকাশ দেখব, পৃথিবীটা দেখব মহাকাশ থেকে। চাঁদে গিয়ে চাঁদের আকাশে পৃথিবী দেখব, আমি কি বউয়ের লগে কিসু করার জন্য যাইতাছি নাকি, আজব!’

‘অনেক হয়েছে, এবার থাম সবাই। এখন হৃদিতার দান। হৃদি, শুরু কর।’ সামি বলল।

সকলে হৃদির মুখের দিকে তাকাল।

হৃদি একটু লাজুক গলায় বলল, ‘আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে রুম ডেটিং মারছি দুইবার, এইটা তোমাদেরকে বলা হয় নাই।’

কথাটা বলামাত্র সব হইহই করে উঠল।

বিভা বলল, ‘কখন করলি এসব, তুই আমারেও বললি না দোস্ত?’

আকাশ অবাক গলায় বলল, ‘এটার মানে? ডিড ইউ, আই মিন... ডিড ইউ ডু ইট?’

এই ‘ডিড ইউ ডু ইট’ বলতে আদতে কী বোঝানো হয়েছে হৃদি সেটা বুঝে নিল।

দোষ স্বীকারের গলায় বলল, ‘আই ডিড ইট! আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম! কোনো কিছুতেই না করিনি। শেষের দিকে হৃদির কণ্ঠ কাঁপল। একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে কান্নার ঢোঁক গেলার চেষ্টা করল সে, বলল, ‘এসব বলে আর কী হবে? সব তো শেষ!

‘কিছুই শেষ হয়নি। সব ঠিক আছে।’ হৃদির পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলো অমৃতা।

হৃদিতার চোখে আবার জলের ফোয়ারা নামল। ‘আমার সব স্বপ্ন সে মানুষটাকে ঘিরেই ছিল। এখন সে নেই, কোনো স্বপ্নও নেই।’

সামি হৃদির একটা হাত আলতো করে ধরল, গভীর গলায় বলল, ‘আমার মন বলছে তুই একদিন আবার নতুন করে কাউকে ভালোবাসবি। নতুন করে স্বপ্ন দেখবি।’

হৃদি হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে নেয়, ক্ষীণ গলায় বলে, ‘আমার আর হবে না।’

বিভা বলল, ‘এবার অমৃতার পালা। অমৃতা শুরু কর।’

শুনে অমৃতা নড়েচড়ে বসল। বড় একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘আমার স্বপ্ন কী জানিস?’

'জানি না বলেই তো প্রশ্ন করলাম, এত কাব্য করার তো কিছু নাই! '

অমৃতা কেমন স্বপ্নাতুর গলায় বলল, 'একটা কাচ দেয়ালের মহল বানাব। মহলের চারিধার থাকবে আয়না দিয়ে ঘেরা। মহলের ওপরের কাচের আচ্ছাদনে আকাশ সর্বক্ষণ তার মুখখানি দেখতে পাবে। তারপর বর্ষাকালে যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামবে, মহলের গায়ে গায়ে বৃষ্টি তার ইচ্ছেমতন আলপনা আঁকবে আর মহলের বাসিন্দাদের মনে হবে ছাদটা আসলে কাচের নয়, আয়নার নয়, ছাদটা আসলে বৃষ্টির!

অমৃতার বলা কথাগুলোয় কী জাদু ছিল কে জানে। হাওয়ায় একটা সম্মোহনের জাল ছড়িয়ে পড়ল। নিজ নিজ ভাবনায় ডুব দিলো প্রত্যেকের মন গভীরের মন। মনের আবছা চোখে তখন কেবল কাচ দেয়ালে ঘেরা এক মহল। যার ছাদ তৈরি হয়েছে ইট, বালু, সিমেন্ট দিয়ে নয়, বৃষ্টি দিয়ে।

ক্ষণিক বাদে আকাশ বলল, 'মহলের নাম দিলাম, বৃষ্টি মহল!'

অমৃতা হাসল, 'বৃষ্টিমহল, বাহ! বেশতো!'

বিভা খুশিতে আটখানা হয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'ওয়াও, জোশ হবে! প্রতি বছর বর্ষায় আমরা সবাই অমৃতার বৃষ্টিমহলে বেড়াতে যাব। বৃষ্টিমহল তখন শুধু আমাদের হবে। অন্য কারো কিন্তু সেখানে থাকা চলবে না। তোমাদের যদি দশ বারোটা বাচ্চা-কাচ্চাও হয়ে যায়, তাদেরকেও আনা চলবে না!'

হৃদি বলল, 'হুম ভালো বলেছিস, প্রতি বছর বর্ষার কয়েকটা দিন যান্ত্রিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ দূরে গিয়ে কাটাব, বৃষ্টির সাথে, বন্ধুদের সাথে, বৃষ্টি মহলে। আর কী চাই?'

অমৃতা বলল, 'হ, তোদের কথা শুনে মনে হইতাছে মহল তো রেডি, এখন খালি আমাদের যাওন বাকি।'

সবাই হাসল। সামি বলল, 'আইডিয়াটা পছন্দ হয়েছে। বলা যায় না হয়তো একদিন আমাদের স্বপ্নের বৃষ্টিমহল সত্যি হয়েও যেতে পারে।'

'আমার যেদিন অনেক টাকা হবে সেদিন আমি অবশ্যই এ স্বপ্নটাকে সত্যি করব।' অমৃতা বলল।

বিভা অমৃতার গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, 'দোস্ত, একটাই রিকুয়েস্ট, মহলটা আমার নামে লিখে দিস।'

আকাশ রসকষহীন মুখে বলে উঠল, 'কেন? তর নামে লিখবে কেন? অর কি চৌদ্দ গুষ্টিতে আর কেউ নাই?'

'না নাই, তোর এত হিংসা হচ্ছে কেন শুনি? হিংসুইট্টা পোলা কোথাকার!'

'আচ্ছা বাবা, থামত তোরা, মহলটা আমি আজকে এ মুহূর্তে তোদের পাঁচজনের নামে লেখে দিলাম যা!' অমৃতা ঘোষণা দিল।

'এমন মুখে মুখে বললে হবে না, কাগজে কলমে লিখে দিতে হবে, আর আমার ভাগ বেশি হবে!' বিভা বলল।

আকাশ আবার তেড়ে আসল, 'কেন তোর ভাগ বেশি হবে কেন? এসব স্বৈরাচার চলবে না, গণতন্ত্র হবে গণতন্ত্র!'

রুদ্র সুর মেলাল আকাশের সাথে, 'ঠিক, গণতন্ত্র হবে, সবার সমান ভাগ!'

হৃদি খ্যাক করে উঠল, 'অসহ্য লাগতেছে আমার এসব বস্তি মার্কা ঝগড়াঝাঁটি! রাত কত হলো খেয়াল আছে তোদের? অমৃতা তাড়াতাড়ি শেষ কর।

হৃদির কথায় থামল বাকি সবাই। রুদ্র হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'হুম রাত হয়ে গেছে অনেক।

'একটা সিক্রেট আছে আমার, তোদের বলা হয়নি কখনো।' অমৃতা বলল।

'এত কাহিনি না কইরা বইলা ফ্যাল না বাপ!' সামি ভীষণ বিরক্ত।

'আমার বয়স তখন বারো, ক্লাস ফাইভ কী সিক্সে পড়ি, সঠিক মনে নেই ক্লাসটা। আমার একটা হাউজ টিউটর ছিল, ম্যাথ পড়াইতো। তো.... কাহিনি হচ্ছে ওই টিচার ছিল একটা বদের হাড্ডি। ওই বদ লোকটা আমার গায়ে হাত দিত।'

আকাশ হকচকানো গলায় বলল, 'গায়ে হাত দিতো মানে? কোথায়?

বিভা আকাশের মাথায় একটা গাট্টা মারল, 'ওই গর্দভের বাচ্চা, কোথায় হাত দিত সেটাও তোরে বলা লাগবে?'

অমৃতা হিম হিম গলায় বলল, 'সেটাই, ওসব লং ডেস্ক্রিপশনে না যাই, শর্টকাট বলি, ওই বদ লোকটা এ কাজ বেশ কয়েকবার করেছে আমার সাথে। ছোট ছিলাম তো কাউকে বলতে পারতাম না। লুকিয়ে কাঁদতাম। তো ব্যাপারটা যখন ঘন ঘন হতে থাকল তখন একদিন মাকে বললাম। মা বিশ্বাস করল না। রাগে দুঃখে অপমানে নাপিতের দোকানে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করে আসলাম।'

বিভা ফোড়ন কাটল, 'জীবনে এই প্রথম শুনলাম, রেগে গিয়ে মানুষ মাথা ন্যাড়া করে!'

'আঃ শেষ করতে দে তো! খালি পক পক পক সারাক্ষণ!' আকাশ খেঁকিয়ে ওঠে। 'তখন জামা পরতাম, স্কার্ট পরতাম, তো মাথা ন্যাড়া করে আসার পর

থেকে ওইসব মেয়েদের জামা কাপড় পরা ছেড়ে দিলাম। আব্বুর সাথে নিউমার্কেট গিয়ে ছেলেদের শার্ট প্যান্ট কিনে আনলাম। সে সময়টাতে আমি মনেপ্রাণে ছেলে হতে চাইতাম। ঢিলা শার্ট, ঢিলা প্যান্ট আর ন্যাড়া মাথার আমাকে দেখলে যে কেউ মনে করত একটা বাচ্চা ছেলে। আর জানিস, কী আশ্চর্য! বেশভূষা বদলে ফেলার সাথে সাথে আমার ভেতরটাও কেমন সাহসী হয়ে উঠল। সে মিনমিনে অবলা আমিই একদিন ভারি সাহসী একটা কাজ করে ফেললাম। ওই বদ মাস্টারকে ধমক দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলাম।'

'কিন্তু অমৃতা, এই তাড়িয়ে দেবার কাজটা তুই আগেই করতে পারতি, এর জন্য নিজেকে ছেলে বানিয়ে ফেলার কোনো দরকার ছিল না।' হৃদি বলল।

'আমি জানি, আমি বুঝি, কিন্তু হয়ে গেছে ব্যাপারটা। আই মিন সবাই তো সবকিছু পারে না। ফ্রক পরে থাকা অবস্থায় যে কাজটা আমি করতে পারিনি সে কাজটা হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরে দিব্যি করে ফেলেছি। আমি জানি ব্যাপারটা পুরোই মানসিক, মেয়েরা কোনো দিক থেকেই ছেলেদের থেকে পিছিয়ে নেই আজকাল। তবুও সে সময়টাতে আমার নিজের ওপর ভীষণ ঘেন্না হয়েছিল মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম বলে। বয়সটা কাঁচা ছিল রে! মাঝে মাঝে মনে হয়, মা যদি আমার বলা কথাটুকু সময়মতো বিশ্বাস করত তাহলেই হয়তো সব ঝামেলা চুকে যেত।'

এদিকটায় এতক্ষণ কেউ ছিল না। এখন এই রাত তিনটে বাজার মুখে মুখে কোত্থেকে যেন এক দঙ্গল মাতাল এসে জুটলো সমুদ্রতটে। পাঁচ ছয়জন জোয়ান ছেলে। দু একজনের হাতে বোধহয় মদের বোতলও আছে। অন্ধকারে ঠিকমতো বোঝা যায় না। তবে এলোমেলো হাঁটার ধরন আর হাসির শব্দে ঠিক ঠিক বোঝা যায় একটারও তাল ঠিক নেই।

হৃদি অভিযোগের সুরে বলল, 'এ ছোকরাগুলো এখানে মাতলামি করতে আসছে কেন? আর জায়গা পায় না মাতলামি করার?'

সামি একটু ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'তো মাতলামোটা করবে কোথায়? করার কোনো জায়গা আছে? শহরের মধ্যে কোনো বার নাই, ক্লাব নাই, কিচ্ছু নাই, বেচারারা সমুদ্রের চিপায় আসছে রাত বিরাতে মাতলামো করতে, তাতেও তোমাদের সমস্যা।'

'আমার একটু কেমন ভয় ভয় করছে, মাতালগুলো আবার কী না কী করে বসে, চল এখান থেকে ওঠে যাই।' বিভা বলল।

'আরে ভয়ের কিছু নেই। যেখানে আছিস সেখানেই বসে থাক। কিছু হবে না।' আকাশ অভয় দিলো।

অমৃতা বলল, 'এবার বিভা, তোর পালা।'

বিভা গলা কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, 'আমার জীবনে অসংখ্য, অগণিত স্বপ্ন। এ কদিন যাবৎ আমি যে স্বপ্নটা দেখতেছি তা হলো যে, আমার বিয়ে হচ্ছে বুঝছিস? আমার বিয়ে হচ্ছে কানাডার প্রাইম মিনিস্টার জাস্টিন ট্রুডর সাথে। ও গড় হি ইজ সুপার হ্যান্ডসাম! আই এম জাস্ট ক্রেজি এবাউট হিম!'

হা হা হা করে ডাকাতের মতো হেসে উঠল সব। সামি টিপ্পনী কাটল, 'একেই বলে বামন হয়ে চাঁদে হাত।'

এই সারাদিন পর সামি বিভাকে কিছু একটা বলল, তাও সরাসরি নয় অনেকটা যেন আড়াল থেকে মন্তব্য ছুঁড়ল।

বিভা ঝেঁঝে উঠল, 'কে বামন আর কে চাঁদ সেটা লোকে যখন কোনো কর্ম করে তখন মনে থাকা উচিত।'

একটা তেজের হলকা ঝিলিক দিলো সামির চোখে। কী বলতে চাইছে বিভা? আজ দুপুরে ঘটে যাওয়া ঘটনাটাকে ইঙ্গিত করল না তো সে? ফোঁস করে ওঠে বলল সে, 'কর্ম দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কে বামন আর কে চাঁদ!'

'কী বলতে চাইছিস তুই?'

সামি অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু বলার রুচি নেই আমার।' অমৃতা খেঁকিয়ে উঠল, 'আহ্! কী শুরু করলি তোরা?

'এরকম ঝগড়াঝাঁটি করলে কিন্তু আমিও মাতালদলে যোগদান করব।' আকাশ হুমকি দিলো।

বিভা যেমন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তেমনি করেই হঠাৎ নিভে গেল। ম্লান সুরে বলল, 'আমার কিছু বলার নেই আর, আকাশ বল।'

'ওমা তোর সিক্রেট তো শেয়ার করলি না?'

'আজ মন চাইছে না, অন্য একদিন করব।'

'না না আজকেই বলতেই হবে!' জোর দিয়ে বলল রুদ্র।

'এরকম জোরজার করলে কিন্তু আমিও মাতাল দলে যোগদান করব!' আকাশের মতো বিভাও হুমকি দেয়।

অমৃতা একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে আর কী করা আকাশ

শুরু কর।'

'আমার কিছু বলার নেই, আমার জীবনটা ডাইল ভাত।' আকাশ বলল, বিরস মুখে।

সামি চোখাভাবে বলল, 'আর আমাদের জীবন তো পোলাও কোরমা!' হৃদি যোগ করল, 'আমার লাইফ হচ্ছে বিরিয়ানি, আল্লাহ্!'

অমৃতা বলল, 'এটা কোনো কথা না, কিছু না কিছু তো আছেই যা তুই কখনো কাউকে বলিসনি।'

'কিছু নাই, কথা শুধু একটাই, লাইফ সাকস! মাই লাইফ ইজ সো ফাকডআপ! আমার জীবনের কথা বাদ দে, আই উড রাদার সিংগ এ সং টু ইউ গাইজ, ওকে?'

'না কোনো সং টং হবে না, তুই বল!' সামি বলল।

আকাশ একটু অন্য গলায় বলল, 'আমার আসলেই গোপন কোনো কথা নেইরে, তোরা সবটা জানিস। আমার মা নেই, অকালে চলে গেছেন আমাকে ফেলে। আমার বাবা আমার মায়ের জায়গাটুকু মায়ের মৃত্যুর দুমাসের মাথায়ই অন্য এক মহিলাকে দিয়ে ফেলেছেন। ছয়টা মাসও ধৈর্য ধরতে পারেননি। বাবা কখনোই আমার খুব কাছাকাছি ছিলেন না। ছোটবেলা থেকে মাই আমার সব। দ্বিতীয় বিয়ে করার পর বাবা আমার কাছ থেকে আরো বেশি দূরে সরে গেলেন। আমি মনে হয় লোকটাকে এক রকম ঘেন্নাই করি। মা চলে যাবার পর থেকে আমার জীবনটা সত্যি ডাল-ভাত হয়ে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষায় আছি, কবে মায়ের কাছে যেতে পারব। একটা সময় ক্রিকেট নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম। জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখতাম। ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার ভাগ্যই হলো না। এখন আর আমার কোনো স্বপ্ন নেই। কোনো রকমে একটা জীবন পার করতে পারলেই হলো, জীবনটা পার করতে পারলেই তো মায়ের দেখা পাব, তাই না? মা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছেন আমার জন্য ওপারে বসে।'

হৃদির মন এমনিতেই আজ খুব খারাপ। আকাশের কথাগুলো শুনে তার বুকের ভেতরটা আরও বেশি কেমন হুহু করে উঠল। সে বাষ্পান্বিত কণ্ঠে বলল, 'কী বলিস দোস্ত, এভাবে বলতে হয় না রে!

'আচ্ছা বাদ দে ওসব, তোদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কান্না জুড়ে দিবি এখনই।' হাসার চেষ্টা করল আকাশ।

অমৃতা বলল, 'তোর মতো একটা ছেলের কোনো স্বপ্ন থাকবে না, লাইফে

কোনো এম্বিশন থাকবে না এটা তো হতে পারে না। চিন্তা ভাবনাগুলা চেঞ্জ কর।

'সেটাই, দ্যাখ আমার মনে হয় আন্টি যেখানে আছেন ভালো আছেন। তিনি নিশ্চয়ই আড়াল থেকে দেখছেন তোকে। তুই ভালো থাকলে তিনিও ভালো থাকবেন।' সামি বলল।

আকাশ একটু মলিন হাসল। সাথে হাসল ওর চোখ। বলল, 'ভালো থাকার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। তোরা যতক্ষণ সাথে আছিস ওই অতটুকু সময়ই আমার ভালো থাকা।'

'আমরা সবসময় আছি তোর পাশে। খারাপ থাকার কোনো সুযোগ নেই তোর।' বিভা বলল আবেগে আপ্লুত হয়ে।

সামি ছটফটিয়ে উঠল, 'ইস! আবেগে খালি কান্দন বাকি।'

বিভা আড়চোখে ষড়যন্ত্রকারীর মতো তাকাল সামির দিকে। কিছু বলল না।

রুদ্র বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাস ভরা গলায় বলল, 'মাঝরাত্তিরের সমুদ্র টানছে, চল যাই, একটু জলকেলি করে আসি'

মাতালদের দলটা এখন হেঁটে হেঁটে একটু দূরে চলে গেছে। এদিকের সমুদ্রতট পুরোপুরি ফাঁকা। কুয়াশা ভারি হয়ে জেঁকে বসেছে সমুদ্রবক্ষে

অমৃতাও উঠল।

আকাশ ঠিক সে সময় হঠাৎ বলে উঠল, 'তবে কী জানিস, আজ থেকে আমারও একটা স্বপ্ন আছে। আজ থেকে আমার স্বপ্ন 'বৃষ্টিমহল'। অমৃতার স্বপ্নে ভাগ বসলাম। যতদিন পর্যন্ত এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকব, ততদিন অবধি বৃষ্টি মহল গড়ার স্বপ্ন দেখব।'

অমৃতা হেসে বলল, 'বেশ তো, স্বপ্ন ভাগ করে নেবার একটা আলাদা মজা আছে। মনের একাকিত্ব ঘুচে যায়।'

ওরা দুজন কথা বলতে বলতে জলের কাছাকাছি চলে আসলো। জল ভীষণ ঠাণ্ডা। পা ছোঁয়াতেই গা শিউরে উঠল। অমৃতা জোয়ারের সাদা ফেনা পায়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। আকাশ পেছন থেকে ওর হাতটা খপ করে ধরে ফেলে বলল, 'আর যাস না!'

অমৃতা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আকাশের মুখখানা। আঁধারে কিছু বোঝা যায় না ঠিকমতো। তবু মনে হয় যেন রাত যেমন গভীর তেমনি আকাশের মুখেও একটা কেমন গভীরতা ভর করেছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে মানুষের চিন্তাগুলো মুক্ত হয়, গাঢ় হয়। প্রকৃতির অবস্থা মনের ওপর সর্বদাই একটা প্রভাব

বিস্তার করে। হয়তো এখন সে সময়, হয়তো এখন গভীর রাতের সাথে মন গভীরে ডুব দেবার সময়।

'আমি সাঁতার পারি, ভয় নেই।' বলল অমৃতা।

'আমি পারি না।'

'আমি তোকে বাঁচাব। তুই ডুবে মরবি না।'

'থাক না! কী দরকার রাতদুপুরে সাঁতরে বেড়ানোর? এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি না কিছুক্ষণ!

অমৃতা আর কথা বাড়াল না। দাঁড়াল ওখানটাতেই। আকাশের পাশে। আকাশ তখনও হাত ছাড়েনি ওর। হাওয়া খেলে যাচ্ছিল শাঁই শাঁই করে কানের পাশ দিয়ে। দুজনের পরনেই লেদারের জ্যাকেট। তবুও শীতের ছোবল থেকে পুরোপুরি রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না।

নীল নক্ষত্র খচিত অন্তরিক্ষের নিচে সমস্ত চেতনা সঙ্গে নিয়ে সাগর জেগে আছে। হাজার বছর ধরে জাগ্রত এ সাগর এমনিভাবেই, মহাকালকে সাক্ষী রেখে। দূর থেকে ধেয়ে আসছে সাদা ফেনিল ঢেউ। প্রচণ্ড আক্রোশে আছড়ে পড়ছে বালুতটে। কী সুবিশাল এ পৃথিবী। আর এ বিশাল অস্তিত্বের সামনে মানুষ কতই না ক্ষুদ্র!

অমৃতা আলতো গলায় বলল, 'আমার ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে।' আকাশ হাসে, হাসে চোখ, অন্ধকারেও বোঝা যায়। বলে, 'আমারও ভালো লাগছে।'

'তোকে হাসলে ভালো দেখায়, সব সময় হাসবি।'

আকাশ অবাক হয়, বিস্ময় নিয়ে বলে, 'মাই গড! জীবনে প্রথমবারের মতো অমৃতা চৌধুরী আমার কোনো প্রশংসা করল, ক্যামনে কী!'

'রাত গভীর, তাই এখন ভাবনাগুলোও গভীর, বুঝতে হবে।' অমৃতা বলে ভারিক্কি গলায়।

সামি আর রুদ্র এ হাড় কাঁপানো শীতে সাগরে নেমেছে। রুদ্র চিৎকার করে গান গাইছে, 'সব শব্দ থেমে যাক নিস্তব্ধতায়,শুধু জেগে থাক এ সাগর আমার পাশে...'

সামিও গলা মিলিয়েছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে এ পৃথিবীতে কোথাও কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, পৃথিবীটা আসলে এক টুকরো স্বর্গ।

হৃদি বিভাকে বলছিল, 'সামি দেখলাম কেমনে কেমনে জানি তোর দিকে

তাকাইতেছে, কাহিনি কী আল্লাহ জানে!’

বিভা একটু সংকুচিত হয়ে বলল, ‘হুম আমিও খেয়াল করছি, আসলে আমি চাইতে ছিলাম ওরে সরি বলতে বুঝছিস, কিন্তু চান্সই পাচ্ছি না।’

‘চান্সের কী আছে? যা এখনই গিয়ে কথা বল, ফ্রেন্ডই তো না? এত রাখঢাক কীসের?’

‘আসলে আমার যেন কেমন লাগছে বুঝলি? আর একটা ব্যাপার কী আজকে যেটা ঘটল কেন ঘটল আমি জানি না কিন্তু ঘটে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে ঘটনাটা ভালো ছিল। আই মিন আমার মনে হয় আজকের দিনটা আমার সব সময় মনে থাকবে।’

‘কী বলছিস?’ হৃদির গলায় উৎকণ্ঠা। মনে হচ্ছে যেন এ বিভাকে সে চেনে না।

‘হুম ঠিকই বলছি, ভেবে দেখলাম ওর জন্য আমার কোনো এক রকম ফিলিংস তো ছিলই, তাই না? নইলে ওর আহবানে সাড়া দিলাম কেন? আমি জানি না এটা কি বন্ধুত্বের ফিলিংস নাকি অন্যকিছু বাট দেয়ার ইজ সামথিং বিটউইন আস।’

‘আবোল-তাবোল বকিস না বিভা, বন্ধু আর প্রেমিক কখনো এক হয় না, বন্ধুত্বের ফিলিংসে কখনো কামনা আসে না, শরীর আসে না।’

‘বারে! প্রেমিক যদি বন্ধু হতে পারে তাহলে বন্ধু কেন প্রেমিক হতে পারবে না? এই যে তুই, তোকে আমি কত ভালোবাসি, এ ভালোবাসা কি প্রেমের চাইতে কম?’

‘আহ! বিভা না বুঝে তর্ক করিস না, দুটো এক না’

দূর থেকে রুদ্রর গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। সে গান কেবল গায় না, রচনাও করে। বেশিরভাগ সময়ই তার রচিত গানের কথাগুলো খুব একটা অর্থবহ হয় না। আজকের গানটা সে এইমাত্র বাঁধলো মনে মনে, তারপর ইচ্ছে মতো সুর দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে গাইতে লাগল। গলা ভালো বলে গানটা সুমধুর লাগছিল।

তুই বন্ধু হয়ে আমার হাতটা ছুঁলে
আমি এ বিশ্ব সংসার যাব ভুলে
ভুলব সব ভুল অঙ্কের ভুল উত্তর
শত দুঃখ বেদনা আর কষ্টের প্রহর

তুই বন্ধু হয়ে থাকলে আমার পাশে
আমি কষ্ট গিলে খাই এক নিশ্বাসে
তুই কাছে আয়, দূরে চলে যাই চল
তোর জন্য গড়েছি স্বপ্নের বৃষ্টিমহল!

খানিকবাদে পুবের আকাশ সূর্যদেবের আগমনি বার্তা ঘোষণা করল। একটু একটু করে রাঙা হতে শুরু করল আকাশ। সমুদ্দুর আর আকাশের মিলন রেখাটি প্রথমে হলো বেগুনি, তারপর কমলা, তারপর লাল। গোল সোনার থালার মতো সূর্যটার ছায়া পড়ল থইথই করা বিস্তৃত জলের ওপর। কুয়াশার চাদর ভেদ করে রঙের খেলা ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে, আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। শীতের দাপুটে বাতাস স্নিগ্ধ হল।

রুদ্র কাঁপছিল শীতে। বিভা ওর অবস্থা দেখে একটা ধমক লাগিয়ে বলল, 'এই ছেলে এক্ষুনি হোটেলে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টা। জ্বর আসবে।'

হৃদিও হইহই করে উঠল, 'আসলেই তুই পুরা মৃগী রোগীর মতো কাঁপতেছিস, যা হোটেলে এক্ষুনি।'

হোটেলে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে নিল ওরা। তারপর সৈকতের কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় সকালের নাস্তা সারল। এ রেস্টুরেন্টটা সবার আগে খোলে। একদম ভোরে। গরম গরম ধোঁয়া ওঠা চায়ের সাথে আসলো তেলে ভাজা পরোটা, ডিমের ওমলেট। খেতে গিয়ে বোঝা গেল খিদের সাথে সাথে ঘুমও পেয়েছে প্রচণ্ড।

খেয়ে দেয়ে হোটেলে ফিরল। তারপর চোখ জুড়ে নামল ঘুম। মন জুড়ানো, প্রাণ জুড়ানো, শরীর জুড়ানো শান্তির ঘুম।

প্রত্যেকের ঠোঁটের কোণে লেগে রইল এক টুকরো হাসি। ওদের পঁচিশ বছর বয়সটার গায়ে আজ কোথাও কোনো কালো দাগ নেই, কলঙ্ক নেই। পঁচিশ বছর বয়সে কালো দাগ থাকতে নেই। ঝকঝকে রোদ্দুর ধোয়া অনিন্দ্য সুন্দর পঁচিশ বছর সর্বদা খেলা করুক ওদের জীবনে। ওরা ঘুমাক, আর এদিকে শীতকালের মিষ্টি, নরম, রেশমি রোদ্দুরে ভাসতে থাকুক সাগর সৈকত।

সামি ডাস্টার দিয়ে গাড়ির ধুলো ঝাড়ছিল। তার গায়ে একটি হালকা লেবু রঙের পাঞ্জাবি। চোখে সানগ্লাস। ফরসা গাল চিকচিক করছে রোদে। আজ শুক্রবার বলে এখানকার মসজিদেই জুম্মা ধরেছে ওরা। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পালাও শেষ। কিছুক্ষণের মাঝেই চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছে আছে।

গাড়ির জানালার কাচে বিভাকে দেখা গেল। একটা ল্যাভেন্ডার রঙের চমৎকার ছাটের জামা তার পরনে। ঘের হয়ে ঝুলে আছে জামার লেইস হাঁটুর চারপাশে। তার নিচে কালো টাইটস। হাই হিল জুতো। বিভার বরাবরই সাজগোজের দিকে একটু ঝোঁক বেশি। আজকেও তার চোখে ল্যাভেন্ডার ব্লু আই শেডো। কাজল, ভারি মাসকারা। ঠোঁটে লিপগ্লস।

সামি চশমার আড়াল থেকে আগাগোড়া একবার দেখে নিল বিভাকে। কিন্তু ভাবটা এমন দেখাল যে বিভাকে সে লক্ষ্যই করেনি

বিকেলের আকাশে তখনও রোদ ঝিকোচ্ছে। শীত মাখানো হাওয়াটাও ফুরফুরে, চমৎকার একটি দিন }

‘ইয়ে, তোর সাথে একটু কথা ছিলরে।’ বিভাই কথা শুরু করল। আড়ষ্ট গলায়। চশমার নিচ থেকে তেরছা চোখে চাইলো সামি, বিভার দিকে।

আর এদিকে হোটেলের লবির সোফায় বসে চার বন্ধু ভারি মনোযোগ দিয়ে দৃশ্যটি দেখছিল। থাই অ্যালুমিনিয়াম গ্লাসের দরজার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল পার্কিংয়ে রাখা গাড়ি আর বাকি দুজনকে।

আকাশ বলল, ‘মনে হইতাছে ডায়লগবিহীন মুভি দেখতেছি, এইটা কিছু হইলো, ছবি দেখা যাবে কিন্তু ডায়লগ শোনা যাবে না?

‘ডায়লগ লাগবে না এক্সপ্রেশন দেখলেই বুঝবি কী ঘটতেছে।’ হৃদি বলল।

রুদ্র বলল, ‘আমার না, কেমন জানি লাগছে বুঝলি? প্রেম হবে না তো ওদের?’

হৃদি হেসে বলল, ‘হতেও পারে, চান্স আছে।’

অমৃতা অনেকটা ধমকের গলায় বলল, ‘ফালতু কথা বলিস না, বিভা যে শুধু

বিভা না, বিভাবরী ভট্টাচার্য, এ বিষয়টা মাথায় রাখিস।

'আরে এ যুগে ওইসব কোনো ব্যাপার না।' রুদ্র বলল।

'সেটা তুই আমি বললে তো হবে না, ওদের বাবা-মায়েরও বুঝতে হবে। আমি যতটুকু জানি, বিভার আব্বা-আম্মা যথেষ্ট কনজারভেটিভ। আর সামির আম্মাকে তো চিনিসই, হার্টফেল করবে।' অমৃতা বলল।

'হুম, অতএব সবাই মিলে দোয়া কর যেন প্রেমট্রেম না হয় ওদের মধ্যে, বন্ধু আছে, বন্ধুই থাক।' হৃদি বলল।

'আরে দূর, বন্ধুদের মধ্যে আবার কীসের প্রেম, ওইসব হবে না।' আকাশ উড়িয়ে দিলো প্রসঙ্গটা।

সামি হিম হিম গলায় বলল, 'কী কথা?'

'ইস, আসলে দোস্ত গতকালকের ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব সরি।

'কোন ব্যাপারটা?' বুঝেও না বোঝার ভান করল সামি। যেন কোনোকিছুই মনে নেই তার। মনে রাখার মতো কোনো ঘটনাই যেন ঘটেনি।

'মানে... তোকে থাপ্পড় মারাটা আমার উচিত হয়নি, আমি সরি।'

সামি ডাস্টারটা গাড়ির ব্যাকডালায় রাখতে রাখতে বলল, 'সরি বললে তো হবে না, সবকিছুর একটা হিসেব আছে তাই না? চেক এন্ড ব্যালেন্স বলে একটা কথা আছে।'

'এর মানে কী?'

'মানে হচ্ছে তুই আমাকে থাপ্পড় মেরেছিস, সো আমিও তোকে থাপ্পড় মারব। তাহলেই ব্যালেন্স হবে।'

বিভা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, 'তুই আমাকে থাপ্পড় মারতে চাইছিস?'

'আমি চাইছি না কিন্তু এথিক্স তো এটাই করতে বলে, তাই না? কারণ দোষ তো আমি একা করিনি, তুইও করেছিস।'

'তুই শুরু করেছিলি।'

'তাতে কী? তুই থামাসনি কেন? তুই না চাইলে জোর তো আমি করতাম না, তাই না?'

এ কথার পর বিভা একটু কোণঠাসা হলো। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'তুই থাপ্পড় মারতে চাস আমাকে? ঠিক আছে মার।' বলে বিভা তার গাল এগিয়ে দিলো সামির দিকে। সামি সানগ্লাস খুলে হাতে নিল। তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। কেমন একটু নিষ্ঠুরতাও মিশে আছে সে হাসির

সাথে।

'থাক বাদ দে। মেয়েদের গায়ে আমি হাত তুলি না।' এটুকু বলে কিছু একটা চিন্তা করল সামি। তার চোখদুটোতে হালকা অস্বস্তি ভেসে উঠল, বলল, 'আমিও দুঃখিত। যা করেছি সেটা আসলে... আসলেই ঠিক হয়নি ব্যাপারটা, আমি জিনিসটা মনে রাখতে চাই না বুঝেছিস? ভুলে যেতে চাই। যেটা হয়েছে সেটা খারাপ ছিল। খুবই বাজে ছিল। আর ভুল মানুষই করে, ভুল শোধরানোর সুযোগ তো একটা চাই তাই না?'

শেষের কথাগুলো খুব কানে লাগল। একটা হাহাকারে ভেসে গেল বুক। খারাপ ছিল? বাজে ছিল? কই বিভার কাছে তো অতটা খারাপ লাগেনি? এমনকি একটি বার ভোলারও চেষ্টা করেনি সে। যতবার মনের দরজায় ঘটনাটা এসে কড়া নেড়েছে ততবার কেমন এক অনাবিল সুখের শিহরণ বয়ে গেছে সারা শরীরে। ভুল ছিল এটা বিভা জানে কিন্তু ভুলটা ভালো লাগার ছিল, অন্তত তার কাছে ক্ষণিকের জন্যও ব্যাপারটাকে বাজে বলে মনে হয়নি। এ সত্যটা সামিকে কে বলবে?

এ মুহূর্তে সামির এ অকপট স্বীকারোক্তি শুনে নিজেকে ধিক্কার দিতে মন চাইছে তার। তার এতকালের মেয়েলি অহংকার, মান, মর্যাদা, সম্মান সব যেন ধুলায় মিশে গেল মুহূর্তে।

একটা বড় নিশ্বাস লুকাল বিভা। কৃত্রিম হাসি দিয়ে বলল, 'ভুলে যেতেই হবে। এসব মনে রাখার কোনো মানে হয় না।'

সামির চোখে খেলতে থাকা অস্বস্তিটা এখন একটু নিভু নিভু। সে নরম গলায় বলল, 'তাহলে বিভা, আমরা ঠিক আছি?'

'ঠিক আছি।' বিভা হাসে।

সামি হাত বাড়িয়ে দিলো বিভার দিকে, মুখে বলল, 'ফ্রেন্ডস ফর এভার?'

বিভার চারপাশটা হঠাৎ কেমন ঝাপসা হতে শুরু করেছে। ব্যাগ থেকে চট করে রেব্যান বের করে চোখ ঢেকে ফেলল সে। তারপর সামির হাত ধরে বলল, 'ফ্রেন্ডস ফর এভার'

কে জানে সামি টের পেল কি না যে কথা বলার সময় বিভার গলাটা হালকা হালকা কাঁপছিল!

মাস দুয়েক পরে, চৈত্রের এক ভোরে হঠাৎ আকাশের মোবাইল বেজে উঠল।

ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

আকাশের ফোনে এ অদ্ভুত রিংটোনটা দেওয়া আছে গত চার পাঁচদিন ধরে। যখনই ফোন আসে মনে হয় ঘাড়ের কাছে কুকুর ডাকছে তারস্বরে। এই ভোর পাঁচটার সময় যেমন হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই শুরু হয়ে গেল, ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

আকাশ ঘুমঘোরে ফোন রিসিভ করল। ভারী গলায় 'হ্যালো' বলল। ফোনের ওপাশে সামি।

'দোস্ত কী করস, ঘুমাস?'

'মজা নেও? ভোর রাইতে ঘুমাব না তো কী করব?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আকাশ।

'ভোর রাতে যে ঘুমাতেই হবে এমন কোনো কথা নাই, এই যে আমাকে দ্যাখ আমি তো ঘুমাচ্ছি না।'

'তুই ঘুমাইতেছোস না ক্যান? পেটে কৃমি হইছে?'

'আরে না কৃমি হওয়ার বয়স আছে নাকি?'

'আচ্ছা রাখি, পরে...' আকাশের গলা জড়িয়ে গেল।

'শোন না!'

'না শুনুম না, হারামি লাথি খাবি পাছায়! সকালে ইন্টারভিউ আছে কইলাম।'

'আরে গুল্লি মার ইন্টারভিউ, আমার তো জীবন মরণ সমস্যা।'

'হুম খুব ভালো, মইরা যা!' বলে আকাশ ফোন কেটে দিলো।

আকাশ পুনরায় ঘুম দেবার প্রস্তুতি নিল। ঠিক তখনই পাশের ঘর থেকে শব্দটা ভেসে আসলো। ভারী কোনো কাচের জিনিস ঝনঝন করে ভেঙে পড়ার শব্দ।

বুকটা ধক করে উঠল। যদিও ঘটনা কী হচ্ছে আকাশের তা পুরোদস্তুর জানা আছে। লোকটা নিশ্চয়ই মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল মাত্র। বাড়ি ফেরার পর রোজ যে নারকীয় ঘটনাগুলো ঘটে সে ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। গত একটা

মাস ধরে এই তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়েছে।

লোকটার মতিগতি কিছুই বোঝে না আকাশ। মা মারা যাওয়ার পর প্রথম বিশ পঁচিশ দিন ঠিক এরকম মাতলামো করত রাতের পর রাত। আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সকলে ছি ছি করতে লাগল। বউ মরার চল্লিশ দিন পেরোতে না পেরোতেই এ কেমন বেলেল্লাপনা? কিন্তু লোকটা বেলেল্লাপনার শেষ দেখিয়ে ছাড়ল।

চল্লিশদিন পেরোনোর আগেই এক হাঁটুর বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসলো। বিয়ের পর বছর তিনেক চলল খুব খোশ মেজাজে। নিজের দামড়া পঁচিশ বছর বয়সি ছেলের সামনে নতুন বৌয়ের সাথে পিরিত করতেও বাধত না তার।

সবকিছু চোখ দিয়ে চেয়ে চেয়ে নীরবে সহ্য করেছে আকাশ। টু শব্দটি করেনি। কিন্তু এই একটা মাস ধরে শুরু হয়েছে সে পুরোনো নাটক। রোজ রাত করে বাড়ি ফেরা আর মাতলামো করা। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা।

মা বেঁচে থাকতে লোকটা যে একটু আধটু মদ খেত না তা না, খেত কিন্তু সীমা কখনো অতিক্রম করেনি। লোকটা গালি দেয় নিজের বৌকে। বর্তমান বউ এবং প্রয়াত বউ। দুই বউকেই সমান তালে গালাগালি করে। আকাশ সব শোনে। মাথার ভেতর একটা রাগী অন্ধ সাপ ছোবল দেয়ার জন্য ফোঁস ফোঁস করে ফণা তুলতে থাকে। আকাশ ফণাধারী সাপকে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চেপে ধরে বশে আনে।

কিন্তু সাপ বেশিদিন বশীভূত থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। কিছুদিনের মাঝেই ছোবল দেবে।

ঘুম কেটে গেল। মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে ঘড়ি দেখল আকাশ। ভোর পাঁচটা। ওপাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে অশ্রাব্য গালাগালির আওয়াজ।

'তুই বেশ্যা, তোর চৌদ্দ গুষ্টি বেশ্যা তোর মারে আমি...'

বলতে নেই, মায়ের জায়গায় শেকড় গেড়ে বসতে চাওয়া মহিলাটিকে গালিগালাজ করা হলে আকাশ এক ধরনের চাপা স্বস্তি বোধ করে মনের ভেতরে। অমানুষ মনটা খল নায়কের মতো অট্টহাসি হাসে আর বলে, খুব তো এসেছিলি আমার মায়ের জায়গা চুরি করতে, এবার মজা বোঝ

আজ ঘটনার দৌড় গালাগালি ছাড়িয়ে মারামারি পর্যন্ত চলে গেল।

নারীকণ্ঠের ক্রন্দনের আওয়াজ কেঁপে কেঁপে আসতে লাগল ইটের দেওয়াল ভেদ করে। খল নায়ক মনটা অট্টহাসি হাসল। কিন্তু একই সাথে মাথার ভেতর অন্ধ সাপটাও কিলবিল করে ফণা তুলল।

আকাশ ঝড়ের বেগে বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো। পাশের ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। ডাইনিংয়ে কাজের মেয়েটা ঘুমোয়। তার ঘুমও গেছে ভেঙে। সে কম্বলে গা মুড়িয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে ভয়ার্ত চোখ নিয়ে।

ঘরের ভেতর ডিম লাইট জ্বলছে। আকাশ দেখল তার মাতাল বাবা বউয়ের চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসছে। ফণা তোলা সাপটা এবার ছোবল মারার জন্য পুরোপুরি তৈরি।

'কী হচ্ছে এসব?'

আকাশের কথা কানে গেল না লোকটার। বউটার চুল ধরে টানছে তো টানছে। হুঁশ নাই কোনো। বউটা কাঁদছে গলা ফাটিয়ে। তাতেও কোনো বিকার নাই লোকটার।

আকাশ দৌড়ে গিয়ে বৌটাকে বাঁচালো লোকটার শক্ত হাতের থাবা থেকে। লোকটা আকাশের দিকে কিছুক্ষণ স্থবির হয়ে চেয়ে রইল। আকাশ দেখল তার চোখদুটো ভয়ঙ্কর লাল। ঠোঁটের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে সাদা ফ্যানা।

বুক মোচড় দেয়।

এ তার জন্মদাতা পিতা?

ঘেন্না হয়। নিজের ওপর, এ অমানুষটার ওপর, পৃথিবীটার ওপর।

লোকটা টলতে টলতে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। বলতে লাগল, 'সব শালা স্বার্থপর, সব...'

বউটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। কখনো নিজ থেকে কথা বলেনি আকাশ এ মহিলার সাথে। আজ কী বলবে? কী বলার আছে তার? যে মানুষ নিজেই নিজের দুর্ভাগ্যের স্থপতি গড়ে তাকে আগ বাড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে যাবার তো কোনো মানে হয় না।

আকাশ বলতে পারলও না কিছু। প্রস্থান করল দ্রুত পায়ে। ঘরে এসে দেখল বন্ধ জানালার কাচের ভেতর দিয়ে নরম একটা হলুদ আলোক রশ্মি এসে শুয়েছে বিছানায়। ভোরের আলো ফুটছে।

মোবাইল নিয়ে সামির নম্বরে ডায়াল করল।

সামি ফোন ধরেই বলে উঠল, 'কীরে স্লিপিহেড, ঘুম ভাঙল?'

'হুম, কী হইছে তোর? কী সমস্যা?'

আকাশের গলা ভারী শোনাল।

'তোর কী হয়েছে? গলাটা এমন লাগছে কেন? সব ঠিক আছেতো?'

'তোর কী হয়েছে তা বল, আমার কথা বাদ দে'

'দোস্ত আজকে আমার একটা ব্লাইন্ড ডেইট আছে!'

'ব্লাইন্ড ডেইট?'

'হুম, ব্লাইন্ড ডেইট।'

আকাশ দীর্ঘ নিশ্বাসটা চাপাতে গিয়েও চাপাতে পারল না। সামি আছে বেশ ভালোই। আজকে এর সাথে ডেট তো কালকে ওর সাথে ব্রেকআপ। তার নিজের জীবনটাও এমন সহজ একটা খেলার মতো হলে বেশ হতো। কিন্তু হলো না তো! সব খেলা তো সহজ হয় না। কোনো কোনো খেলা যমের মতো কঠিন হয়। কিংবা খেলোয়াড় হয় আনাড়ি। তাই হবে, আকাশ একজন আনাড়ি খেলোয়াড়। ধ্যাৎ, কক্সবাজার থেকে ফেরার পর হতেই আবার সে পুরোনো দার্শনিক মনটা ফেরত চলে এসেছে। বন্ধুদের সাথে থাকলে এ মনটা হাওয়া হয়ে যায়। কোথায় পালায় কে জানে!

'কী করে জোগাড় করলি এ ব্লাইন্ড ডেইট?'

'ফেসবুকে'

'কবে থেকে?'

'আরে হঠাৎ করেই পরশুদিন একটা অপরিচিত প্রোফাইল থেকে নক করল বুঝছিস? কোনো প্রোফাইল পিকটিক নাই। মেয়েটা আমার ইউনিভার্সিটিতেই পড়ছে। সেন্স অব হিউমার ভালো। কথা বইলা আমি চরম মজা পাইছি।'

'ক্যামনে শিওর হইলি, হয়তো এইটা কোনো মাইয়া না, হয়তো পোলা।'

'কস কী, যা!'

'হতেই পারে!'

'হলে ঠ্যাঙায়ে হাত পা ভাইঙা দিমু না? এত সোজা? যাবি আমার সাথে? পোলা হলে ধইরা মাইর দিব দুজন মিলা।'

'আর পোলা না হইলে? যদি মাইয়া হয়?'

'তাইলে ফিফটি ফিফটি দোস্ত, তোর ফিফটি আমার ফিফটি। শেয়ার করব।'

'ডেইট হলো তোর সাথে, আমি কেমন করে শেয়ার করব?'

'ব্যবস্থা হবে ডোন্ট ওয়ারি।

আকাশ হাসে, ‘সামি ত্যাঁদরের বাচ্চা, কখনো সিরিয়াস হবি না লাইফে?’

‘দূর, সিরিয়াস হয় ভোধাই পাবলিকরা, আমি কি ভোধাই নাকি?’

ভাবি রে,
কথা বলা বন্ধ,
হয়ে গেছে দ্বন্দ্ব!
কেন রে?
মুখে যে দাগ!

বিভার পিসতুতো দাদার বউ সৌদামিনী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। বিভা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছিল। গালে হঠাৎ একটা ব্রণ চোখে পড়ায় অনেক দিন আগে বিটিভিতে দেখানো এ বিজ্ঞাপনটা মনে পড়ল তার।

‘ওরকম হাসলে হবে না, তোমার বলতে হবে, হেনোলাক্স স্পট ক্রিম আছে না?’

‘কী যে বলিস আবোল-তাবোল, মাথায় কিছু ঢুকে না আমার।’

‘অনেক আগে বিটিভিতে এ বিজ্ঞাপনটা খুব দেখাত, আমি মায়ের কাছ থেকে শুনেছি। এক ছেলে তার ভাবিকে গিয়ে বলছে যে তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলা বন্ধ কারণ তার মুখে দাগ, এরপর ভাবি দেবরকে একটা সলিউশন দেয় সলিউশন হলো হেনোলাক্স স্পটক্রিম।

সৌদামিনী বাংলাদেশে আসলো এ প্রথম। বিটিভির বিজ্ঞাপন সম্পর্কে তার জানার কোনো উপায় নেই।

সে তবুও পুরো ব্যাপারটায় ভারি মজা পেল। এ হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল ননদটিকে সে বরাবরই পছন্দ করে এসেছে। বলল, ‘তোর মুখের ওই দাগের জন্য কারও সাথে কথা বলা বন্ধ হবে না, বসার ঘরে যা, একজনকে নিয়ে এসেছি। তিনি ঢাকায় এসেছেন একটা বিশেষ কাজে।’

বিভা চোখে কাজল পরছিল। পরতে পরতে মুখ পাথরের মতো অনড় রেখে জিব নেড়ে বলল, ‘কাকে নিয়ে এসেছ?’

‘আনলাম এক বেচারাকে, সে বেচারার ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়।

‘তাকে আমার কেন দেখতে হবে? সে কী দেখতে অনেক হট? আমি আবার হট পোলাপাইন ছাড়া দেখা করি না, কথা বলি না।’

সৌদামিনী পাগল ননদের কথা শুনে হাসে, ‘তা তো তোর নিজের চোখেই দেখতে হবে। আমি কী করে বলব?’

বিভা একটা হালকা গোলাপি রঙের সুতোর কাজ করা সালোয়ার কামিজ পরেছে, তার সাথে সাদা ওড়না। গাঢ় কালো কাজল পরেছে বলে তার প্রতিমার মতো টানা চোখ দুটো আরও বড় দেখাচ্ছে। কপালে পরেছে লাল টিপ। চুলে করেছে এক বেণি। একটু অন্যরকম দেখছিল ওকে। অন্যরকম কিন্তু স্নিগ্ধ। ভারি স্নিগ্ধ। একবার চোখ পড়লে আরেকবার তাকাতে ইচ্ছে করে।

বসার ঘরে গিয়ে দেখা গেল বাবা-মায়ের পাশে বিভার পিসতুতো দাদা তাপস বসে আছে। আজ সকালেই কলকাতা থেকে আসলো ওরা। তাপসের পাশে বসে আছে এক অচেনা যুবক। যুবকের চোখে সোনালি পাতলা ফ্রেমের চশমা। গায়ের রং তামাটে। গায়ে গতরে বেশ বড় সড়। চেহারায় একটা ভালো ছাত্র ভালো ছাত্র ছাপ আছে।

বিভা ঘরের ভেতর ঢুকতেই যুবকের সাথে চোখাচোখি হলো। যুবক ভদ্রতার হাসি হাসল। বিভাও।

বাবা বলল, ‘বিভা মা, এ হচ্ছে তোমার দাদার বন্ধু। কলকাতা থেকে এসেছেন। ঢাকায় কটা দিন থাকবেন।

যুবক ভদ্রতার হাসিটি মুখে ঝুলিয়ে রেখেই বলল, ‘হ্যালো, আমি অভিজিৎ রয়।’

‘বিভাবরী ভট্টাচার্য।’ বিভাও নিজের পরিচয় দিলো।

বাবা বললেন, ‘তুই বাইরে যাচ্ছিস নাকি?’

‘হ্যাঁ বাবা।’

‘কোথায় যাচ্ছিস?’

‘এইতো হৃদির বাসায় যেতে হবে, একটা কাজ আছে।’

‘বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কিছু আছে নাকি তোর জীবনে?’ বলে বাবা অভিজিতের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার এ মেয়ে হচ্ছে বন্ধু পাগলা, বুঝলে? বন্ধুদের জন্য সে নিজের জীবনও দিয়ে দিতে পারবে, ছেলেমানুষ রয়ে গেছে এখনো।’

অভিজিৎ হাসল। কিছু বলল না।

বাবা বলল, 'এক কাজ কর, তুই গাড়িটা নিয়ে বের হ, অভিজিৎকেও নিয়ে নে সাথে। ওর এ ফাঁকে ঢাকা শহরটা দেখা হোক।'

বিভার মুখ চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মতো। কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'ঢাকা শহরে দেখার মতো কিছু নাই, খালি গাড়িঘোড়ার জ্যাম আর জ্যাম।'

'ওই জ্যামই দেখবে, কোনো সমস্যা নেই।

অগত্যা বিভার সাথে অভিজিৎ রয়ও বের হয়ে আসল।

গাড়িতে উঠেই বিভা অভিজিৎকে বলল, 'দেখুন অভিজিৎ বাবু, আমি কিন্তু খুব বাজে ড্রাইভ করি, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। লাইফ রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। আপনি চাইলে নেমে যেতে পারেন গাড়ি থেকে, আমি বাবাকে কিছু বলব না।'

অভিজিৎ কথাটা শুনে সরু চোখে তাকালো বিভার দিকে। বিভার চোখে চোখে সরাসরি চেয়ে থেকে কিছু একটা পড়ার চেষ্টা করল। বলল, 'উঠে যখন পড়েছি লাইফ রিস্কটা না হয় নিয়েই দেখি।'

বিভা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর একটু জোরেই টান দিলো গাড়ি। শাঁই করে ঘুরিয়ে বড় রাস্তায় তুলল। সে এখন যাবে হৃদির বাসায়। তারপর সেখান থেকে যাবে গুলশান গ্লোরিয়া জিন্স কফি'স এ। সামির নাকি আজকে ব্লাইন্ড ডেইট না কী যেন আছে। সে ব্লাইন্ড ডেইট নিয়ে মজা উড়াতে বন্ধুরা সব এক সাথে হচ্ছে। এ হাঁদারাম বডিগার্ডকে বিভা কোথায় রাখবে? বগলদাবা করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে? হৃদির বাসায় গিয়ে হৃদিকে বলবে, 'দ্যাখ, বাবা আমার জন্য একটা হাঁদারাম বডিগার্ড ঠিক করেছে, এখন থেকে এ হাঁদারাম আমার বগলে বগলে ঘুরবে। তোরা হাঁদারামকে সর্বক্ষণ সহ্য করার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রাখ।'

রাগ হলেই বিভার কপাল কুঁচকে যায়। ঠোঁট বেঁকে যায়। বিভাকে পড়া খুব সহজ। অভিজিৎও পড়ে ফেলল।

'শুনুন, বলছিলাম কী, আমায় না হয় কোথাও ড্রপ করে দিন, ড্রপ করে আপনি আপনার মতো চলে যান। যদিও আমি ঢাকার কিছু চিনি না, কিন্তু গুগল ম্যাপ আছে, প্রবলেম হবে না।'

'আপনাকে আবার কোথায় ড্রপ করব?' বিভা খিটমিট করে উঠল।

অভিজিৎ একটু ভড়কাল বিভার খ্যাক শুনে। মিনমিনে গলায় বলল, আপনার 'না যদি আবার অসুবিধে হয় তাই...'

'আপনি চুপ করে থাকলেই আমার খুব সুবিধে হবে, বকবক করে মাথা ধরাবেন না প্লিজ!'

অভিজিৎ আড়চোখে তাকাল বিভার দিকে। বিভার গালে তখন বিকেল বেলার রুপালি রোদ। সে আবার ক্যাটক্যাট করে বলল, 'চোরের মতো তাকিয়ে থাকবেন না, আমার বিরক্ত লাগে।'

'ওরে বাবা!' অভিজিতের মুখ থেকে আপনাআপনি বের হয়ে গেল শব্দ দুটো।

'কী বাবাকে ডাকছেন কেন?'

'আপনার তেজ দেখে, বাপের মুখটা মনে পড়ে গেল।'

'কেন? বাপের মুখ মনে পড়ার মতো কী হলো, হ্যাঁ?'

'না আমার বাপেরও আপনার মতো অনেক তেজ কি না, তাই।'

বিভার গাড়ি সেগুনবাগিচার জ্যামে আটকাল। অভিজিৎ বলল, 'আপনাদের এ ঢাকা শহরের বেশিরভাগ লোকজনই কি আপনার মতো? নাকি আপনিই একটু ডিফারেন্ট?'

'আমার মতো বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?'

'না মানে, আপনার মতো এরোগ্যান্ট নাকি এ শহরের বেশিরভাগ মানুষই?

বিভা রাগটা গিলল, বলল, 'ঢাকায় এই আপনার প্রথম আসা?'

'না, এর আগে একবার এসেছিলাম, ছোটবেলায়।'

'তা হঠাৎ এতদিন পর কী মনে করে?'

'আপনার দাদা নিয়ে এলো, আমার তো কোনো উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু আপনার দাদার আমাকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না তা আমার জানা নেই।' বলে অভিজিৎ কাঁধ ঝাঁকাল ১

'কী করা হয়?'

'সরকারি চাকরি, বন বিভাগে।'

'কলকাতায় থাকেন?'

'কলকাতায়ই বসত ভিটে। জলপাইগুড়িতে চাকরির পোস্টিং।'

'ছুটি জোগাড় করলেন কী করে?'

'করতে হলো। পরিবারকেও তো একটু সময় দেওয়া চাই তাই না!'

'হুম।'

পুরানা পল্টনে হৃদির বাসার সামনে এসে গাড়ি থামাল বিভা।

হৃদি রেডি হয়ে নিচে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। বিভা গাড়ি থেকে নেমে হৃদিকে অভিজিতের চোখের আড়ালে নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আমার বাপ আমার জন্য এক বডিগার্ড নিয়োগ করছে বুঝছস? এখন বডিগার্ড ঘাড়ে নিয়ে ঘুরতে হবে আমার।

হৃদির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'ওয়াও! জোস তো, বডিগার্ড কি হ্যান্ডসাম?'

'ধ্যাৎ, হ্যান্ডসাম হোক, আমার কী?'

হৃদি গাড়ির ড্রাইভিং সিটের পাশে বসা অভিজিৎকে দেখে বলল, 'ভালো তো দেখতে, হ্যান্ডসাম আছে, হ্যান্ডসাম বডিগার্ডে আমার কোনো প্রবলেম নাই।' বিভা একটা ধমক দিয়ে ওঠে বলল, 'আজাইরা কথা বলিস না তো!'

হৃদি নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়ে অভিজিৎ এর সাথে পরিচিত হলো। পেছনের সিটে ওঠে বসল।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর অভিজিৎ বলল, 'ঢাকার মেয়েরা যে সুন্দরী হয়, এ ফ্যাক্টটা তো আমার জানা ছিল না।'

বিভা দর্পিত গলায় বলল, 'এবার জানলেন তো? বাহ দারুণ কপাল তো আপনার, প্রথম দিনেই দু'দুটা সুন্দরী মেয়েকে পাশে পেয়ে গেলেন।'

আমি আপনার বান্ধবীর কথা বলছি, আর আপনি তো কলকাতার মেয়ে, ঢাকার হতে যাবেন কেন?'

বিভা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, 'আমি মোটেও কলকাতার মেয়ে নই; আমার জন্ম বাংলাদেশে। আমি বাংলাদেশি।

'তাতে কী, আপনার পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি তো সব ইন্ডিয়ায়।'

'বাহ অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন দেখছি আমার সম্পর্কে?'

'হুম জানতে হলো আর কী!'

এরপর বাকি পথটায় হৃদিতার সাথে অভিজিতের খুব ভালো জমে গেল আড্ডা। বিভার পিত্তি জ্বলতে জ্বলতে খাঁক হয়ে গেল। তাতে কারো কিছু আসলো গেল না।

গুলশান গ্লোরিয়া জিন্সে এসে দেখা গেল আকাশ এবং সামি দুটো আলাদা আলাদা টেবিল দখল করে বসে আছে। আকাশের সাথে অমৃতাও আছে। কিন্তু সামিকে দেখে মনে হচ্ছে সে এদের কাউকে চেনে না। তার হাতে মোবাইল। সে ঘন ঘন কফি শপের প্রবেশ পথের দিকে তাকাচ্ছে। বিভাদের ঢুকতে দেখে চোখ দিয়ে ইশারা করে বলল, হাই। পরমুহূর্তেই চোখ ফিরিয়ে

নিল। যেন সে এসেছে এখানে ছদ্মবেশে। একটু অসাবধান হলেই ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। বিভারা আকাশদের টেবিলে যোগ দিলো।

সামির মেসেঞ্জারে টেক্সট আসলো, 'তুমি কোথায়?'

সামি লিখল, 'যেখানে থাকার কথা।'

উত্তর আসলো, 'আমিও তো সেখানেই, আমি ব্ল্যাক শার্ট পরে আছি। স্ট্রেইট চুল। হাতে ব্ল্যাক পার্স।

ওই তো সামনের টেবিলেই একটা লম্বা, হ্যাংলা পাতলা মেয়ে পেছন ফিরে বসে আছে। এত লম্বা মেয়ে সামি জীবনে প্রথম দেখল। বাংলাদেশের মেয়েরা সাধারণত এত লম্বা হয় না। ঘাড় অবধি স্ট্রেইট চুল, ব্ল্যাক শার্ট। সামি ভালো করে লক্ষ্য করল, হাতে কালো পার্স আছে কি না। দেখা গেল আছে। বুকটা একটু ধুকপুক করতে লাগল। কাঁপা অন্তর নিয়ে ধীরে ধীরে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সামি।

সিল্কি চুলের মেয়েটার পেছনে এসে দাঁড়াল সামি, দুরুদুরু কম্পনরত বুক নিয়ে গদগদ গলায় বলল, 'যাক শেষ পর্যন্ত দেখা হয়েই গেল।' মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। কফিশপের মলিন হলদে আলোয় ওই চেহারাটা দেখে সামি ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। রুদ্র দাঁত কেলিয়ে হাসছে। এর মানে কী? যে মেয়েটার সাথে সে গত দুদিন ধরে প্রেম করে আসছে, রাত জেগে কথা বলে আসছে সে মেয়েটা আদতে কোনো মেয়েই নয়? সে রাত জাগানিয়া রহস্যময়ী মানবীটি আসলে বাস্তবে তার বন্ধু রুদ্র?

সামি ঝাঁপিয়ে পড়ে রুদ্রর শার্টের কলার চেপে ধরে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'ওই শালা, হারামির বাচ্চা মজা লস আমার সাথে? আইজকা তোর একদিন কি আমার একদিন!'

রুদ্রকে বাঁচাতে আকাশ আর অমৃতা ছুটে আসলো। রুদ্র তো হেসেই বাঁচে না। আর রুদ্র যত হাসে, সামির রাগ তত বাড়ে।

ছোটখাটো একটা সিনেমা হয়ে গেল ওখানটায়। মারামারি হাতাহাতি চলতে থাকল। একটা পর্যায়ে সামিকে জোর জবরদস্তি টেনে হিঁচড়ে আকাশ আর অমৃতা কফিশপের বাইরে নিয়ে আসলো।

ফুটপাতের ওপর দাঁড়াল ওরা। তখন সন্ধ্যে হচ্ছে মাত্র। রাস্তায় তুমুল জ্যাম গাড়িঘোড়ার

সামির গাল লাল। ওর ঔদ্ধত্যপনা দেখে রুদ্রও একটু উত্তেজিত হয়ে গেছে।

আকাশ বলল, 'যা হবার হয়ে গেছে এখন ভুলে যা ওসব।

রুদ্র বলল, 'ভাই একটু মজাই তো করলাম, এতে এত রাগ করার কি আছে? আমি আরো ভাবলাম আমারে দেইখা তুই খুশিতে দুই লাফ দিবি, চিটাগাং থেকে চইলা আসছি তোদের সাথে দেখা করার জন্য

'চুপ থাক হারামজাদা!' চিৎকার করে ওঠে সামি।

অমৃতা সামির পিঠে সান্ত্বনার হাত রেখে বলল, 'থাক দোস্ত মাফ কইরা দে ওরে, ভুল করে ফেলছে বেচারা, আর করবে না।' এটুকু বলে রুদ্রকে ধমক দিলো সে, 'ওই রুদ্র মাফ চা, মাফ চা সামির কাছে পায়ে ধইরা মাফ চা।'

'মাফ চাওয়ার মতো কী এমন কাজ করলাম বুঝলাম না।' রুদ্র ভারী গলায় বলল।

'কী এমন কাজ করছিস মানে? তুই বেচারার ইমোশন নিয়া ছিনিমিনি খেলছিস।'

রুদ্র সত্যিই পায়ে পড়ল সামির।

'দোস্ত মাফ কইরা দে, এই ভুল আর হব না।'

সামি মাছি তাড়াল, 'যা যা ভাগ, ঢং করিস না।'

'কিন্তু মামা তোমার সাথে প্রেম কইরা আমি চরম মজা পাইছি। একদম সেই লেভেলের মজা' রুদ্র বলল।

সামি বলল, 'তোকে এরকম স্ট্রেইট সিল্কি চুলে সত্যিই হিজড়া লাগতেসে, সহ্য করতে পারতেছি না। দয়া করে চুলগুলা ঠিক করে আয়।'

হৃদি আর বিভাও বেরিয়ে আসলো। পেছনে অভিজিৎ। অভিজিৎকে দেখে সামি নাক মুখ কুঁচকে বিভার কানে কানে প্রশ্ন করল, 'এ বোকা-চোদাটা আবার কে?'

বিভা ফিসফিস করে বলল, 'বাজে কথা মুখে আনিস কেন খালি? ভদ্র একটা লোককে নিয়ে খারাপ কথা বলছিস কেন?'

'হাহ্! ভদ্র লোকটার জন্য তো তোমার দরদ উথলে পড়ছে দেখি, তা কী হয় ভদ্রলোকটি তোমার?'

'আত্মীয় ছোট করে পাশ কাটানো উত্তর দিলো বিভা। যদি অভিজিৎ শুনে ফেলে তো কী ভাববে?

সামি কি জেলাস অভিজিৎকে দেখে? কিন্তু কেন? ভাবনাটা মাথায় আসতেই বিভার ঠোঁটের কোণে দেখা দিলো এক চিলতে হাসি।

কিন্তু না, তা কেন হবে? সামি তো বলেছিল খারাপ ছিল, বাজে ছিল। তাহলে অভিজিৎকে দেখে কেন সে জ্বলবে? বিভাই ভাবছে বেশি। সামির মনের ভেতর কিছু নেই। কোনো গভীরতা নেই। আবেগের বাড়াবাড়ি নেই। কেমন যেন শুকনো খটোমটো ওর মনের ভেতরটা। ইচ্ছে করল কাছে টেনে নিল, আবার ইচ্ছে করল তো দূরে সরিয়ে দিলো পায়ে ঠেলে। এ হচ্ছে সামি

ওরা গুলশানের একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার করল। সময়টা বরাবরের মতোই চমৎকার কাটল। শুধু অভিজিৎ থাকায় কথাবার্তা একটু হিসেবে করে বলতে হলো এই যা।

ফেরার সময় সামি বিভাকে হুমকি দেওয়ার গলায় বলল, ‘এ চিড়িয়াখানার চিড়িয়াকে যেন সেকেন্ডটাইম আমাদের মধ্যে না দেখি। আর আনবি না।’

বিভাও কেটে কেটে উত্তর দিলো, ‘একশবার আনব, আমি চিড়িয়া ভালোবাসি।’

অমৃতা বাড়ি ফিরে দেখল দীপা কাঁদছে। দীপার আজকাল যেকোনো ছুতোয় কান্নাকাটি জুড়ে দেওয়ার একটা বাজে অভ্যাস হয়েছে। সদ্য এইচএসসি পাশ করেছে সে। কোনো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চান্স পায়নি। কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথাও নেই। তার ভাবসাব দেখে মনে হয় পড়ালেখাটা একটা নেহাত ফালতু কাজ ছাড়া কিছুই না। কীভাবে ফিগার ভালো থাকবে আর কী মাখলে গায়ের রং ফরসা হবে এ নিয়ে গবেষণা করাই ইহজীবনের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ওরা দুবোন একটা ঘর শেয়ার করে। ঘরটা মোটামোটি প্রশস্ত। উত্তরে জানালা। ঘরের ভেতর দুটা খাট, দুটা পড়ার টেবিল। দীপা তার পড়ার টেবিলে মাথা উপুড় করে রেখে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পাশের ঘরে আম্মি কলেজের ফাইনাল পরীক্ষার খাতা দেখছে। আম্মি একটা বেসরকারি কলেজের গণিতের লেকচারার। অমৃতা দীপাকে কোনো প্রশ্ন না করে আম্মির কাছে গিয়ে বলল, ‘ওর কী হয়েছে? কাঁদছে কেন?’

আম্মি খাতা থেকে মুখ না তুলেই উত্তর দিলো, ‘টাকা চাই তার’

‘কত টাকা?’

‘পাঁচ হাজার।’

‘কী করবে এত টাকা দিয়ে?’

‘বন্ধুদের খাওয়াবে, তার জন্মদিন কাল।’

‘ও’

অমৃতার মনটা খারাপ হয়ে গেল। দীপা আজকাল যাচ্ছেতাইভাবে টাকা খরচ করে এ কথা ঠিক। কিন্তু মেয়েটার জন্মদিন বলে কথা। জন্মদিনের দিন একটা মেয়ে মন খারাপ করে বসে থাকবে, কান্না করবে, এটা তো মেনে নেয়া যায় না।

আগে প্রতি মাসে তাদের দুবোনকে দু হাজার টাকা হাতখরচ দেওয়া হতো। আব্বু রিটায়ার্ড করার পর থেকে সে হাতখরচের টাকা দু হাজার থেকে কমে হয়ে

গেল এক হাজার। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিল আব্বু। কালো টাকা বানাতে পারেনি বলে নিজের আখের ঠিকমতো গোছানো হয়ে ওঠেনি। নিজের জন্য কিছু করে ওঠার আগেই রিটায়ারমেন্টের সময় চলে আসলো। আজীবন সরকারি কোয়ার্টারে থেকেছে তারা। চাকরি যাবার পর ভাড়া বাসায় উঠতে মন চায়নি বলে আব্বু ব্যাংক লোন নিয়ে মোহাম্মদপুরের এ ফ্ল্যাটটি একরকম ঝুঁকি নিয়েই কিনে ফেলল। এখন প্রতি মাসে ফ্ল্যাটের লোন শোধ করতে হয় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। বাড়িতে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এখন আম্মি। কলেজের পাশাপাশি দু একটা টিউশনিও করতে হয় আম্মিকে সংসার চালানোর জন্য। পাশাপাশি আছে আব্বুর পেনশনের টাকা। এ দিয়ে টেনেটুনে চলতে হচ্ছে। হাজার টাকা খরচ করে বন্ধুদের খাওয়ানোর মতো পরিস্থিতি এখন সত্যি নেই।

অমৃতা রোজ গাড়িভাড়া বাবদ সিনিয়রের কাছ থেকে পায় ৩০০ টাকা। প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হতে গেলে কম করে হলেও আরো পাঁচটা বছর এক রকম বিনে পয়সায় গাধার খাটুনি খাটতে হবে। মাঝে মধ্যেই মনে হয়, আইন পড়ে ভুল করল না তো? বিবিএ, এমবিএ করে একটা ব্যাংকে চাকরি নিয়ে নিলে সংসারে কিছু কন্ট্রিবিউট করা যেত। তবে ব্যাংকের চাকরিও আজকাল পাওয়াটা খুব কঠিন। অথবা কোনো প্রাইভেট কোম্পানিতে এইচআর'এ চেষ্টা করতে পারত। নাহ, আসলে অমৃতা আইন ভালোবাসে। আইন তার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা। পড়াশোনার কথা মাথায় আসলে আইন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের কথা ভাবতে পারে না সে।

অমৃতা দীপার মাথায় হাত রেখে কোমল গলায় বলল, 'এক কাজ কর বন্ধুদের বাসায় বলে দে, বাসায় রান্না হবে, খরচ কম পড়বে।'

দীপা কান্না মেশানো গলায় হেঁচকি দিয়ে বলে উঠল, 'আপুনি তুই এসব বলতে আসিস না বুঝেছিস? নিজে তো ঠিকই বন্ধুদের সাথে গ্রান্ড ট্যুর করে আসছিস। আব্বু তোকে সবকিছু দিবে আর আমার বেলায়ই সবসময় না আর না!'

'আব্বুর কাছ থেকে আমি একটা টাকাও নেইনি কক্সবাজার যাওয়ার জন্য। বিশ্বাস কর! আমি ইনফ্যাক্ট শুধু একবেলা খাওয়ার বিল দেওয়া ছাড়া আর কোনো টাকাই খরচ করি নাই। আমাদের এক বড়লোক বন্ধু আছে, সামি। তুই তো চিনিস। সে পুরো ট্যুরটা এরেঞ্জ করল।'

‘জানি না অতকিছু, আপুনি আমার ফ্রেন্ডদের কাছে আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। এবার একটা ভালো ট্রিট ওদের দিতেই হবে, যে করেই হোক। আমি কী অজুহাত দিবো ওদের? বলব যে আমার বাপের টাকা নাই, আমার বাপ একটা ফকির?’

‘তা কেন বলবি? সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে বলতেই পারিস। বলে দে এখন হাতে টাকা নাই, ট্রিট পাওনা থাকল।’

‘অসম্ভব! এটা বললে আমার মান-ইজ্জত কিছু থাকবে না।’

‘বন্ধুদের কাছে আবার অত মান-ইজ্জতের কী আছেরে? আর বন্ধুদের যদি সত্য কথাটাই না বলতে পারিস, তাহলে এমন বন্ধু দিয়ে করবি কী?’

দীপা একটু রেগে গিয়ে বলল, ‘বাজে কথা বলিস না তো আপুনি, আমার বন্ধুরা তোর বন্ধুদের মতো ক্লাসলেস না, সবাই বড়লোক বাবার ছেলেমেয়ে। পশ এরিয়ার মানুষজন এরা। যা তা বলা যায় না ওদের।’

অমৃতার মুখে একটা কড়া কথা চলে আসছিল, শেষমেশ সামলে নিল নিজেকে। দীপার বন্ধুভাগ্যটা তার মতো ভালো হয়নি বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য কজনের বন্ধুভাগ্যই বা তার মতো এত ভালো হয়? বন্ধুদের কথা মনে আসতেই এ দুঃসময়েও তার ঠোঁটে একটা হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠল। পাগলাগুলো না থাকলে তার জীবনটা যে কী নিরামিষ হতো তা ভাবাই যায় না। দীপা এখনো বন্ধু শব্দটার অর্থ বোঝেনি। আদৌ কোনোদিন বুঝবে কি না কে জানে!

‘এই যে মশাই, অমন বাঁকাচোখে চোরের মতো তাকিয়ে থাকতে তো আপনাকে বারণ করেছি, তাই না?’ বিভা বলল, প্রায় ধমকের সুরে।

অভিজিৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠে বলল, ‘ও সরি!’

এরপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে যেন সাহস সঞ্চয় করল বুকে, বলল, ‘কেন? তাকাতে দোষ কোথায়?’

‘তাকাতে দোষ নেই, কিন্তু চোরের মতো তাকানোতে দোষ আছে।’

‘মোটেও আমি চোরের মতো তাকাচ্ছিলাম না, জাস্ট দেখছিলাম।’

বিভা যেন খুব বোঝা বুঝেছে এমন গলায় বলল, ‘ও আচ্ছা! দেখছিলেন? তা কী দেখছিলেন আপনি? আমার রূপ?

অভিজিৎ ঠোঁট উল্টে বলল, ‘মোটেও না! বরং দেখছিলাম কয় কেজি আটা ময়দা মুখে মেখেছেন, আর রূপ তো আটা-ময়দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে, দেখার কোনো উপায় নেই।’

বিভা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল।

‘ওসব মাখার কোনো প্রয়োজন আমার নেই বুঝেছেন? আমি এমনিই সুন্দর।

‘নিজের সম্পর্কে দেখছি আপনার খুবই উচ্চধারণা। ভালো, সেলফ রেস্পেক্ট থাকা ভালো!’

বিভার মুখখানা অপমানে থমথম করে উঠল।

ওরা লিফটের জন্য অপেক্ষা করছে এপার্টমেন্টের লবিতে। গুলশান থেকে মাত্র ফিরল। লিফট এখন তিনতলা থেকে দোতলায় নামছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ওদের সমতলে অবতীর্ণ হয়ে নিমেষে দরজা খুলে যাবে। রাত হয়ে গেছে বলে এদিকটায় শুধু সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া অন্য কোনো জনমানব নেই। লিফটের দরজা খুলে গেলে দুজন ঢুকে পড়ল যান্ত্রিক বাক্সটার ভেতর। বিভা তিন নম্বর বোতামটা প্রেস করল।

‘আপনার বন্ধুদের কিন্তু বেশ লাগল।’ অভিজিৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল।

‘বেশ লাগার মতোই তো ওরা। কম লাগার তো কোনো চান্স নেই।’

‘তা বটে, আপনি আপনার বন্ধুদের খুব ভালোবাসেন, তাই না?’

‘খুব!’

‘আচ্ছা! এদের মাঝে কোনো বিশেষ বন্ধু আছে নাকি?’

‘বিশেষ মানে? এরা প্রত্যেকেই আমার কাছে অনেক অনেক স্পেশাল!’

‘না মানে, বলতে চাইছিলাম, ইয়ে... আপনার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই?’

‘থাকলেই বা আপনাকে বলব কেন?’

বিভার উত্তরে অভিজিৎ একটু কোণঠাসা হলো। নেতানো স্বরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘ফেয়ার এনাফ! আমাকে কেন বলবেন!’

সম্মুখের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে আসল দুজন। ফ্ল্যাটে ঢুকেই বাবা-মা, দাদা আর বৌদি একযোগে প্রশ্ন করল ‘কেমন কাটল দিনটা?’

ঠিক সে সময় বিভার মনে প্রথমবারের মতো ঢং করে অশনিসংকেতের ঘণ্টাটা বাজল। ঘটনা কী? সবাই এত উদগ্রীব হয়ে আছে কেন তাদের মতামত জানার জন্য? বিভা ভেতরে ভেতরে এলোমেলো হতে থাকল। কোনো রকমে ‘ভালো ছিল’ বলে নিজের ঘরে গিয়ে লুকালো সে।

রুদ্র সুইমিং পুলের জলে পা ডুবিয়ে বসে ছিল। ঘড়িতে সকাল দশটা বাজে। একটু বাদে সে তার নতুন টিউশনের বাসায় যাবে। এ লেভেলের ছাত্র। ফিজিক্স পড়াবে সে। মাসে আট হাজার বেতন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে টিউশনিটা জোগাড় করেছে। ফোনের মাধ্যমে কথা পাকাপাকি করেছে। উত্তরাতেই বাসা। যাতায়াতের কোনো সমস্যা হবে না। ঢাকায় আপাতত রুদ্রর থাকার জায়গা হয়েছে সামিদের বাসায়। টানা সাত বছর ঢাকায় থেকে পড়াশোনা করার পর এখন আর চট্টগ্রামে মন বসছে না। না, ঢাকা শহরে সেটেল করার কোনো সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি সে। তার ইচ্ছে আছে আটলান্টিকের ওপারে পাড়ি জমানোর। কয়েক জায়গায় এপ্লাইও করে ফেলেছে এর মাঝে। এডমিশন হওয়া, স্কলারশিপ জোগাড় করা, কিছু মিলিয়ে আরো বছরখানেক সময় লেগে যেতে পারে। এর বেশিও লাগতে পারে। এ কয়েকটা দিন ঢাকা চিটাগাং মিলিয়েই থাকবে সে। ঢাকায় কিছুদিন থাকলে বাবা-মা আর বোনটার জন্য মন পোড়ে আবার চিটাগাং গিয়ে থেকে গেলে বন্ধুদের জন্য মন পোড়ে। এই এক অদ্ভুত দোটানা নিয়ে চলছে তার জীবন।

সামিদের উত্তরার এ তিনতলা অট্টালিকাটি তার খুব প্রিয়। এ বাড়িতে আসলে মনে হয় যেন চেনা-জানা বাস্তব জগৎ ছেড়ে রূপকথার এক কল্পরাজ্যে চলে এসেছে।

ঢাকা শহরের ফুটপাতের ধুলোবালি আর মধ্যবিত্ত নাগরিক টানাপোড়েনের ছিটেফোঁটাও এ বাড়িতে এসে পড়ে না। বাগান থেকে শুরু করে সুইমিংপুল, জিম, বিশাল লাইব্রেরি, কী নেই এ বাড়িতে? এমনকি যখন-তখন ইচ্ছেমতো গান বাজনা করার মতো একটা সাউন্ড প্রুফ প্র্যাকটিস প্যাড পর্যন্ত আছে। যেটা কি না রুদ্রর সব চাইতে পছন্দের অংশ। তাছাড়া সামির আব্বা ইলেকশনে জেতার পর জন সাধারণের কাছেও বাড়িটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সকাল রাত কড়া সিকিউরিটি থাকে বাড়ির বাইরে। ভাবসাবই আলাদা।

সামি কাছেই একটা চেয়ারে বসে আছে ওর সদ্য কেনা মাইক্রোসফট

সারফেস বুকে নিয়ে। মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা করছে সে। তার মুখে খেলা করছে হালকা একটা দুশ্চিন্তার ছায়া।

'কী রে কিছু হয়েছে নাকি? এমন দেখাচ্ছে কেন তোকে?' রুদ্রর প্রশ্ন।

'ড্যুড, একটা ঝামেলা হয়ে গেছে!' সামি বলল চিন্তিত গলায়।

'কী ঝামেলা?'

'তোরে বলছিলাম মনে আছে? আব্বার জোরাজুরিতে আমি যে একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে সিভি ড্রপ করছিলাম?'

'ওই যে বারিধারায় ক্যাম্পাস?'

'হুম, ওই ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর তো আব্বার বন্ধু বুঝছস? তো আব্বা তো আংকেলরে আমার কথা বলে দিছে আগেই।'

'হুম তো ভালো তো, তোর চাকরি কনফার্ম। এটা তো খুশির খবর। মুখ কালা করছস কেন?'

'আরে, আকাশও ওই ভার্সিটিতে এপ্লাই করছে দোস্ত! পরশুদিন ওরেও কল করছে। এইমাত্র মেসেঞ্জারে বলল। কিন্তু আমি যতটুকু জানি ওরা শুধুমাত্র একজনই নিবে। একটাই ভেকেন্সি আছে।'

'ও'

সামি রুদ্রর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'দোস্ত আকাশের চাকরিটা দরকার।'

'হুম'

ছোট করে বলল রুদ্র, তার ক্যাটস আই চোখদুটোতে হালকা একটু অস্বস্তি নাচলো। এমন পরিস্থিতিতে ঠিক কী বলতে হয় তার জানা নেই।

'শিট! আব্বা তো আমার নাম আংকেলকে জানায় দিসে এখন কী করব?'

'থাক সমস্যা নাই। তুই এটা নিয়ে আকাশকে কিছু বলিস না। ওর অন্য কোথাও চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সামি কিছুক্ষণ রুদ্রর চোখের দিকে অপলক চেয়ে থেকে বলল, 'নারে চাকরিটা আমার চাইতে বেশি আকাশের প্রয়োজন। তুই তো জানিস ও বাসা থেকে কোনো হাতখরচ পায় না। বেচারার দিনকাল কাটছে অনেক টানাটানিতে।'

'হুম তাতো জানি।'

সামি চট করে ওঠে দাঁড়াল। হাতে ধরে থাকা সারফেসটা রুদ্রর হাতে

ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি যাই আব্বাকে গিয়ে বলি আমার নামের জায়গায় আংকেলকে যেন আকাশের নামটা দিয়ে দেয়।'

'দোস্ত যা করবি ভেবে-চিন্তে করিস।'

'আরে চিন্তা ভাবনার কী আছে, এ চাকরি আকাশ না পাইলে দুনিয়ার আর কেউ পাবে না।'

সামি দ্রুত পায়ে জায়গাটা ছাড়ল।

রুদ্রও উঠল। সাড়ে দশটার ভেতর স্টুডেন্টের বাসায় হাজির হওয়ার কথা। প্রথম দিনটা অন্তত সঠিক সময়ে পৌঁছুতে চায় সে।

.

দ্বিতীয়বার কলিংবেল বাজাতেই দরজাটা খুলে গেল। পনেরো কী ষোলো বছর বয়সী যে ছেলেটা দরজা খুলল তাকে দেখেই রুদ্র বুঝল এটাই তার ছাত্র।

ছেলেটা হেসে বলল, 'আপনি কি রুদ্র ভাইয়া?'

'হ্যাঁ, আমিই রুদ্র।'

'আসুন, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

রুদ্র বসার ঘরের সোফায় বসল। ছেলেটা ভেতরে চলে গেল। ফিরে আসলো মিনিট খানেকের মাঝেই বইপত্র হাতে নিয়ে। ভালো লাগল রুদ্রর। মনে হচ্ছে এ ছেলের পড়ালেখায় আগ্রহ আছে। ফাঁকিবাজ ধরনের হাবাগোবা ছাত্র রুদ্রর একদম পছন্দ না।

বইপত্রগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতেই ঘরের ভেতর চায়ের কাপের ট্রে হাতে নিয়ে একটি মেয়ে প্রবেশ করল। মেয়েটির পরনে একটি সাদা সুতির শাড়ি। ছিপছিপে দেহ। চুলগুলো খোঁপায় আঁটা। মেয়েটা চায়ের কাপের ট্রে সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখল।

মেয়েটার চোখদুটো কেমন যেন অদ্ভুত। কেমন যেন... একটু বেশি গভীর! সাগরের মতো গভীর! রুদ্র তার জীবনে এই প্রথম কোনো সাগর চোখা মেয়ে দেখল। মেয়েটি হাসল। তার সাগরের মতো গভীর চোখ দুটোতে সে হাসি একটা মিষ্টি রেখাপাত করল।

রুদ্র একটু টলল ভেতরে ভেতরে। তার কানের ডগা ঈষৎ লাল হলো। মুখখানা কাঁচুমাচু করে স্বগতোক্তি করল, হে আল্লাহ্! কী বিপদে ফেলাইলা! টিউশনে এসেই কেন সুন্দরীর সাক্ষাৎ? অন্য জায়গায় ঘটতে পারত না ঘটনাটা? এ তোমার কেমন বিচার?

'সব ঠিক আছে তো?' মেয়েটির প্রশ্নে ভাবনার ঘোর থেকে ফিরল রুদ্র।

অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'ঠিক আছি।'

মেয়েটি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে রুদ্রর দিকে তাকাল, 'আপনার নাম রুদ্র?'

'জি'

'আমি মনীষা'

রুদ্রর বুকে আবার টলটলানি ফিরে আসলো। মেয়ে দেখতে যেমন সুন্দর নামও তেমন সুন্দর। মনীষা!

রুদ্র হাসল। অপ্রস্তুত হাসি। ঢেউ খেলা অবাধ্য চুল কপালে এসে পড়েছিল। হাত দিয়ে সে চুল সরাল। তারপর কিছু বলার খুঁজে না পেয়ে ফিজিক্স বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'রাইয়ান, ভাইয়াকে ভেতরের রুমে নিয়ে যাও, এখানে কেন?' মনীষা বলল রুদ্রর ছাত্রকে।

ছাত্রর নাম রাইয়ান। এ খবরটাও জানা ছিল না। ধ্যাৎ সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বাই দ্যা ওয়ে, মনীষা রাইয়ানের কী হয়? বড় বোন হবে নিশ্চয়ই।

রুদ্রর কেমন তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। ট্রের ওপর রাখা ঢাকনা দেওয়া পানির গ্লাসের ওপর থেকে ঢাকনা খুলে ঢক ঢক করে পানি গিলতে লাগল সে।

রাইয়ান মনীষার কথা শুনে বলে উঠল, 'নিচ্ছি আম্মু! ভাইয়া আগে চা'টা শেষ করুক।'

আম্মু?? রাইয়ানের মাত্র বলা কথাগুলো যেন রুদ্রর কানের কাছে আগ্নেয়গিরি ঘটাল। গিলতে থাকা পানি নাকে মুখে ওঠে গেল। কাশতে কাশতে পানি ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

রাইয়ান আর মনীষা দুজনেরই আক্কেলগুড়-ম হয়ে গেল রুদ্রর কাণ্ড দেখে।

ছি, কী লজ্জা! কী লজ্জা! সামনে বসা মানবীটি পনেরো কি ষোলো বছর বয়সি এক আস্ত দামড়া ছেলের মা। আর সে কী সব আবোল-তাবোল ভাবছিল।

রুদ্রর কাশি আর থামছিলই না। তার ঘোলাটে ক্যাটস আই চোখ হয়ে গেল লালচে। নাক দিয়ে গড়াতে লাগল পানি। মনীষা দৌড়ে গিয়ে টিস্যুর বাক্স নিয়ে আসলো। একসাথে দশ বারোটা টিস্যু পেপার মুঠোবন্দি করে এগিয়ে দিলো রুদ্রর দিকে। মিনিট চারেক বাদে, রুদ্র একটু থিতু হলে মনীষা বলল, 'আজকে পারবেন পড়াতে? নাকি থাকবে?'

‘পারব, অবশ্যই পারব, এখন ঠিক আছি আমি।’

মনীষা একটু দ্বিধাগ্রস্থ গলায় বলল, ‘ঠিক আছে, তার আগে একটু বলে নেই, আমার ছেলের কিন্তু মাথা ভালো। তবে প্রবলেম হচ্ছে পড়াশোনা একদম করতে চায় না। আর একটু মুডি। কয়েকদিন পড়ালেই ওর ধাঁচটা বুঝে যাবেন আপনি।’

রুদ্র মরা গলায় বলল, ‘নো প্রবলেম। আপনি চিন্তা করবেন না একদম। ‘শুনে ভালো লাগল।’ মনীষা হাসল।

রাইয়ানের ঘরে এসে বসল রুদ্র। ঘরটা মাঝারি সাইজের। বিছানাপত্র সব পাট করে সাজানো। দেয়ালে একটা সোনালি কারুকাজের পুরোনো স্টাইলের ফটোফ্রেম। ছবিতে ছোটবেলার পাঁচ ছয় বছর বয়সের রাইয়ান আর তার পাশে মনীষা। মনীষা এখনো একই রকম আছে। বয়স যেন একটুও বাড়েনি!

কে বলবে দেখে যে ওই মেয়ে এত বড় এক ছেলের মা?

বুকের ভিতর জোর করে একটা নির্লিপ্ত ভাব আনার চেষ্টা করছিল রুদ্র। কিন্তু হচ্ছিল না। কেমন যেন তেতো লাগছিল চারপাশটা।

শার্টের একটা বোতাম টুপ করে ওঠে আসলো আঙুলে। মেজাজটা বিগড়ে গেল অমৃতার। আজ এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। বেলা এগারোটার মধ্যে চেম্বারে থাকার কথা তার। নতুন ক্লায়েন্ট আসবেন। স্যার থাকবেন কোর্ট রুমে তাই প্রাথমিক আলাপ আলোচনা অমৃতারই সারতে হবে। অথচ এখনই ঘড়িতে বেজে গেছে দশটা। মোহাম্মদপুর থেকে পুরান ঢাকা পৌঁছুতে কম করে হলেও ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট লেগে যাবে। লম্বা জ্যামে পড়লে তো আর কথাই নেই। এই তাড়াহুড়ার সময়টাতেই কেন বোতাম বাবাজির এমন বিদ্রোহ ঘোষণা করা লাগল? তাজ্জব ব্যাপার-স্যাপার।

সাদা শার্ট অমৃতার আরো দুটা আছে। শুধু কোর্টে পরার উদ্দেশ্যেই যেগুলো বানানো হয়েছে। অতএব এ শার্ট বদলে অন্য শার্ট পরে নিলেই আপাতত ঝামেলা চুকে যাবে। অমৃতা তাই করল। কিন্তু এই বাড়তি কাজটা করতে হচ্ছে বলে তার কপালে একটা ভাঁজ পড়ে রইল।

আজকে দীপার জন্মদিন। সে উপলক্ষে দীপার বন্ধুদের বাসায় দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। দীপার ঘোর আপত্তি ছিল প্রথমটায় কিন্তু শেষমেশ তাকে একরকম জোরজবরদস্তি করেই রাজি করিয়েছে অমৃতা। আম্মি গতরাতেই সব রান্নাবান্না সেরে ফেলেছেন। মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে আজ কলেজ থেকে ফিরবেনও একটু তাড়াতাড়ি। এত কিছুর পরেও দীপার মুখ ভার। সকাল থেকেই মুখটাকে হাঁড়ির মতো বানিয়ে ঘুরছে সে। এ মেয়ের সন্তুষ্টি অর্জন করা ভারি কঠিন ব্যাপার।

ভাবছিল অমৃতা। ঠিক সে সময় ঘরের দরজা হালকা ফাঁক করে উঁকি দিলো দীপা। বলল, ‘আপুনি, আকাশ ভাইয়া আসছে। দীপার মুখটা এখন একটু হাসি হাসি।

‘আকাশ ভাইয়া আসছে’ এ খবরটা দেওয়ার মাঝে এমন আনন্দ উপচে পড়ার কোনো কারণ খুঁজে পেল না অমৃতা। মনে মনে বিরক্ত হলো, বিড়বিড় করে নিজের মনে বলল, ‘ছেমড়ি, তোর জন্মদিনের আয়োজন করতে করতে

মইরা যাইতাছি তখন তোর আমোদ হয় না আর এখন আকাশ ভাইয়া আসার সংবাদে তুই আনন্দে ভাইসা যাইতাছোস!'

আকাশদের বাসা কাছাকাছি হওয়ায় প্রায়ই হুটহাট চলে আসে এখানটায়। এটা কোনো নতুন ঘটনা না। কিন্তু আজকে দীপার কাছ থেকে আকাশের আগমনের খবরটা পাওয়ার পর মনে হলো ঘটনা শুধু এটুকুই না। আরো কিছু আছে। দীপার খুশি ঝলমলে চেহারার দিকে তাকিয়ে অমৃতা প্রশ্ন করল, 'আর কিছু বলবি? আমি চেঞ্জ করতেছি তো এরকম হাবলার মতো তাকায় থাকলে তো সমস্যা।'

দীপা ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা দিলো। তার হাতে একটা গোলাপের তোড়া ধরা। সে আপ্লুত গলায় বলল, 'আকাশ ভাইয়া দিলো, জন্মদিনের উপহার!'

বলে হাসল দীপা। তার মুখে এ প্রাণখোলা হাসিটি অনেকক্ষণ অনুপস্থিত ছিল।

অমৃতা যেন একটু থতমত খেল। বাব্বাহ! আকাশের তো আজকাল দিন তারিখ খুব মনে থাকছে দেখা যাচ্ছে! গেল বছর এ আকাশই কি না অমৃতার জন্মদিন ভুলে বসে ছিল। কাহিনি কী? পরমুহূর্তেই নিজেকে কড়া ধমক লাগল অমৃতা। সব কিছুতে গর্ত খুঁড়ে সাপ বের করতে যাওয়ার একটা বাজে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে আজকাল তার। দীপাকে আকাশ নিজের ছোট বোনের মতোই তো দেখে! ছোটবোনের জন্মদিনের তারিখ মনে রাখাটাই স্বাভাবিক।

বসার ঘরে এসে দেখা গেল আকাশ আব্বুর সাথে কথা বলছে। অমৃতাকে দেখে বলল, 'কী উকিল সাহেবা, চললেন?'

'হুম চললাম তো, তুই এত সকাল সকাল?'

বাড়িতে ভালো লাগছিল না। ঝামেলা চলছে। আজ বিকেলে একটা ইন্টারভিউ আছে। কিছু পড়াশোনা করা দরকার, তাই ভাবলাম তোদের এখানে চলে আসি।'

'বাড়িতে কী হলো আবার?'

'কী আর হবে, ঘুম থেকে ওঠে দেখি আমার মাতাল বাবা তার বউকে বেধড়ক পেটাচ্ছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাই বের হয়ে আসলাম বাসা থেকে।'

অকপট বলে ফেলল আকাশ কথাগুলো। কোনো সংকোচ নেই, রাখঢাক নেই। শুনে আব্বু একটু অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল। বলল, 'তোমরা গল্প করো,

আমি আসছি।

অমৃতা বলল, 'না আব্বু তুমি বসো। আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এক্ষুনি বের হতে হবে। আকাশকে খাবার-দাবার কিছু দাও, তারপর সে পড়াশোনা করুক। গাধাটা নিশ্চয়ই কিছু না খেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

আকাশ মাথা নিচু করল। অর্থাৎ অমৃতার বলা কথাটা সত্য সে সকাল থেকে কিছুই খায়নি।

অমৃতা বেরিয়ে যাচ্ছিল। বেরোবার মুখে হঠাৎ চোখে পড়ল দৃশ্যটা। দীপা আকাশের একদম গা ঘেঁষে বসে আছে। হাতে মোবাইল নিয়ে কিছু একটা দেখাচ্ছে। আকাশের মুখটা দীপার হাতে ধরা মোবাইলের দিকে ঝুঁকে আছে। দীপার মুখে এখনো সে উপচে পড়া খুশি। মনটা একটু কেমন খচখচ করে উঠল। দীপার মুখের হাসিটার হালচাল ভালো ঠেকছে না। ছি, এত সংশয়? আবার নিজেকে নিজে ধমক দিলো অমৃতা।

হ্যালো রুদ্র? শোন আমার একটা জিনিস খুব দরকার, বুঝছিস?' হৃদিতার কণ্ঠে স্পষ্ট উদ্বেগ।

'কী হইছে?' রুদ্রর প্রশ্ন

'আমার একটা বয়ফ্রেন্ড দরকার, আজকেই!'

হৃদিতা আদেশ করার ভঙ্গিতে বলল। যেন বয়ফ্রেন্ড এমন একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যা বাজারে গেলেই কিনতে পাওয়া যায়।

রুদ্র মাত্র বেরিয়েছে মনীষাদের বাসা থেকে। মনের ভেতর তিতকুটে ভাবটা এখনো রয়ে গেছে। একটা রিকশা নিয়ে বাসার দিকে ফিরছিল সে। বাসা বলতে সামির বাসা। আপাতত ওটাই তার বাসস্থান। মাথার ওপরে ভর দুপুরের ঝলসানো সূর্য। ঠিকমতো চোখ মেলা যায় না সে সূর্যের তেজি আলোয়। চোখ দুটো ছোট করে কপাল কুঁচকে সে প্রায় ধমকে ওঠে বলল, 'তুমি মামা মামদোবাজি করার আর জায়গা পাওনা না? আমি তো বয়ফ্রেন্ড সাপ্লায়ার। তুমি বললা আর সাথে সাথে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে হাজির হব তোমার সামনে। বাহ!'

'আমার দরকার! আজকেই দরকার!' হৃদি কিন্তু ভীষণ সিরিয়াস ও

'মারা খা তুই, বয়ফ্রেন্ডের গুষ্টি কিলাই!' বলে রুদ্র ফোন কেটে দিলো।

মিনিটও কাটল না। আবার ফোন আসলো। ফোন রিসিভ করে হ্যালো বলার আগেই একটা আসমান-জমিন বিদীর্ণকারী চিৎকারে কান ফেটে যাবার জোগাড় হলো। হৃদি চিৎকার করছে। মনে হয় কাঁদছেও। মৃদু মৃদু কাঁপছে তার গলা।

'ওই শিম্পাঞ্জির বাচ্চা! তুই মারা খা, তোর গুষ্টি কিলাই আমি...'

'দ্যাখ যা বলবি আমাকে বল, বাপ মা তুলে গালি দিবি না।' রুদ্র গমগম করে উঠল।

'একশবার দিব, হাজারবার দিব! তোদের মতো ফ্রেন্ড থাকার চাইতে না থাকা ভালো। দূরে গিয়া মর তুই।' হৃদি এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'এই তোর ইদানীং এমন বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতো ফ্যাচফ্যাচ করে কান্নার অভ্যাস হয়েছে কেন? কান্নাকাটি করার মতো তো কিছু হয় নাই এখানে।'

‘আমার একটা বয়ফ্রেন্ড লাগবে আজকেই!’

‘আচ্ছা বাপ, আমার বাপ! কান্না থামা, আমি দেখতেছি কী করা যায়। তুই কোথায় এখন?’

‘টিএসসি। ক্লাস ছিল আমার।’

‘ওকে থাক ওইখানে, আমি আসতেছি। সময় লাগবে একটু উত্তরা থেকে আসতে। অপেক্ষা কর।’

টিএসসি গিয়ে দেখা গেল বিভাও এসেছে। ওরা এ দুপুরবেলার রোদ মাথায় নিয়ে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছে। হৃদির চোখদুটো ফোলা। রুদ্রকে দেখে সে নতুন উদ্যোগে কান্নার তোড়জোড় শুরু করল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, *আমার বয়ফ্রেন্ড লাগবে, আজকেই।’

রুদ্র দিশেহারা হয়ে বিভাকে বলল, ‘আচ্ছা কাহিনি কী কতো! সারাদিন ময়না পাখির শেখানো বুলির মতো একটা কথাই কইতে আছে বয়ফ্রেন্ড লাগবে, বয়ফ্রেন্ড লাগবে, হইছেটা কী?’

বিভা বলল, ‘রবিনের বাচ্চা কী করছে জানোস না? এ কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করে ফেলছে। আজকে কার্জন হলের সামনে হৃদিতার কাছে ধরা পড়ে গেছে। আবার হৃদির সাথে নতুন গার্লফ্রেন্ডের পরিচয়ও করায় দিছে।’

‘ও, এই কথা!’

বিভা বলল, ‘আর এ ঘটনার পর থেকে হৃদি বয়ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড করতে করতে মইরা যাইতাসে।

‘হুম বুঝলাম।’

‘এমনিতেও আমার মনে হয় ওর একটা রিবাউন্ড দরকার’ বিভা বলল।

রুদ্র মাথা চুলকে চিন্তিত গলায় বলল, ‘হুম রিবাউন্ড, কারে যে পাই!’

‘কিছু একটা কর’ বিভা বলল হৃদিতার পিঠে সান্ত্বনার হাত রেখে।

‘রিবাউন্ড হিসেবে তোর আমাকে কেমন মনে হয়?’ ফট করে বলে ফেলল রুদ্র কথাটা।

বিভা আর হৃদি দুজনে একত্রে চক্ষু চড়ক গাছ বানিয়ে তাকাল তার দিকে। হৃদির দৃষ্টি দেখে মনে হলো এক্ষুনি সে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে রুদ্রকে। রুদ্র কুঁকড়ে গিয়ে মিনমিন করে বলল, ‘না মানে আজকে আমিও একটা বাঁশ খাইলাম তো, তাই ভাবলাম আমারও একটা রিবাউন্ড টাইপ

কিছু লাগবে।

‘তোর আবার কী হয়েছে?’

রুদ্র সংক্ষেপে খুলে বলল ওদের আজ সকালের ঘটনা। মনীষার সাক্ষাৎ এবং তারপর সত্য উদঘাটন।

শুনে বিভা হো হো করে হেসে উঠল। ফোলা চোখ আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হৃদিতাও হেসে ফেলল।

‘তোরা হাসতেছিস? তোরা কি ফ্রেন্ড নাকি শত্রু?’

বিভা অনেক কষ্টে হাসি সামলে বলল, ‘একনজরে প্রেমে পড়ে গেলি আবার এক মিনিটের মাথায় ছ্যাক খাইলি, তোরা পারিসও!’

‘এজন্যই ভাবতেছিলাম আরকি হৃদিতা যদি... আই মিন আর কেউ যেহেতু আপাতত নাই আমারে দিয়া কি কাজ চালানো যাবে কি না।’ বলে রুদ্র চোরা চোখে দেখল হৃদিকে।

হৃদি হড়বড় করে বলে উঠল ‘আরে না, তুই হইলি ফ্রেন্ড, ভাইয়ের মতো’

রুদ্র খ্যাক করে ওঠে বলল, ‘তোরা মেয়েরা সবসময় সবাইরে ভাই বানানোর জন্য মুখায় থাকিস কেন? প্রবলেমটা কী?’

‘তুই আমার জন্য বয়ফ্রেন্ড জোগাড় কর, এত কথা বলিস না।’

‘কেউ তোমার রিবাউন্ড হবার জন্য বসে নাই বুঝছ? সবাই সিরিয়াস রিলেশনশিপ চায়, সিরিয়াস! এক আমিই আছি!’

বিভা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, ‘তুই তো এমনিই আছিস সবসময়, ফ্রেন্ড হিসেবেই আছিস, বয়ফ্রেন্ড হওয়া লাগবে কেন তাতো বুঝলাম না।’

‘কারণ এ মুহূর্তে ওর একটা বয়ফ্রেন্ড চাই। তাই আমি ফ্রেন্ড থেকে বয়ফ্রেন্ডে রূপান্তরিত হলাম এ ফ্রেন্ড ইন নিড, এ ফ্রেন্ড ইনডিড’ নির্বিকারভাবে কথাগুলো বলল রুদ্র।

বিভা বিরক্ত হয়ে বলল ‘এই বস্তা পচা ডায়লগটা ছাড়িস না তো! শোন আমার বাসায় পরশু রাতে ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান হবে, তোরা চলে আসিস।’

‘কীসের অনুষ্ঠান, তোর বিয়া নাকি?’

‘ওই যে কলকাতা থেকে মেহমান এসেছে না? ওদের অনারে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হবে। তার সাথে হবে গানবাজনা। অভিজিৎদা আমার নাচ দেখতে চেয়েছেন।’

‘এ অভিজিৎদার কাহিনি কীরে? হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো?’ রুদ্রর প্রশ্ন।

‘মা-বাবা মনে হয় ওর ঘাড়ে আমাকে গছাতে চাইছেন। ভাবেসাবে তাই মনে হচ্ছে। না, এমনিতে সে মানুষ ভালো। হি ইজ ফান এন্ড ডেফিনিটলি আ গুড কোম্পানি। কিন্তু ম্যারেজ মেটেরিয়াল না। মানে বিয়ে আমি ওকে করব না। বাবা মা বলে দেখুক না কিছু, মুখের ওপর না করে দেবো।’

‘সে বুঝে-শুনে চিন্তা-ভাবনা করে করিস যা করার।’ হৃদিতা বলল।

‘তোরা দুপুরে কিছু খাইছিস?’

বিভা ওঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘নারে কিছু খাইনি, চল কিছু খাওয়া যাক।

আকাশের ইন্টারভিউ খুব ভালো হয়েছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে চাকরিটা হয়ে যাবে। তার প্রতি ইন্টারভিউ বোর্ড ছিল বিস্ময়কর রকমের সন্তুষ্ট। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ক্যান্ডিডেট ছিল মাত্র তিনজন। তিনজন তিন ডিপার্টমেন্টের। অতএব বিবিএ ডিপার্টমেন্টে সে ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীই নেই। ব্যাপারটা অনেকটা ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার মতো হয়ে গেল। তবুও খুশি খুশি লাগছে তার। মনের এপার-ওপার জুড়ে অনেকদিন পর খুশির বান বইছে। সামিকে আশা করেছিল আজ সে ওখানটায়। সামি বলেছিল ওরও ইন্টারভিউর ডাক পড়েছে। কিন্তু তার দেখা তো পাওয়া গেল না। আকাশ সামির ফোনে ডায়াল করল। ফোন ধরল সামির আম্মা।

‘স্লামালিকুম আন্টি, কেমন আছেন?’

‘এইতো ভালো, তোমার কী খবর বাবা?’

‘ভালো আন্টি, সামি কোথায়?’

‘আমার বাচ্চাটাতো গোসলে গেছে বাবা, সারা দিন ঘুমিয়েছে, এই একটু আগে উঠল। এভাবে কতদিন চলবে বলতো? বলি যে একটা চাকরি-বাকরি কিছু কর, নইলে নিজের বাবার বিজনেসটা অন্তত দেখ। কিন্তু না সে ছেলে তো আমার কোনো কথাই শুনবে না।’

আকাশ কী বলবে খুঁজে পেল না। আমতা আমতা করে বলল, ‘জি আন্টি।’

‘দুদিন আগে ওর বাবা একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে মোটামুটি ওর জন্য একটা চাকরি ঠিকই করে ফেলেছিল, ওই ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হচ্ছে ওর আব্বার বন্ধু। সে চাকরিটাও সে নাকচ করে দিলো। নিজের নাম বাদ দিয়ে তোমার নামটা দিলো ঢুকিয়ে।’

কথাটা ঝাঁ করে লাগল কানে। মোবাইলটা পাঁচ আঙুল দিয়ে সাঁড়াশির মতো

চেপে ধরে সে নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'মানে? ওর নাম বাদ দিয়ে আমার নাম দিলো মানে?'

'মানে সে তার বাবাকে গিয়ে বলল, তার নাকি চাকরি করার কোনো ইচ্ছা নাই, চাকরিটা যেন তোমাকে দেয়। তা আমার কথা হলো বন্ধুদের জন্য মায়া দেখাবি খুব ভালো কথা কিন্তু নিজেরটাও তো চিন্তা করতে হবে নাকি?'

ফুরফুরে হাওয়ায় ভাসতে থাকা মনটা যেন ধুপ করে কর্দমাক্ত কাদা জলে পিছলে পড়ে গেল। খালি হয়ে গেল বুক।

কী ভাবে সামি নিজেকে? সে দাতা হাতেম তাই আর আকাশ রাস্তার ফকির? এ কথা সত্য তার মতো কোটিপতির ছেলে আকাশ নয়। কিন্তু তাই বলে ভিখিরির মতো সামির আব্বার কাছে চাকরি ভিক্ষা চাওয়ার মতো দুরবস্থা তো তার হয়নি। সামির কোনো অধিকার নেই কোনো তৃতীয়পক্ষের কাছে আকাশকে এভাবে ছোট করার।

একটা অন্ধ, বোবা রাগ ঝাঁঝাঁ করে সারা শরীরে জ্বলুনি ধরিয়ে দিলো।

'ঠিক আছে আন্টি, আমি রাখি' বলে ফোন কেটে দিলো সে।

'সাজনি সাজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া'

বিভা নাচছে। একটি সবুজ কাতান শাড়ি তার পরনে। খোঁপায় জড়ানো রজনীগন্ধা ফুল। তার প্রতিমার মতো টানা চোখে গাঢ় কালো কাজল। কপালে বড় টিপ। সরু কোমরে একটি সোনালি বিছা। সিডি প্লেয়ারে বাজছে ভানুসিংহের পদাবলি।

'তৃষিত নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জপথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া'

বিভাদের লম্বাটে লিভিং রুমটায় কমপক্ষে জনাবিশেক মানুষ। বেশিরভাগই আত্মীয়স্বজন। সোফা, চেয়ার এবং কার্পেট মিলিয়ে গাদাগাদি করে বসেছে সবাই। লিভিংরুমের সাথেই একটা লাগোয়া চৌকো বারান্দা। বারান্দার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিভার চার বন্ধু। অমৃতা, সামি, রুদ্র আর হৃদিতা। এ জায়গা থেকে বিভাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিভা চমৎকার বাতাস কেটে, হাওয়ায় উড়ে নাচছে। তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। তার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম রুপোর মতো ঝিলিক দিচ্ছে। দর্শকের সারিতে অভিজিৎকে দেখা যাচ্ছে। চশমার ফ্রেমের আড়ালে থাকা চোখদুটোয় তার মুগ্ধতা আঁকা।

সামি হঠাৎ বিরক্ত গলায় বলে উঠল, 'আমি বুঝলাম না, এরকম জবরজং সাজ সেজে, ধেই ধেই করে একগাদা লোকের সামনে নাইচা বেড়ানোর অর্থটা কী?

অমৃতা সামির পেটে একটা গুঁতা দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আস্তে বল শুনবে

কেউ! '

'শুনলে আমার কী?'

'বিভাদের ফ্যামিলি অনেক সংস্ক...তিমনা। এটাতো জানিসই, এত অবাক হওয়ার তো কিছু নেই, আর গতবছর দুর্গাপূজাতেও বিভা নেচেছিল। সেবার ওদের বাড়ির ছাদে হয়েছিল অনুষ্ঠান। মনে নেই?' হৃদি বলল।

সামি হৃদির কথা পাত্তা না দিয়ে অভিজিতের দিকে ইশারা করে বলল, 'দ্যাখ না, ওই বোকাচোদাটা ক্যামনে তাকায় আছে। মনে হচ্ছে মুগ্ধতার ঠ্যালায় এখনই ফিট হয়ে যাবে।'

অমৃতা ধমক দিয়ে বলল, 'শুধু শুধু একটা ভালো মানুষকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করিস না তো! ছেলেটা তোর কী ক্ষতি করেছে?'

'আহা যা ভালো! ভালোর অত্যাচারে মরে যাচ্ছি!' সামি বলল চোখে মুখে একটা অদ্ভুত মুদ্রা ফুটিয়ে তুলে।

বিভার নাচ শেষ হয়েছে। হাততালি পড়ছে খুব। নাচ শেষ করেই সে প্রথমে ছুটে আসলো বন্ধুদের কাছে। সামি বিভাকে দেখামাত্র অন্যদিকে তাকিয়ে সুর করে গাওয়া শুরু করল, 'আলিফ ল্যায়লা, আলিফ ল্যায়লা, আলিফ ল্যায় লা'

বিভা ফোঁস করে ওঠে বলল, 'তোদের এসব লুলামি আর ভাল্লাগে না বুঝছস? নতুন কিছু কর। এসব ফালতু জোক করা বন্ধ কর। এসবের ভাত নাই আর।'

রুদ্র আঁকুপাঁকু হয়ে বলে উঠল, 'দোস্ত প্লিজ লাগে মুখটা ধুইয়া আয়, আর এই অদ্ভুত সাজসজ্জা পাল্টায় আয়।

'অদ্ভুত হবে কেন? তুই জানিস অভিজিৎদা আমাকে কী বলেছে? বলেছে এ সাজে আমাকে পুরাই উর্বশী লাগছে।'

শুনে সামি খিকখিক করে ডাকাতের মতো হাসল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আকাশ হাজির হলো ওখানটায়। আকাশের মুখে সবসময় লেগে থাকা এক চিলতে হাসিটা গায়েব। চোখ জোড়ায় ভর করেছে ভয়াবহ বিষণ্নতা। সে এসেই সামির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'এই সামি তোর সাথে আমার একটু কথা আছে, বাইরে আয় তো!'

বিভা কলকল করে বলে উঠল, 'দোস্ত তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি? আমার নাচটা মিস করলি তো!'

আকাশ বিভার কথা পাত্তা দিলো না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সামির দিকে

স্থির দৃষ্টি দিয়ে।

সামি বলল, 'কী এত জরুরি কথা, আইলি মাত্র, জিরা একটু, চা টা খা, তারপর নাহয় বাইরে যামু।'

'এত কথা কস কেন? যা বলি তা করতে পারোস না?'

বোঝা গেল আকাশের মুড ভালো নেই। বন্ধুরা সব একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল।

সামি একনজর আকাশকে ভালো মতো দেখে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা চল, যাইতাছি, চ্যাতোস ক্যান?'

ওরা ছাদে ওঠে আসল। এগারোতলার ছাদে তখন সন্ধ্যে নেমেছে। আকাশে জ্বলছে একটা দুটা নীল নক্ষত্র।

ছাদে এসে সামির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আকাশ কঠিনভাবে বলল, 'তুই নিজেরে কী ভাবিস?

'মানে?' সামি অবাক। বাকি পাঁচজনও অবাক।

'তোর কাছে কি আমি চাকরি ভিক্ষা চাইছিলাম?'

সামির মুখে একটা গাঢ় ছায়া পড়ল কথাটা শোনা মাত্র। বাবাকে খুব ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিল সে, আকাশ যেন কোনোভাবেই জানতে না পারে যে চাকরিটা সামির রেফারেন্সে পাওয়া। বাবা তার কাছে প্রমিজও করেছিল ব্যাপারটা নিয়ে, ফ্যাকাল্টিকেও জানানো আছে যে সামির আব্বা বিষয়ক কোনো প্রসঙ্গ যেন ইন্টারভিউতে তোলা না হয়। এত কিছুর পরেও আকাশ কী করে টের পেয়ে গেল কথাটা?

সামি আমতা আমতা করে বলল, 'কী বলছিস বুঝতে পারলাম না।'

'ঢং করিস না, সবই বুঝতে পারছিস তুই। নিজের পাওয়া চাকরিটা আমার জন্য স্যাক্রিফাইস করে খুব মহান হইতে চাইছিলি না? এটার দ্বারা কী প্রমাণ করলি তুই? যে আমি একটা ছাপোষা চাকরিও তোর বাপের সাহায্য ছাড়া আন করতে পারব না?' আকাশের গলার আওয়াজ বেড়ে গেল।

বলতে কী বন্ধুমহলে সামির আব্বা-আম্মার খুব একটা সুনাম নেই। দুজনেই প্রচণ্ড নাক উঁচু এবং অহংকারী। সামিদের ডেইরি মিল্কের ফার্ম আছে। দুটা আইক্রিম ফ্যাক্টরি আছে। যেগুলো কি না দেশের প্রথম সারির স্থান দখল করে বসে আছে। উপরন্তু সামির আব্বা বর্তমানে সংসদ সদস্য। অতএব দাপটের মাত্রা এখন আকাশচুম্বী। একমাত্র পুত্রের বন্ধুদের তিনি যে খুব একটা সুনজরে

দেখেন না তা তাঁর আচার-আচরণে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

তাই সামি তার আব্বার কাছে আকাশের চাকরির সুপারিশ করেছে শুনে সবাই ভেতরে ভেতরে একটু ক্ষেপে গেল।

সামি চোখ দুটো মেঝেতে নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। নির্বাক, নিথর।

আকাশ বলে চলল, 'তোর কোনো রাইট নাই আমাকে এভাবে ছোট করার। করব না আমি এই বালের চাকরি। বইলা দিস তোর বাপেরে। তার দয়া আকাশের লাগব না।'

'দোস্ত আব্বার তো এখানে কোনো ভূমিকা নাই। আমিই করেছি যা করার।'

'উদ্ধার করছ বস তুমি আমারে, উদ্ধার করছ।'

'দ্যাখ আমার মনে হচ্ছিল চাকরিটা তোর দরকার। তাই...'

আকাশ শ্লেষের হাসি হাসল, 'তাই তুমি আমার পারমিশন না নিয়েই আমারে ভিক্ষুক বানায় দিলা। লিসেন সামি, আজকে তোরে একটা কথা বলি শুনে রাখ, তোর আব্বা আমাকে কী মনে করে জানিস? তোর আব্বা আমাকে মনে করে আমি একটা রাস্তার ফকির। উনার ধারণা আমি একটা বস্তির ছেলে। তাই দয়া করে তুমি উনার কাছে আমার জন্য কোনো সুপারিশ করতে যেয়ো না। প্লিজ!'

সামির মুখটা হঠাৎ একটা অদ্ভুত বিষণ্নতায় ভরে গেল।

'কী বলিস এগুলো, আব্বা তোরে বস্তির ছেলে ভাববে কেন? আজব!'

'ভাইরে, ঠিক আছে আমি আজব, সব দোষ আমার। তোমার এ দয়ার চাকরি আমার লাগবে না। আমি না খেয়ে থাকতে রাজি আছি, কিন্তু কারো দয়ার পাত্র হয়ে বাঁচতে রাজি না।'

'ড্যুড! এ জবটা হাতছাড়া করিস না। অনেক কাহিনি করতে হয়েছে তোকে চাকরিটা পাওয়ানোর জন্য।'

'তামাশা করো তুমি আমার লগে?।'

এরপর সামিরও গলা চড়ে গেল। বাকি বন্ধুরা ওদের ঝগড়া থামাতে ওঠেপড়ে লাগল।

খুব ভোরে সামি নিজের বাবার ঘরে প্রবেশ করল। গত রাতে প্রায় দুটা পর্যন্ত সে তার বাবার জন্য অপেক্ষা করেছে। বাবা বাইরে থেকে ফিরেছেন আরো গভীর রাতে। সামির তখন একটু ঘুমঘুম ভাব এসে গিয়েছিল।

হক সাহেবের ঘরে এয়ারকন্ডিশন চলছে। চৈত্র মাসের শেষের দিক। গরম পড়া শুরু হয়ে গেছে এর মাঝেই। তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন ফজরের নামাজ

আদায়ের উদ্যেশ্যে। নামাজ পড়া শেষ, এখন জায়নামাজে বসে তসবিহ পড়ছেন।

তাঁর স্ত্রী ঘুমোচ্ছে নাক ডেকে বিছানায়। ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি ইশারা দিয়ে বললেন সোফার ওপর বসতে। সামি বসল। হক সাহেব তসবিহ পড়া শেষ করলেন, মোনাজাত করলেন। তারপর জায়নামাজ গুটিয়ে নিতে নিতে প্রশ্ন করলেন, 'রাতে ঘুমাওনি?'

সামি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো, 'না'

'কেন? সব ঠিক আছে?'

'কিছুই ঠিক নেই আব্বা!' সামির কথাটা প্রায় আর্তনাদের মতো শোনাল।

'কী হয়েছে?' চকিতে প্রশ্ন করলেন হক সাহেব।

'আব্বা আমি তো তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তাই না যে আকাশের চাকরিটা যে তোমার রেফারেন্সে হচ্ছে এটা যেন ও জানতে না পারে?'

'জানার কথাও না!'

'কিন্তু জেনে গেছে যে!'

'কে বলল?'

'তা তো জানি না!'

'প্রশ্ন করোনি?'

'না প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি, ও অনেক রেগে ছিল।'

'এত রাগার মতো তো কিছু হয়নি, চাকরি পেয়ে গেছে এটাই কি যথেষ্ট নয়?

'না আব্বা এটা যথেষ্ট নয়, ওর ইগো অনেক বেশি, এজন্য আমি তোমারে বলছিলাম ব্যাপারটা চাপায় যাইতে।'

'আমার জানা মতে ফ্যাকাল্টির কেউ এ প্রসঙ্গে তোমার বন্ধুর সাথে কোনো কথা বলেনি। সে জানল কী করে এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার কিন্তু তার চাইতেও বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হলো ঘটনাটিতে তোমার বন্ধুর প্রতিক্রিয়া। আজকাল জবটব এসব কোনো রেফারেন্স ছাড়া হয় নাকি? এ তো তার সাত জন্মের ভাগ্য যে এত বড় একটা রেফারেন্স পেয়ে গেছে সে। তার তো খুশি হয়ে তোমাকে কোলে নিয়ে লাফানোর কথা, তা না করে সে তোমার ওপর উল্টো রেগে গেছে। এটা তো অভাবনীয়!'

সামি অস্থির হয়ে বলল, 'উফ আব্বা! তুমি ব্যাপারটা বুঝবে না, ইটস কমপ্লিকেটেড।'

'বোঝাবোঝির দরকার নাই আমার, নিজের মুখ খরচ করেছি, অতএব আমার মুখের কথার যেন দাম থাকে। আমার কথামতো ওরা দুবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে, প্রথমে তোমার নাম দেওয়া হয়েছিল, এর পর তোমার নামের পরিবর্তে তোমার বন্ধুর নাম দেওয়া হয়েছে, আর কোনো রদবদল যেন না হয়।'

সামি ঢোঁক গিলল। কী করে বলবে আব্বাকে যে আকাশ অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে চাকরিটা না করার? আব্বাকে তো সে আকাশের সাইকোলজি এখন বোঝাতে পারবে না।

সামি ওঠে দাঁড়াল।

হক সাহেব বললেন, 'তুমি এবারে একটু নিজের কথা ভাবো, বন্ধু বন্ধু করে তো জীবনটা শেষ করে দিলে।'

'হুম' অন্যমনস্কভাবে বলল সামি।

'ফ্রেন্ড সার্কেলটা একটু বদলালে তো পার'।

'মানে?'

'মানে তুমি যাদের সাথে মেলামেশা করো, এরা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে। এদের কারোরই তোমার স্ট্যাটাস বরাবর চলার মতো কোনো যোগ্যতা নেই।'

ঝাঁ করে তীরের মতো লাগল কথাটা একদম বুকে গিয়ে। সামি ব্যথাতুর নয়নে আব্বার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হঠাৎ এ কথা?'

'হঠাৎ নয়, অনেকদিন ধরেই ভাবছি কথাটা তোমাকে বলব, পুরো দলটাকে তো বলতে গেলে তুমি লালন-পালন করছ, এদের কি বাবা মা অথবা পরিবার বলে কিছু নেই? গেল মাসে কক্সবাজারে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে আসলে। ঘটনাটা আমার কাছ থেকে লুকিয়েছ তুমি কিন্তু আমার কানে সব খবরই আসে। আরেক বাউণ্ডুলে তো এখানে পার্মানেন্ট বসতি গেঁড়ে বসেছে। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর সারাদিন হইহই করে কীসব গান গায়। এসব হচ্ছেটা কী? বলি তোমার কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই? দয়া করে ফ্রেন্ড সার্কেলটা একটু চেঞ্জ করো।'

সামি যেন আকস্মিক এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে গেল। তার মুখটা একটু হাঁ হলো ঠিক কিন্তু কোনো শব্দ বেরোল না। মিনিট দুয়েক আব্বার সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে ঘরটা ছাড়ল।

বাইরে তখন আধফোটা ভোর। আব্বার ঘর থেকে বেরোতেই করিডরের

বাম পাশে ঝুল বারান্দা। সামি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হাওয়া পবিত্র। চাল ধোয়া ঘোলা পানির মতো একটা ঝাপসা আলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

ফ্রেন্ড সার্কেল কি বদলানোর মতো কোনো জিনিস? এ যেন গায়ে পরা জামা জুতো, যখন ইচ্ছে পাল্টানো যায়। এইবন্ধুগুলো ছাড়া সামির আর কী আছে এ জীবনে? এ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন তো কখনো চায়নি সে। কী চেয়েছিল জীবনের কাছে?

আজ এ আধফোটা ভোরের বিবাগী আলোয় সামির মনে হঠাৎ প্রশ্নটির উদয় হলো।

কী চেয়েছিল সে জীবনের কাছে?

কী চেয়েছিল?

কী পেয়েছে?

আর কী পায়নি?

না পাওয়া বলতে কোনো শব্দ যে তার ডিকশনারিতে নেই। না চাইতেই সিন্দবাদের ভূতের মতো ভাগ্য তার সামনে সমস্ত কিছু হাজির করে দিয়েছে। চাওয়া আর পাওয়া এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্যটাই যে ধরতে পারল না সে আজ অবধি।

ঠিক সে সময় পকেটে থাকা মোবাইলটা বিপবিপ করে শব্দ করল। ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটল।

বিভা টেক্সট করেছে, 'অভিজিৎদার বাবা-মা আসছেন কলকাতা থেকে বিয়ের কথা পাকা করতে, কালকে ফ্রি থাকলে মিট করিস।'

'আমি বিয়ে করব না, পালিয়ে যাব।' দৃঢ় গলায় বলল বিভা।

'পালাবি মানে? কার সাথে পালাবি?' অমৃতা অবাক।

বিভা অমৃতার প্রশ্ন শুনে নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কয়েক সেকেন্ডের জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। তারপর বিষণ্ন গলায় উত্তর দিলো 'সেটাই ভাবতেছি, কার সাথে যে পালানো যায়! একটা সাজেশন দে তো!'

রুদ্রর মুখে কাঁচা মরিচ সমেত আস্ত একটা ফুচকা ছিল। বিভার কথা শুনে তার চক্ষুদুটো গোল মার্বেলের মতো হয়ে গেল। ক্যাটস আই চোখের মণি দুটো মনে হলো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। সে ফুচকা চিবোতে চিবোতে মুখ দিয়ে অদ্ভুত কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে কিছু বলতে চাইল।

কেউ তার কথার আগামাথা কিছুই বুঝল না। বিভা বিরক্তি নিয়ে বলল, 'কী বলতে চাস ঠিকমতো বল, মুখের খাবার গিলে নিয়ে তারপর বল।'

রুদ্র বিভার কথামতো খাবার গিলল। কিন্তু ততক্ষণে কাঁচামরিচে কামড় পড়ে তার জিবে আগুন ধরে গেছে। সে পড়িমরি করে ওঠে ঠাণ্ডা সোডা কিনতে দৌড় দিলো। বিভা রুদ্রর সে দৌড় দেখে তিক্ততার গলায় বলল, 'দিন দিন রুদ্রটা কেমন জোকার হয়ে যাচ্ছে!'

শেষ বিকেলের মরা আলো মাথায় নিয়ে সামির লাল মার্সিডিজবেঞ্চ টিএসসি চত্বরে এসে থামল। ঠিক একই সময় একটা ছাই রঙা ফুলহাতা শার্ট পরে আকাশকেও নামতে দেখা গেল রিকশা থেকে।

সামি গাড়ি পার্ক করছিল। আকাশই আগে এসে পৌঁছল। হৃদি আর অমৃতা ফুটপাতের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বিভা বসে আছে ফুতপাতের ওপর পেপার বিছিয়ে। তার হাতে চায়ের কাপ। আকাশ এসে প্রশ্ন করল, 'আপডেট কী?'

বিভা ঝটপট উত্তর দিলো, 'আমি পালাচ্ছি।'

'কার সাথে?'

'তোর সাথে, পালাবি দোস্ত আমার সাথে?'

'দূর বাল, আজাইরা কথা ছাড়, কামের কথা ক'

'কামের কথাই তো কইলাম। পালায়া যামু।'

আকাশ মুখ গোঁজ করে চুপ করে গেল। বোঝা গেল কথাটা তার খুব একটা পছন্দ হয়নি।

'তোর বিয়ে কবে? সব ঠিকঠাক?' মুখ গোঁজ করেই প্রশ্ন করল আবার।

'আগামী সপ্তাহে।'

'কেন, এত হুড়াহুড়ি লাগাইছে কেন তোর বাপ-মা?'

'আমি কেমনে কমু, আমি কি ওদের মনের ভিতর ঢুকছি?'

রুদ্র ফিরে এসেছে হাতে একটা ঠাণ্ডা ফান্টার ক্যান হাতে নিয়ে। ঝাল মুখে তখনও হু হা করে যাচ্ছে। সামিও পৌঁছে গেল মিনিট দুয়েকের মধ্যেই। সামির চোখজোড়া লাল। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। দেখেই বোঝা গেল এ ছেলে সারারাত ঘুমায়নি।

সামি এসে দাঁড়াতেই আকাশের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুহূর্তে কোত্থেকে যেন একটা অস্বস্তি এসে জায়গা করে নিল দুজনের মাঝে। আকাশ চোখ সরিয়ে নিল।

'কী অবস্থা?'

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো সামি দলের সবাইকে উদ্দেশ্য করে।

অমৃতা বলল, 'বিভাবরীর তো বিয়ে, জানিস নাকি?'

'হুম শুনলাম, হঠাৎ বিয়ে কেন?' সামির প্রশ্নটা একটু ঝাঁঝওয়ালা হয়ে গেল।

হৃদি রাশভারি গলায় উত্তর দিলো, 'মেয়ের বিয়ের বয়স হইছে, তাই।'

সামি গলায় সে ঝাঁঝওয়ালা ভাবটা বজায় রেখেই বলল, 'ওই বোকাচোদাটাকে প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম যে কোনো বদ মতলব আছে। আমার সন্দেহই সত্য হলো।'

রুদ্রর মুখে তখন জ্বালাপোড়া একটু কমেছে। সে বলল, 'বিয়ে তো একদিন না একদিন করতেই হবে। অভিজিৎকে করতে দোষ কোথায়?'

কথাটা পুরোপুরি শেষ হতে না হতেই অমৃতা বলে উঠল, 'ইয়েস আমারও এটাই কথা, অভিজিৎদাকে আমাদের সবার পছন্দ হয়েছে। পাত্র হিসেবে ফার্স্টক্লাস।'

আকাশ কোনো মতামতো দিচ্ছিল না বলে অমৃতা আকাশের মাথায় একটা

গাট্টা মেরে দলভারী করার উদ্যেশ্যে বলল, 'কী বলিস?'

আকাশও মাথা নেড়ে সায় দিলো, বলল, 'কথা ঠিক, বিয়ে যদি করতেই হয় তো অভিজিৎকে নয় কেন? সে ভালো ছেলে।'

অমৃতা বিশ্বজয়ের হাসি হেসে এবারে সামিকেও দলে টানার চেষ্টা করল। 'সামি কী বলিস? অভিজিৎকে কি খারাপ ছেলে মনে হয়েছে তোর?'

সামির চোখে দোটানার ছাপ পড়ল। চুপ করে রইল কিছুটাক্ষণ। বিভার দিকে তাকাল। বিভার চোখদুটো একটু কেমন টলমল করছে। মনে হচ্ছে টোকা দিলে এক্ষুনি জল গড়িয়ে পড়বে। সামি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ঢোক গিলে চেপে নিয়ে বলল, 'না, খারাপ হবে কেন? অভিজিৎ ছেলে ভালোই। তোর বিয়ে করার ইচ্ছে থাকলে করে ফ্যাল না, এত তামাশার কী আছে?'

বিভা ম্যাচের কাঠির মতো ভস করে জ্বলে উঠল, 'ওহ তামাশা মনে হচ্ছে তোদের কাছে তাই না? ঠিক আছে, করব আমি এ বিয়ে। খুশি তোরা?'

'দোস্ত দ্যাখ, আমরা তোর ভালো চাই, এরকম একটা প্রপোজাল কোনো কারণ ছাড়া নাকচ করে দেওয়াটা ভীষণ ভুল হবে।' হৃদি বলল।

'আ! জ্ঞান দিতে আসিস না তো!' বিভা বলল বিরক্তিতে। তারপর চায়ের কাপটা ফুটপাতের ওপর রেখে দিয়েই ওঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবহেলায় বলল, 'আমি যাই।'

'আরে বয় না, এখনই যাবি কেন? মাত্র তো আসলি।' রুদ্র বলে উঠল

বিভার কানে বোধহয় কথাটা পৌঁছল না। হনহন করে হাঁটতে লাগল। সামি হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে প্রায় দৌড়ে এসে বিভার হাতটা পেছন থেকে ধরে ফেলল, রগচটা গলায় বলল, 'তুই যাইতাছিস কই? কথা তো শেষ হয় নাই!'

বিভা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'হাত ছাড়, আমার আর কোনো কথা নাই, কথা শেষ। তোদের যা বলার বলে দিয়েছিস।'

'দ্যাখ মেজাজ মর্জি এমনিতেই ভালো না, ঠিক আছে? এসব নকরামি বাদ দে এখন। তোর যদি বিয়ে করতে ইচ্ছে না করে তাহলে বাসায় বলে দে যে বিয়ে এখন তুই করবি না।'

হৃদিতা হঠাৎ ওদের মাঝখানে এসে সামিকে প্রায় ধমকে বলে উঠল, 'কেন করবে না বিয়ে? পরে যদি এত ভালো প্রস্তাব আর না আসে? তখন কী হবে? বিয়ের বাজারটা আজকাল কত চড়া তুই জানিস? আর তাছাড়া ওর ফ্যামিলির মানুষজনের কথাও তো ওর চিন্তা করতে হবে তাই না?'

সামি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এতই যদি ভালো প্রস্তাব হয় তো তুই কর না ওই শালারে বিয়া, ওরে কেন ঝুলাইতে চাইতেছিস?'

হৃদি আহত গলায় বলে উঠল, 'সামি তুই কিন্তু ভীষণ অসভ্যের মতো কথা বলছিস।'

'অসভ্যের মতো কথা বলছিস তুই, ভবিষ্যতে ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসবে না বলে এখন চোখ কান বন্ধ করে যাকে ভালো লাগে না তাকে বিয়ে করে ফেলতে হবে। এটা কেমন কথা?'

'ভালো তো একদিনে লাগবে না, ধীরে ধীরে ভালো লাগা তৈরি হবে। তুই জানিস বিভার বাবা-মা ওর বিয়ে নিয়ে কী ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে? অভিজিতের সাথে ওর গোত্র মিলে গেছে, কুণ্ডলী মিলে গেছে, এ সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেলে পরে আবার এসব হিসাব মিলাতে অনেক হিমশিম খেতে হবে। পরবর্তীতে যদি এমন প্রস্তাব আর না আসে তখন কে বিয়ে করবে ওকে? তুই করবি?'

হৃদিতার প্রলম্বিত বকবকানির শেষে ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্নটা সামিকে নাড়া দিয়ে গেল। সে চকিতে তাকাল বিভার দিকে।

'করব, আমিই করব বিভাকে বিয়ে, কোনো সমস্যা?'

ভীষণ চমকে উঠল বিভা। অস্ফুটে মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো শব্দটা, 'ছি সামি!'

কয়েকটা মুহূর্ত বিস্ময়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। সামিকে কেমন পাগল পাগল দেখাতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি স্থির নেই। নিশ্বাস নেই স্বাভাবিক।

এক সময় হৃদি বিস্ময় চাপা দিয়ে চাটুকারিতার গলায় বলে উঠল, 'আমি জানতাম, আমি জানতাম যে তোর মনের ভেতরে এসব বদ চিন্তা চলতেছে। এ জন্যেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম। ধরা পড়েই গেলি শেষ পর্যন্ত।'

সামি কিন্তু একটুও বিব্রত হলো না, বরং ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'বেশ তো, তোর কৌশল সফল হয়েছে, কুডোস টু ইউ।'

বিভা চোখ দুটো নিচের দিকে নামিয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সামি ওর দিকে চোখাভাবে তাকিয়ে অকপট বলল, 'চুপ করে আছিস কেন? আমাকে বিয়ে করতে তোর আপত্তি আছে?'

বিভা বিব্রত হয়ে পড়ল, 'আহ সামি! কী পাগলামো করছিস?'

ছয়জনের দলটা গোল হয়ে ফুটপাত দখল করে দাঁড়িয়ে ছিল। পথচারীরা

কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। বিশেষ করে চায়ের দোকানদার মামার বিস্ময় এবং উত্তেজনা দুটোই উপচে পড়ছে। প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল এ দলটাকে সে পর্যবেক্ষণ করে আসছে। সে মোটামুটি আঁচ করতে পারে যে এদের বন্ধুত্ব ষোলো আনা খাঁটি। কিন্তু তলে তলে যে জল এতদূর গড়িয়ে গেছে তা তার চিন্তার বাইরে ছিল।

অমৃতা একটু অস্বস্তি নিয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা থাক, এখন এসব প্রসঙ্গ থাক, চল কোথাও বসি। আমার বাসায় চল, তারপর কথা বলা যাবে।'

সামি আগুন গলায় বলল, 'কেন এখানে প্রবলেম কী হইতেছে? তোরা শালা সব কিছুতে এত পেজগি লাগাস ক্যান? একটা সিরিয়াস কথা বলতেছি, এর মধ্যে ঘ্যানর ঘ্যানর।

অমৃতা ভারি অবাক হয়ে চাইল সামির দিকে। এ সামিকে যেন সে চেনে না। এ ছন্নছাড়া, অভদ্র আর বেহেড জেদি ছেলেটা যে তার বন্ধু এটা তার এ মুহূর্তে বিশ্বাস করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

রুদ্র বলল, 'আচ্ছা শোন, মাথা গরম করিস না। বিভা কাকে বিয়ে করবে এটা সে বাসায় গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুক। এখন হুট করে তো কোনো ডিসিশন নেওয়ার প্রয়োজন নেই।'

আকাশ কিছু না বলে চুপচাপ শুনছিল। সামির সাথে চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে বাগবিতণ্ডা হওয়ার পর থেকে আর ঠিকমতো কথা হয়নি বললেই চলে।

ভেবেছিল আজকে একটা বোঝাপড়া করে নেবে। কিন্তু এ ছেলের তো মাথায় আগ্নেয়গিরি ফুটছে। কোনো স্বাভাবিক কথা আজ এর সাথে বলা যাবে বলে মনে হয় না।

সামি কেটে কেটে বলল, 'বিভা উত্তরটা আমার চাই!'

'সামি, তুই পাগল!' বলে বিভা সেকেন্ড না গড়াতেই ঘুরে দাঁড়াল। প্রায় দৌড়ে পার হয়ে গেল ঘিঞ্জি রাস্তাটা। নিমেষে অদৃশ্য হলো আসন্ন সন্ধ্যার বাদামি রঙের আলোর মাঝে, হরেক লোকের ভিড়ে। বোধহয় একটা রিকশাও পেয়ে গেল চট করে।

সামি অপলক তাকিয়ে ছিল বিভার ওই চলে যাওয়া পথটার দিকে। ঠিক সে সময় একটা অফ হোয়াইট কালারের সুতির ফতুয়া পরা ছিপছিপে মেয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, হাই হিল জুতোর ঠুক ঠুক আওয়াজ করে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে আসছিল। ওরা পাঁচজন ফুটপাতের অনেকখানি দখল করে দাঁড়িয়ে ছিল।

মেয়েটা জায়গা না পেয়ে বিনীত গলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এক্সকিউজ মি, একটু জায়গা দেবেন?’

আকাশ মেয়েটার নরম গলার মিনতি শুনে গলে গিয়ে বলল, ‘শিওর!’

মেয়েটা আকাশের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। রুদ্র একটা শিস বাজিয়ে ফেলল অভ্যাসবশত। মেয়েটা হেঁটে একটু দূরে যেতেই আকাশের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, ‘ভালো ছিল মামা! যেই হাসিটা দিলো! উফ!’

আকাশের মুখে এফোঁড়-ওফোঁড় হাসি ফুটল।

সামি ওদের দিকে প্রচণ্ড ঘেন্নার চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। শীতল গলায় বলল, ‘চললাম’।

রিকশায় ওঠে হুড তুলে দিয়েছিল বিভা। নীলক্ষেতের মোড়ে রাজ্যের সব গাড়িঘোড়া এসে জড়ো হয়েছে। কালো বিষাক্ত ধোঁয়া সন্ধ্যের মায়াবী বাদামি রংটাকে ছাইবর্ণ করে তুলছে। বাতাস নেই একফোঁটা।

বিভা কিন্তু এ যানজটের কোলাহলময় শহর থেকে একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল। মন নামের টাইম মেশিনে পা দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল বছর সাতেক আগের এক ঝুম গ্রীষ্মের দুপুরে।

২০১০ সালের মে মাস ছিল ওটা। কলেজের নবীন বরণ। গ্রীষ্মের কড়া দাবদাহকে তোয়াক্কা না করে বাসন্তী রঙের একটা শাড়ি পরেছিল সে। নেচেছিল তার প্রিয় গানে, ‘সজনি সজনি রাধিকা লো, দেখ আবহ চাহিয়া।’

নাচের পর স্টেজ থেকে নামার মুখে আকাশের সাথে দেখা। তখন ওরা তিন বান্ধবী আকাশ বলতে অজ্ঞান ছিল। আকাশের পাশে হ্যাংলা পাতলা গৌর বর্ণ এক ছেলে দাঁড়ানো। মাথা ভর্তি একরাশ কোঁকড়া কালো চুল। ঠোঁট দুটো ওই বয়সেই সিগারেট খেয়ে কালো কিন্তু একটু কেমন আদুরে ছাপ আছে ওই ঠোঁটে আকাশ বিভাকে বলল, ‘এ আমার বন্ধু সামি, আমার ছোটবেলার ফ্রেন্ড। তোমার নাচ দেখে মুগ্ধ। কথা বলতে চায় তোমার সাথে।’

বিভা সামির দিকে তাকিয়ে ছোট করে বলল, ‘হ্যালো আমি বিভা, বিভাবরী।’

সামি নামটা শুনে ফট করে বলে বসল, ‘বিভাবরী? তোমরা কি হিন্দু?’

‘হ্যাঁ, আমরা হিন্দু।’

‘শিট!’ আফসোসে শব্দটা আওড়ালো সামি।

‘কেন? এত আফসোস কেন?’

সামি নির্বিকারে বলল, 'ভাবছিলাম প্রপোজ করব তোমাকে, পছন্দ হয়েছিল, আরেকটু হলেই প্রেমে পড়ে যেতাম। ভাগ্যিস পড়িনি! হিন্দু মেয়ের সাথে বাপ-মা বিয়ে দিবে না।'

বিভা ভীষণ অবাক হয়েছিল ছেলেটার অকপট স্বীকারোক্তি দেখে। ওইটুকু বয়সের কোনো ছেলে যে অত সাহসী হতে পারে তা ভাবাই যায় না। পরমুহূর্তেই সামি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'প্রেম না হয় নাই করলাম, বন্ধু তো হতে পারি?'

বিভা হাত মিলিয়েছিল। সেই ছিল প্রথম দেখা। কী সাধারণ ছিল শুরুটা সাধারণ অথচ কী নিদারুণ গভীর। এরপর দিনকে দিন সম্পর্কগুলো কত কাছের হয়ে গেল। বন্ধু কী করে হতে হয় বিভা তা জানে। ওর মনের ভেতর একটা বিশাল বড় ফাঁকা উদ্যান আছে। সে উদ্যানটা শুধু বন্ধুদের নামেই হিবা করা। বিভা মরে গেলেও সে উদ্যানটা ওর বন্ধুদেরই থাকবে। মনের মতো বন্ধু পেয়েছিল ভাগ্যিস এ জনমে। নইলে ওই ফাঁকা উদ্যানটা মনে হয় আজীবন ফাঁকাই থাকত। বন্ধুত্ব আর প্রেম যেন একই মোহনায় মিলিত দুটি নদীর নাম। যেকোনো সময় একজন আরেকজনের সাথে মিশে গিয়ে নিজ অস্তিত্ব বিলীন করতে পারে। তাই বুঝি সে গ্রীষ্মের দুপুরে বাড়ি ফেরার পর বিভা ওর ডাইরিতে লেখেছিল,

'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ!'

টিএসসি থেকে একটা সিএনজি নিয়ে সোজা সামির বাসায় চলে এসেছে রুদ্র আর আকাশ। কিন্তু সামি লাপাত্তা। বেডরুমের দরজা আটকে ঘরবন্দি হয়ে আছে সে প্রায় আধাঘণ্টা ধরে।

আকাশ বলল, 'আমাকে একটু সামির সাথে কথা বলায় দে, ওইদিন ঝগড়া করার পরে তো আর কথা হয় নাই ওর সাথে।'

রুদ্র বলল, 'আমি কথা বলাব ক্যামনে? তোমরা কি ন্যাদা বাচ্চা, যে হাতের বুড়া আঙুল মিলায় দিয়া ভাব করায় দিমু? আমার কাছে ওর ঘরের একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে। ওইটা দিয়ে ঘরের দরজা খুলে ঢুকায় দিতে পারি তোকে, বাকিটা তোর কাজ

'আচ্ছা ঠিক আছে, তাই কর।'

রুদ্রর ঘরটা নিচতলার পেছন দিকে। বাড়ির এদিকের অংশটাকে অনায়াসে এনেক্স বলা যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা করিডর পার হয়ে মূল বাড়িতে ঢুকতে হয়। করিডরের দুপাশ খোলা। দুপাশে প্রফেশনাল মালি দিয়ে গোলাপের চাষ করানো হয়েছে। লাল আর সাদা গোলাপ। সিলিঙের ওপর থেকে ঝুলে আছে গোলাপি রঙের লতানো বাগানবিলাস। আকাশের মনে আছে ছোটবেলায় এ করিডরটাকে ওরা ব্রিজ বলত। আর বাগানটা নদী। সামির সাথে কত কত রোদচড়া বিকেলে এ জায়গায় 'নদী পার হওয়া' খেলা খেলেছে। এ খেলার আবিষ্কারক সে নিজেই। আর খেলোয়াড় শুধু দুজন, সে আর সামি। পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ এ উত্তরার তেরো নম্বর সেক্টরের বাড়িতে রোদবিকেলে 'নদী পার হওয়া' খেলার মজা কী, তা বুঝবে না। জানবে না। ছেলেবেলাটা কোথায় হারিয়ে গেল। কত দ্রুত!

একদম ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে আসা হতো এ বাড়িতে। ওয়াই ডব্লিউসিএ স্কুলে প্লে গ্রুপে পড়ত দুজন। ওখানেই সামির আম্মার সাথে আকাশের মায়ের খাতির হয়েছিল। সামিরা সে সময়েও বড়লোক ছিল। কিন্তু ওর বাবা মায়ের অহংকারটা সহনীয় পর্যায়ের ছিল। আরেকটু বড় হবার পর হাবিব

স্যারের কোচিং থেকে সরাসরি চলে আসত এখানে।

বাড়ির পেছনের ইউক্যালিপ্টাস গাছটার পাশের ছোট্ট উঠোনটা হতো ওদের ক্রিকেট খেলার মাঠ। এ জায়গাটা তখন স্বর্গ মনে হতো। কী ছিল না এ বাড়িতে? ছুটোছুটি করার মতো অজস্র খোলা জায়গা, বিদেশ থেকে সামির আব্বার নিয়ে আসা দামি দামি সব খেলনা, ফ্রিজ ভর্তি খাবার! চকলেট, আইস্ক্রিম, চিকেন ফ্রাই, বার্গার কত কী! বড্ড পেটুক আর লোভী ছিল আকাশটা। ওইসব দামি খেলনা আর মজার মজার খাবারের লোভে দিনের পর দিন এ বাড়িতে কাটিয়ে দিতে মন চাইত ওর। নিজেদের ওই ঝিগাতলার এঁদো, ঘুপসি গলির চারতলা ভাড়া বাড়ির পশ্চিমমুখী ফ্ল্যাটে ফিরতেই মন চাইত না।

তার বাসায় কেন বাইরে থেকে বার্গার, চিকেন ফ্রাই, সসেজ এসব মজার মজার খাবার কিনে আনা হতো না এ নিয়ে আফসোসের সীমা ছিল না। কেন তার আব্বা সামির আব্বার মতো বিদেশ থেকে দামি খেলনা নিয়ে আসত না এ বিষয়েও মায়ের সাথে ঝগড়া করেছে কয়েকবার। মা মিছে আশা দিতেন, বলতেন, 'হবে হবে একদিন সব হবে, তুই পড়ালেখা করে আরো বড় হ, তারপর তুই নিজেই নিজের সব শখ মেটাতে পারবি।'

নিজের শখগুলো, স্বপ্নগুলো শুধু মাটি চাপা দিতেই জানল আকাশ। আজ অবধি কোনো স্বপ্ন পূরণের দুঃসাহস তার হয়ে ওঠেনি। তাহলে হয়ত আকাশ এখনো সত্যিকারের বড় হয়নি। সুনীলের মতো তারও মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে,

'নাদের আলী, আমি আর কত বড় হব? আমার মাথা এ ঘরের ছাদ ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায় তিন প্রহরের বিল দেখাবে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে যায়। সামির সাথে, সামির লাইফস্টাইলের সাথে, পরিবারের সাথে যে তাদের আকাশ-পাতাল ফাড়াক এ সত্যটা উপলব্ধি করতে অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। তবে সবকিছু ছাপিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক বৈষম্যকে পেছনে ফেলে সামিটাকে সত্যি ভালোবেসেছিল সে। সে ভালোবাসা নিখাদ ছিল।

রুদ্র সামির বেডরুমের দরজার নবটা নিঃশব্দে ঘোরাল। ভেতরের দিকে ধাক্কা দিতেই দরজাটা ক্যাঁৎ করে একটা বিচ্ছিরি শব্দ করে উঠল। সামির বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আছে বলে এ ডুপ্লিকেট চাবিটা সামির আম্মাই দিয়েছে রুদ্রকে, যেন রুদ্র সময়মতো ছেলের ঘুম ভাঙাতে পারে। বড় হয়ে যাবার

পর বাবা মায়েরা হুটহাট ছেলেমেয়েদের ঘরে ঢুকতে না পারলেও বন্ধুরা এ কাজটা অনায়াসে করতে পারে।

রুদ্র আকাশকে ঢুকিয়ে দিয়ে সিঁড়ির কাছটায় আসতেই দেখল অমৃতা আর হৃদি এসেছে। হৃদি রুদ্রকে দেখতে পেয়ে হইহই করে বলে উঠল, 'পাগলা গাধাটা কই? বিয়া করার জন্য কি অনশন করতেছে?'

'মনে হয়।' রুদ্র বলল।

হৃদি আর অমৃতা সোজা সামির ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল দরজা খোলা পেয়ে। রুদ্র আটকালো ওদের, বলল, 'এখন যাস না, আকাশ আছে ভেতরে। ওরা কথা বলতেছে।'

অমৃতা চোখ নাচিয়ে বলল, 'ওরে বাপরে! কী চলছে ওখানে? ব্রোম্যান্স?'

'ইয়াহ, ব্রোম্যান্সই বলতে পারিস।' বলে হাসল রুদ্র।

ওরা এসে বসল লিভিং রুমে। সামির আব্বা-আম্মা খুব সম্ভবত বাসায় নেই। কাজের বুয়াটা এসে জিজ্ঞাসা করে গেল চা কফি কিছু খাবে নাকি। খাবে না বলে বিদায় করে দিলো ওরা বুয়াটাকে।

অমৃতা বলল, 'পহেলা বৈশাখের প্ল্যান কী তোদের?'

'পার্টি হবে পার্টি।' রুদ্র বলল।

'পহেলা বৈশাখে পার্টি করতে হয় না, পান্তা খাইতে হয়।' বলল অমৃতা। 'আমি শাড়ি কিনছি একটা নতুন। আম্মা কিনে দিয়েছে। ওইটা পরব, সাজগোজ করব, এইতো।' হৃদি বলল।

'খুব সকালে বের হব, ভোর ছয়টায়। পারবি?' অমৃতার প্রশ্ন।

'না দোস্ত এত সকালে ওঠে রেডি হতে পারব না।'

রুদ্র বলল, 'অমৃতা কি শাড়ি পরবি?'

'শাড়ি পরব ক্যান আমারে কি পাগলা কুত্তায় কামড়াইসে?' অমৃতা খ্যাক করে উঠল।

'ওহ তাইতো তুই বরং একটা পাঞ্জাবি পর। সাদা পাঞ্জাবি, তুই তো মাইয়া না, তুই তো পোলা।' রুদ্র বলল কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে।

'তাই পরব, তোর কোনো সমস্যা?'

'হ, আমার সমস্যা হলো পাঞ্জাবি পরলে তোরে দেখতে হিজড়ার মতো লাগে।'

'যাক অবশেষে দেবী দর্শন হলো!' এক গাল হেসে বলল অভিজিৎ। বিভা একটু অপ্রতিভ হলো। অভিজিৎকে সে সদরে আশা করেনি। একটু হাসার চেষ্টা করল, কিছু বলল না।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই মা দৌড়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'অভিজিতের বাবা-মা এসেছেন। যা, গিয়ে প্রণাম কর।

বিভা থমথমে গলায় বলল, 'আহ মা, মাত্র আসলাম বাড়িতে, একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে দাও না আগে!'

অভিজিৎ শুনছিল মনোযোগ দিয়ে মা-মেয়ের কথোপকথন। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, 'থাক আন্টি আপনি জোর করবেন না, ও ফ্রেশটেশ হয়ে নিজের সময় মতো যাবে দেখা করতে।

বিভার মায়ের মুখটা একটু অপমানে লাল হলো। মেয়ের অভদ্রতা দেখে সে বিস্মিত। বিভা আর কোনো কথা না বাড়িয়ে জায়গাটা ছাড়ল।

নিজের ঘরে গিয়ে পড়লো সৌদামিনীর মুখোমুখি। সৌদামিনী গালভর্তি তেলতেলে হাসি নিয়ে টেনে টেনে বলল, 'কিগো সুন্দরী? কেমন দড়িতে বাঁধলাম তোমায়, হ্যাঁ? একেবারে সোনায় সোহাগা!'

জীবনে এ প্রথমবারের মতো বিভার সৌদামিনীকে অসহ্য লাগল। মেয়েটাকে সে বরাবর পছন্দ করে এসেছে। দাদার ছিল নিজের পছন্দের বিয়ে। বিয়ের পর প্রায় বছরখানেক নতুন বউকে তাদের পরিবারের কেউ মেনে নেয়নি। এক বিভাই ছিল সৌদামিনীর পক্ষের লোক। এ পরিবারে বিভা ছাড়া সৌদামিনীর অন্য কোনো বন্ধু ছিল না। আর সে সৌদামিনীই কি না আজ বিভার জীবনটা ভেঙে খান খান করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে।

বিভা ঠাণ্ডা চোখে সৌদামিনীর দিকে তাকাল। দৃষ্টি দিয়ে বোঝাতে চাইল যে এ ধরনের কথাবার্তা তার ঠিক এ মুহূর্তে ভালো লাগছে না। সৌদামিনী কী বুঝল কে জানে, মুখে সে তেলতেলে হাসিটা ঝুলিয়ে রেখেই বলল, 'তোমার হবু শ্বশুর-শাশুড়ি এসে বসে আছেন। যাও, গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে এসো।'

বিভা এবার পাশকাটানো গলায় বলল, 'হুম'।

আয়নার সামনে ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নিজের বিচলিত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে রইল অপলক। যেন নিজেকে নিজে সে চেনে না। আয়নায় দেখতে পাওয়া মেয়েটি যেন অন্য কেউ।

সৌদামিনী ওঠে এসে বিভাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ভয় কী গো ঠাকুরঝি? তোমাকে দেখতে এমনিই পরির মতো, এত চিন্তার কিছু নেই ওরা তোমাকে আগে থেকেই পছন্দ করে বসে আছে।'

বিভার মনে হলো এ মুহূর্তে তার পাশে পৃথিবীর সবচাইতে মাথা মোটা বেকুব মহিলাটা দাঁড়িয়ে আছে। সে তিক্ততা নিয়ে বলল, 'বৌদি, আমাকে একটু একা থাকতে দাও, ভালো লাগছে না।'

সৌদামিনী চোখ বড় বড় করে বিভার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল বিভা তার আগেই তোয়ালে কাঁধে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করল। তার ভেতরটা কাঁপছে প্রবলভাবে। আর একটা সপ্তাহ বাদে তার বিয়ে। জীবনের এ অধ্যায়টা এত দ্রুত শুরু করার কোনো প্রস্তুতি তার নেই। অভিজিৎকে সে কদিন চেনে? একটা সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের সাথে পুরো একটা জীবন কাটানো কী করে সম্ভব! বাবা-মা কেন তার জীবনটা নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে চাইছে? কেন?

কলের নব ঘুরিয়ে দিতেই ঠাণ্ডা জল মাথায় এসে পড়তে থাকে। টুপ টুপ করে ঝরতে থাকে দু চোখের পাপঁড়িতে। তারপর হঠাৎ স্মৃতির ঘরে শোঁ শোঁ শব্দ তুলে দূর থেকে তেড়ে আসে সাগরের এক প্রকাণ্ড ঢেউ। বলিষ্ঠ দুটি বাহুর শক্ত বেষ্টনী অনুভূত হয় কোমরের খাঁজে। ঠোঁটে অনুভূত হয় সিগারেট খাওয়া কালো অবাধ্য দুটা ঠোঁটের স্পর্শ। দমকা হাওয়ার মতো মনের মাঝে ফিরে আসে সেদিনের ভালোলাগা। ধমনি দিয়ে বিদ্যুতের মতো বয়ে চলে শিহরণ। সেদিনের স্পর্শগুলো এখনো জীবন্ত হয়ে বেঁচে আছে তার সাথে। কতদিন বেঁচে থাকবে কে জানে! যদি কখনো না মরে?

পাগল! পাগল! একদম পাগল! বিভা বিড়বিড় করে নিজের মনে। নিজের মতো হাসে, আবার কাঁদে। বুক জ্বলতে থাকে। মনে হয় জ্বলে জ্বলে, পুড়ে পুড়ে একেবারে খাঁক হয়ে যাবে ভেতরটা।

দরজা খুলে যেতেই শীতল একটা স্পর্শ টের পেল আকাশ। ঘরটা অন্ধকার। দরজা জানালা সব আটকানো। সিলিং ফ্যান বন্ধ। এয়ার কন্ডিশন চলার একটা ভোঁতা শব্দ চিঁচিঁ করছে কানের কাছে। ঘরে ঢুকে দরজাটাকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিলো সে। অন্ধকারে সামিকে দেখা গেল আবছা। বিছানার ওপর শুয়ে আছে চিত হয়ে। আকাশের উপস্থিতি টের পেয়ে সে একটুও না নড়ে তেরছা গলায় বলল, 'ট্রেসপাসিং ইজ আ ক্রাইম ইউ নো!'

'আই নো'

'এইমাত্র তুই আমার ঘরে ট্রেসপাস করলি।'

'কিছু করার ছিল না, দরজা ধাক্কালাম কতক্ষণ ধরে খুললি না তো। ট্রেসপাস না করে উপায় কী?' সামি এবার আর কোনো উত্তর দিলো না।

আকাশ বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। সামি নীরব। ওই নীরবতা একটু একটু করে বাতাসে অস্বস্তির জন্ম দিচ্ছিল। এ পৃথিবীতে মানুষের মধ্যকার সম্পর্কগুলো মনে হয় পানির মতো। কখনো কঠিন, কখনো তরল, আবার কখনো বা বায়বীয়। তরল সম্পর্কগুলো আবার যখন যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের রূপ ধারণ করে। তাই মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলোর কোনো স্থায়ী রূপ থাকে না। ক্রমাগত পরিবর্তনশীল তার রূপ বা আকার।

আকাশ বসল বিছানায়। সাবলীল ভাবটা ফিরিয়ে আনার জন্য স্বভাবসুলভ আমুদে গলায় বলল, 'তর কী হইছে? ভং ধরছোস ক্যান?'

'তুই জানোস না আমার কী হইছে?' সামি প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করল, ধারালোভাবে।

জানি তো, বিয়া করার বাই উঠছে মাথায়, হঠাৎ কী হইলো তোর? এমন অদ্ভুত আচরণ করলি কেন আজ সন্ধ্যেবেলায়?'

কয়েকটা বাক্য বিনিমিয় হয়ে যাবার পর অস্বস্তিটা ধীরে ধীরে ফিকে হতে শুরু করেছে। টের পেল আকাশ।

সামি ওঠে বসল, 'তোর কী মনে হয়? আমি যা করেছি ভুল করেছি?'

এ প্রশ্নের উত্তরে আকাশ কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। সামির সাথে তার বন্ধুত্বে এখন একটু চড়াই উৎরাই যাচ্ছে কি না, তাই চিন্তা ভাবনা না করে কোনো উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না। ফট করে কিছু বলে বসলে সামি যদি আরো বেশি বেঁকে বসে?

আকাশ আমতা আমতা করে বলল, 'ঠিক ভুলের প্রশ্ন আসছে না, আমি জানতে চাই তুই এটা কেন করলি?'

'বিভা কেন হুট করে একটা অচেনা লোককে বিয়ে করে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে বল? তুই চিন্তা করেছিস অভিজিৎকে বিয়ে করলে যে বিভাকে এ দেশ ছাড়তে হবে? তোদের কি ধারণা ওই ব্যাটা নিজের চাকরি-বাকরি সব ফেলে বাংলাদেশে ঘর জামাই হবে? দোস্ত উই আর গোয়িং টু লুজ হার ফরএভার!'

'এই দিকটা তো চিন্তাই করি নাই!'

'চিন্তা কর, ভালো মতো চিন্তা কর।'

'তা না হয় বুঝলাম কিন্তু তোর বিয়ে করতে চাওয়ার পার্টটা কী ছিল? তুই কেন বিভাকে বিয়ে করবি?'

'ওহ ওইটা এমনিই।' বাতাস গিলল সামি।

'এমনিই?' আকাশ বিস্মিত হয়ে আওড়ালো শব্দটা অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সামি! এমনি এমনি তুই কয়টা জিনিস করিস হ্যাঁ? কক্সবাজারে গিয়ে একটা কাণ্ড করেছিস ওর সাথে। ঘটনা ঘটে যাবার পর বলেছিস 'এমনি'। এখন আরেকটা কাহিনি করলি, আবার কোনো জাস্টি-ফিকেশনে না যেয়ে বলে দিলি 'এমনি', ড্যুড প্রবলেমটা কী তোর?'

সামি স্থবির হয়ে রইল। কোনো রা নেই মুখে।

'তুই আমাকে বল, তোর কি কোনো ফিলিংস আছে ওর জন্য? মানে বন্ধুত্বের বাইরে, অন্যকিছু?'

সামি চুপ।

'কথা বল দোস্ত! এরকম করলে ক্যামনে হবে? আজিব কারবার!'

সামি কেমন ফাঁকা চোখে একবার চাইল আকাশের দিকে, তারপর বলল, 'আমি জানি না, আমি জানি না এটা কী, এমনও নয় যে এতগুলো বছর গোপনে ওর প্রতি আমার কোনো ক্রাশ ছিল বা প্রেম ছিল, বন্ধুর চাইতে বেশি কিছু কখনো ভাবিনি ওকে আমি। কিন্তু তুইতো জানিস ওকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিনই ভীষণ ভালো লেগেছিল আমার। ওই ভালোলাগাটা যে মনের মাঝে

এতদিন লুকিয়ে ছিল তা টের পেলাম সেদিন কক্সবাজারে, সমুদ্রসৈকতে। তারপর থেকে জানিস আমার কেমন কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে শুধু বন্ধু হিসেবে নয়, ওর সবটা আমার চাই।'

কথাগুলো বলে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল সামি। দুহাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে অসহায়ভাবে বলল, 'আমি জানি না! সত্যি জানি না! জানি না ও আমার সম্পর্কে কী ভাবে, ও কি কখনো আমাকে বন্ধুর চেয়ে একটুখানি বেশি ভেবেছে কি না, সেদিন যখন আমি ওকে চুমু খেয়েছিলাম ও আমাকে চড় মেরেছিল। ওই ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মতো আমাকে এখনো তাড়া করে বেড়ায়। ও কেন অমন করেছিল সেদিন? নিশ্চয়ই ও বন্ধুর চেয়ে বেশি আমাকে কখনো ভাবেনি।'

একটু সময় চুপ থেকে সে আবার ভারি হতাশ গলায় বলল, 'ওর কাছে উত্তর চেয়েছিলাম, ও তো কিছু বলল না। এর মানে উত্তরটা 'না', সে যাই হোক, দোস্ত বিভা আমাকে বিয়ে করুক আর না করুক বন্ধু হিসেবে ওকে আমি পাশে চাই সারাজীবন। আমি চাই না অন্য লোককে বিয়ে করে ও দেশান্তরী হোক।'

'হুম' আকাশ শব্দ করল একটা অস্ফুটে।

তারপর বলল, 'আসলেই, এ কথাটা তুই ঠিক বলেছিস, আমরা এভাবে ওকে চলে যেতে দিতে পারি না। কিছু একটা করা দরকার। উই নিড আ প্ল্যান!'

'রাইট' সামি বলল মহা উৎসাহ নিয়ে।

আকাশ ওঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুই থাক এখানে, আমি রুদ্রকে ডেকে আনি, অমৃতাকেও খবর দেই, সবাই মিলে একটা কিছু চিন্তা করা যাবে।'

কথাগুলো বলতে বলতে দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে আবার পেছন ফিরে সামির দিকে তাকাল আকাশ। বলল, 'আরেকটা কথা, দোস্ত সেদিন চাকরি-বাকরি নিয়ে আমাদের মধ্যে যা হলো, তুই তো কিছু মনে রাখিস নাই, না?'

'তুই মনে রেখেছিস?'

'না, তবে মনের মধ্যে একটা খচখচানি ভাব আছে এখনো, মনে হচ্ছে তোর সাথে একটু বেশি মিসবিহেভ করে ফেলেছিলাম।'

'মিসবিহেভের কিছুই আমি মনে রাখিনি, হয়তো দোষ আমারই ছিল, তোর অনুমতি না নিয়ে কাজটা আমার করা উচিত হয়নি।'

একটা দম নিল সামি, সময় নিয়ে। এরপর একটু গাঢ় গলায় বলল, 'কিন্তু দোস্ত আমি শুধু চাইছিলাম তোর কিছু একটা হয়ে যাক, অনেকদিন ধরে চাকরির চেষ্টা করছিস তুই। তোকে ছোট করার কোনো ইনটেনশন আমার ছিল

না। তুই তো জানিস.....'

থেমে গেল সামি। শেষ বাক্যটা বলতে গিয়ে মনে হলো না বলাটাই ঢের ভালো। বলে ফেললেই ড্রামাটিক হয়ে যাবে ব্যাপারটা। ঠুনকো হয়ে যাবে।

'আমি জানি' আকাশ বলল দৃঢ়তার সাথে।

'পারলে আমার জন্য একটা ফেভার করিস, চাকরিটা কয়েকমাসের জন্য হলেও কর। পরে কোনো একটা অযুহাতে ছেড়ে দিস। নাও জাস্ট ডু ইট ফর মি! ফর দ্যা টাইম বিইং।'

আকাশ নব ঘুরিয়ে খুলল দরজাটা। ঘর থেকে বেরোবার আগে ছোট করে বলল, 'করব'।

নববর্ষের ভোর। অমৃতার ঘুম ভাঙল আকাশের ফোনে। ঘড়িতে তখন ভোর ছটা। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে নতুন সূর্যের সোনালি আলো এসে তির্যকভাবে পড়েছে মেঝেতে। বারান্দায় বসেছে কাকদের সভা। নিরবচ্ছিন্ন ডেকে যাচ্ছে ওগুলো কর্কশ গলায়, কা-কা কা-কা!

অমৃতা ঘুমে কাদা হওয়া গলায় 'হ্যালো' বলল। 'শুভ নববর্ষ!'

'হুম শুভ!' অমৃতা বলল কোনোরকমে।

'শুভ জিনিসটা কী?'

দূর ব্যাটা ঘুমাইতে দে।

'উঠবি না? যাবি না?'

'কই যামু?'

'নববর্ষে'

'নববর্ষে কেমনে যায়?'

'ওঠ তুই। রেডি হ, আমি আইতাছি।'

ফোন রাখার পর আরো মিনিট পনেরো সময় অমৃতা বিছানায় গড়াল। তারপর ওঠে দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে নিয়ে তৈরি হতে গিয়েই পড়ল বিপদে। আজকে নববর্ষের দিন পরার মতো বিশেষ কোনো জামা নেই তার। গত বছর আড়ং থেকে কেনা যে সাদা পাঞ্জাবিটা আছে ওটাতে তরকারির ঝোলের দাগ লেগে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও সে দাগ পুরোটা মুছতে পারেনি সে। আম্মির দেওয়া একটা লাল ফতুয়া আছে তবে কোমরের দিকটা একটু সরু হওয়ায় ফতুয়াটাতে একটা মেয়েলি ভাব চলে এসেছে। যে মেয়েলি ভাবটা অমৃতার সাথে একেবারেই যায় না।

বলতে নেই অমৃতার শরীরের গাঁথুনিখানা কিন্তু ভারি চমৎকার। ছিপছিপে লম্বাটে গড়নের শরীরটায় যেকোনো মেয়েলি জামা পরলেই ভারি সুন্দর দেখায়। তার ফরসা গায়ের রং, টিকোলো নাক, পেলব ঠোঁট সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা মায়াবী রূপের ছটা ঝিলিক দেয়। মাথার আর্মি ছাটের ছোট চুলগুলোও সে

মেয়েলি সৌন্দর্যকে দাবাতে পারে না। কিন্তু তাতে কী? অমৃতার যে ওইসব পোশাকের সাথে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

সে অনেক ভাবনা চিন্তা করে শেষ-মেশ গত বছরের ঢোলা দাগওয়ালা পাঞ্জাবিটাই পরে নিল। মাথার চুলগুলোতে আঙুল বুলিয়ে একটু ভদ্রস্থ করে নিল। ব্যস হয়ে গেল তার সাজ।

বাড়ির মানুষগুলো তখনও ঘুমোচ্ছে। অমৃতা পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসলো বাসা থেকে। যেন কারো ঘুম না ভাঙে।

ভোরের আলো তখনো নরম। বাতাস থমকে আছে। একটু বাদেই তেজি রোদ বৈশাখের প্রথম দিনের আকাশটাকে সম্পূর্ণ দখল করে নেবে। থমকানো বাতাসে এখন সে তেজেরই পূর্বাভাস। রাস্তায় এর মাঝেই লাল আর সাদা জামা পরা লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। নববর্ষকে বরণ করে নিতে রাজধানীর রাজপথ পুরোপুরি তৈরি।

নিচে নেমে দেখা গেল আকাশ ওদের গেটের সামনে পায়চারি করছে। তার পরনেও সাদা পাঞ্জাবি। চুলগুলো জেল দিয়ে ব্যাকব্রাশ করেছে। বের হবার আগে শেভ করেছে বলে ওর গা থেকে ভুর ভুর করে উড়ে আসছে আফটার শেভের ঘ্রাণ। বেশ পরিপাটি আর ভদ্র দেখাচ্ছে ওকে।

আকাশের সবার প্রথমেই চোখ গেল অমৃতার পাঞ্জাবির পেটের কাছে লেগে থাকা হলুদ রঙের ঝোলের দাগে। কপাল কুঁচকে সে বলল, 'আজকে একটা পয়লা বৈশাখ, একটা বছরের শুরু, আজকের দিনে এমন ময়লা একটা জামা তুই কোন আক্কেলে পরলি?'

'এইটাই স্টাইল' অমৃতা বলল নির্বিকার গলায়।

'তোকে ভীষণ নোংরা দেখাচ্ছে।'

'ডোন্ট কেয়ার!'

'তুই আলাদা যা, আমি তোর লগে যামু না।' নাক মুখ কুঁচকে এমনভাবে কথাগুলো বলল আকাশ, যেন অমৃতার গা থেকে বাজে দুর্গন্ধ ভেসে আসছে।

'তুই কি মনে করেছিস তোকে হৃত্বিক রোশান লাগছে? আলাদা যাইতে চাইলে আলাদা যা! আমি কি মইরা যাইতাছি তোর সাথে যাওয়ার জন্য?'

আকাশের কপালে তখনও প্রশ্নচিহ্ন।

'নববর্ষের দিন কায়দা করে এমন ময়লা সাজার মানেটা কী?'

'কোনো মানে নাই, আমার মনে চাইছে তাই ময়লা সাজছি, কোনো সমস্যা?'

‘তোর কি আর কোনো জামাকাপড় নাই? তুই কি ফকির?

‘হ আমি ফকির, আর তুইতো একজন বাদশাহ, সুলতান সুলেমান! হুররাম কোথায় তোর? হুররাম সুলতানাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।’ বলে অমৃতা এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল যেন সে সত্যিই হুররাম সুলতানাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

‘দূর ওইসব সুলেমান টুলেমানের বেল আছে? আমি হচ্ছি ইফতেখার আকাশ, এলাকার সব মেয়েরা এমনিতেই আমার পিছে ঘুরে। আজকে নববর্ষের দিন যদি তোর মতো ময়লা ফকিরের সাথে আমারে কেউ দেইখা ফ্যালে, তাইলেতো মনে কর মামা আমার প্রেস্টিজ পাংচার।’

অমৃতা এবার খানিকটা বিরক্ত গলায় বলে উঠল, ‘শোন আকাশ! সকাল সকাল মুডটা খারাপ করিস না, আরেকটা আজাইরা কথা বলছস তো দিব এক থাবড়া, আমার সাথে থাকতে মনে না চাইলে ভাগ এখান থেকে!’

আকাশ গোঁ ধরা গলায় বলল, ‘না যামু না, তুই জামা পাল্টায় আয়।’

‘আরে আজিব তো! জামা পাল্টাব কেন?

‘আমি বলেছি তাই।’

‘ইম্পসিবল!’

‘তাইলে তুই থাক আমি চললাম!’ বলে আকাশ ঘুরে দাঁড়াল। ‘চললি কোথায়?’

‘কই আবার। ললনাদের দেখতে যাই।’

আকাশ একটা রিকশাও পেয়ে গেল মুহূর্তের মাঝে। ওঠে বসতেই অমৃতা রিকশার পাদানির কাছে এসে বলল, ‘ওইপাশে যা, আমি বসব।’

আকাশ নড়ল না। জ্বলে ওঠে বলল, ‘একটা লাথি দিমু। খবরদার যদি তুই আমার সাথে রিকশায় উঠছস।’

অমৃতা কোনো কথা না বলে সটান রিকশার পাদানিতে ওঠে পড়ল। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘সর সর! বসতে দে!’

বুড়ো রিকশাওয়ালা ওদের কাণ্ড দেখে হে হে করে হাসতে লাগল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার রাস্তা আলপনায় সজ্জিত। দেওয়ালে কারুকাজ। ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে ডুগডুগি। কারো কারো সাথে রয়েছে আবার ভুভুজেলা। মেয়েদের গায়ে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। মাথায় ফুল। গালে আলপনা। ছেলেদের গায়ে পাঞ্জাবি। বৈশাখের উত্তপ্ত আকাশের নিচে, রোদ

পোড়া ভ্যাপসা গরমকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বছরকে বরণ করার আহ্লাদে মত্ত নগরবাসী।

প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে রুদ্রর চোখ আকাশকে খুঁজছিল। তার ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে থাকা চুলগুলো আজ চুড়ো করে ঝুঁটি বেঁধেছে। দাড়ি সম্পূর্ণভাবে কামানো। তার পরনে একখানা ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি, হাতে হাতপাখা। হাতপাখা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে সে আকাশকে খুঁজে চলেছে। বেশ খানিকক্ষণ পর আকাশ আর অমৃতাকে দেখা গেল। রুদ্র বলল, ‘এত দেরি কেন তোদের, গরমে একলা খাড়ায় থাকতে থাকতে জান শেষ।

‘এই যে এ ময়লা মহিলার জন্যই তো সময় নষ্ট হলো।’ আকাশ বলল পানসে মুখে।

‘সামি কোথায়?’ অমৃতার প্রশ্ন।

‘গরমে বের হবে না, দুপুরের পর বের হবে বাসা থেকে।’

‘হ, মাইয়া তো একটা, গরমে বের হলে তো কালো হয়ে যাবে জানিস না?’ অমৃতা বলল।

তারপর ওই ভ্যাপসা ঘেমো বাতাসের মাঝে চারুকলা থেকে শাহবাগ পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে, বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা লেবুর শরবত আর ফুচকা খেয়ে, ঝালমুড়ি খেয়ে দুপুর পার করল ওরা।

এরপর এসে বসল লালমাটিয়ার একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাংলা রেস্তোরাঁয়। সামিও আসলো ওখানে একটু বাদে। আসলো হৃদিতা। হৃদিকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে। সাদা জমিন আর সোনালি পাড়ের একটা কাতান পরেছে সে। হাত ভর্তি কাচের চুড়ি আর কপালে লাল টিপ।

বিভা তখনও এসে পৌঁছয়নি।

নববর্ষ বলে এ রোস্তরাঁয় আজ প্রচণ্ড ভিড়। বেয়ারা ছেলেটা এগিয়ে এসে মেশিনের মতো জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনারা কী খাবেন?’

রুদ্র বলল, ‘আমাদের আরো একজন বন্ধু আসবে, আমরা অপেক্ষা করছি তার জন্য। একটু পরে অর্ডার দেবো।’

বেয়ারা মুখ গোমড়া করে চলে গেল। মনে হলো রুদ্রর কথাটা তার খুব একটা মনে ধরল না।

সামি একটা নেভিব্লু রঙের শর্ট পাঞ্জাবি পরেছিল। তার গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কোঁকড়ানো চুলগুলো উশকোখুশকো। হৃদি ওর দিকে অদ্ভুতভাবে

তাকিয়ে আছে। পাগলদের দিকে লোকে যেমন ভয়ে ভয়ে কিন্তু কৌতূহলী চোখে তাকায়, ঠিক সেভাবে। সামি একটা খ্যাঁক দিয়ে ওঠে বলল, 'কী দেখিস?'

'তোর রূপ!' হৃদি বলল চোখে মুখে একটা কৌতুকের মুদ্রা ফুটিয়ে তুলে।

'একটা থাবড়া খাবি! চোখ সরা!'

'ওমা! তাকানোও যাইব না? তা তুই বোরখা পরে আসলেই পারতি, এত একদম লজ্জায় মইরা যাইতাছোস?'

সামি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বেয়ারা ছেলেটা আবার এসে মেশিনের মতো উচ্চারণ করল, 'আপনারা কী খাবেন? অর্ডার দিবেন এখন?' ভাবটা এমন যে এখন অর্ডার দিলে দেন নাহলে ভাগেন।

সামি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে নির্বিকার গলায় বলল, 'আপনাদের এখানে কি গিরগিটি ফ্রাই হবে?

ছেলেটার মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেল প্রথমে, তারপর অপমানে হলো লাল। কঠিন গলায় বলল, 'না'

'কুমিরের ল্যাজ হবে?'

ছেলেটা আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর কঠিন গলায় বলল, 'জি না'

ওদিকে বাকি সব বন্ধুরা খিলখিল করে হাসা শুরু করে দিয়েছে। আকাশ পরিস্থিতি সামলানোর জন্য অত্যন্ত নরম গলায় ছেলেটাকে বলল, 'ভাই আমার বন্ধু আপনার সাথে একটু ফান করল কিছু মনে করবেন না। আপনি এক কাজ করেন আমাদের প্রত্যেককে একটা করে তেহারি দিয়ে দেন। সাথে সালাদ।'

ছেলেটা যেমন কঠিন মুখে এসেছিল, তেমন কঠিন মুখ নিয়েই বিদেয় হলো জায়গাটা থেকে।

বিভা এসে পৌঁছুল অবশেষে। ও পরেছে একটা লাল শাড়ি। হাতে চুড়ি। কপালে লাল টিপ। তবে মুখে অন্যান্য দিনের তুলনায় প্রসাধন কম। চোখের নিচটায় একটু কালো ছাপ। দেখামাত্রই বোঝা গেল, মেয়েটি রাতে এক ফোঁটা ঘুমায়নি।

বিভা আসা মাত্রই বলল, 'তোমাদের মনের আশা পূরণ হতে চলল বলে, বিয়ের সবকিছু ঠিকঠাক।'

সামি বিভার দিকে তাকাল না। যেন বিভার দিকে আজকের দিনে তাকালে তার বড়-সড় পাপ হবে। হাতে স্মার্টফোন নিয়ে ফোনের দিকে খুব মনোযোগ

দিয়ে তাকিয়ে আছে সে। ভাবটা এমন যে বিভার বিয়ে ঠিক হওয়া বিষয়ক ফালতু খবরে কান দেবার সময় নেই তার এ মুহূর্তে।

হৃদি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, 'ওয়াও! এই প্রথম আমার কোনো ফ্রেন্ডের বিয়ে হতে যাচ্ছে। আমি ভীষণ একসাইটেড!'

রুদ্র আর আকাশ একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। চোখে চোখে কিছু ভাব বিনিময় হলো বলে মনে হলো। কয়েকটা সেকেন্ড ঝিম ধরে কিছু একটা চিন্তা করল আকাশ, তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'ইয়ে, শোন বিভা, বিয়ের পর কি তোকে অভিজিৎদের ওখানে চলে যেতে হবে? মানে কলকাতা?'

'না সে তো ঘরজামাই থাকবে, জানোস না? যত্তসব! অবশ্যই যেতে হবে কলকাতা।

রুদ্র তীব্র প্রতিবাদের গলায় টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠল, 'অসম্ভব! এ হতে পারে না!'

বিভা বাঁকা সুরে বলে উঠল, 'ঢং করিস না, যেন তোরা জানতি না যে বিয়ের পর মেয়েরা নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।'

'সেটা জানতাম কিন্তু দেশ ছেড়ে পুরোপুরি চলে যাবার ব্যাপারটা মাথায় ক্লিক করেনি, আকাশ বলল।

ততক্ষণে তেহারি চলে এসেছে। সামি কানকাটার মতো হয়ে ছিল। খাবার সামনে পেয়েই গপগপ করে মুখে পুরে দিতে লাগল।

অমৃতা বলল, 'তুই অভিজিৎকে বলে দ্যাখ না, যে বিয়ে করতে রাজি আছিস এক শর্তে, তুই ঢাকা ছেড়ে যাবি না কোথাও।'

'হ আরো কিসু, ব্যাটা বিয়া কইরা বউ ফালায়া যেমন আসছিল তেমন ফেরত যাইবোগা, তাইলে বিয়ে করার দরকার কী?'

রুদ্র বলল, 'তুই বলে দে তুই বিয়ে করবি না!

বিভা মুখ কাঁচুমাঁচু করে বলল, 'বলেছি, লাভ হয় নাই।'

'বলে দে তুই অন্য একজনকে ভালোবাসিস!' আকাশ বলল।

'আরো কিছু?' বিভা ব্যাপক বিরক্ত।

'বলে দে তুই সামিকে ভালোবাসিস। সামিকে ছাড়া তুই বাঁচবি না।' নিশ্বাস বন্ধ করে কথাগুলো বলে ফেলল আকাশ।

সামির মুখে তখন আস্ত একটা গরুর মাংস। আকাশের কথা শুনে তার

খাবার নাকে মুখে ওঠে গেল। কাশতে কাশতে বেচারার নাক চোখ লাল হয়ে একাকার।

বিভাও অপ্রতিভ হলো আকাশের কথায়। মিইয়ে গেল। বলল, 'কী যে বলিস!'

তারপরই আবার প্রসঙ্গ পাল্টে সাথে সাথে বলল, 'আজকে আমি অনেক রাত পর্যন্ত তোদের সাথে থাকব, আগামীবছর পয়লা বৈশাখে হয়তো তোদের সাথে থাকা হবে না।'

বিভার কথাটা সবার মন খারাপ করিয়ে দিল। যদিও মুখে কেউ কিছু বলল না। বিভার ভালো হোক এটাই ওরা মনপ্রাণ দিয়ে চায়। ওদের বন্ধুত্বের খাতিরে বিভাকে তো ওরা আজন্ম বেঁধে রাখতে পারবে না। জীবন তরি যে বাইতেই হবে!

খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা গেল আশুলিয়া, সামির গাড়ি করে। আশুলিয়া থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হলো। সামি সবাইকে যার যার বাসায় ড্রপ করল। সব শেষে বিভাকে। আজকে সে বিভার চোখে চোখে চেয়ে একটা কথাও বলেনি। সারাক্ষণ কেমন এক আড়ষ্টতা কাজ করে যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। একটা জমাট বাঁধা কষ্ট বুকের ওপর সাঁড়াশির মতো চেপে বসে ছিল। এ অনুভূতির নাম কী সামি জানে না।

গাড়িতে রুদ্র ছিল ওদের সাথে। রুদ্রই সামিকে বলল, 'তুই ওপরে যা বিভার সাথে, আমি বসি।'

রুদ্র কি কিছু একটার ইঙ্গিত দিলো? বুঝিয়ে দিলো কি যে বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই?

সামি আর বিভা গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে এপার্টমেন্টের লবি পর্যন্ত হেঁটে আসলো। কেউ কোনো কথা বলল না।

লিফটের বাটন প্রেস করে বিভা সামির দিকে চাইল। সামিও। চোখে চোখ পড়তেই অপ্রস্তুত হয়ে চোখ সরিয়ে নিল সামি। তারপর কী যেন ভেবে নিজের মনে হেসে ফেলল।

বিভা প্রশ্ন করল, 'হাসলি যে?'

'আমাকে কি তোর খুব বাজে ছেলে মনে হয়?' মুখে সে অর্থহীন হাসিটি ঝুলিয়ে রেখেই সামি আলগোছে প্রশ্ন করল।

শুনে বিভা যেন বেশ অবাক হলো, 'যাহ্! কী যে বলিস, তোকে বাজে মনে হবে কেন?'

‘সেদিন ডাকাতের মতো জোর করে চুমু খেলাম তোকে, আবার কদিনবাদে বললাম বিয়ে করব, তবুও বাজে বলে মনে হয় না আমাকে?’

ফ্যালফ্যাল করে চোখে চোখে চেয়ে থেকে কেমন অকপটে বলে ফেলল কথাগুলো সামি। যদিও তার চোখের দৃষ্টি স্থির নয়। নিশ্বাসের ওঠানামাও অস্বাভাবিক।

বিভা আড়ষ্ট হলো। চোখ নামাল নিচে। আলতো গলায় বলল, ‘এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।’

‘কেন?’

‘কারণ তুই জোর করে কিছু করিসনি, ব্যাপারটা মিউচুয়াল ছিল।’

‘সত্যি?’

‘সত্যি।’

লিফটের দরজা খুলে গেল। বিভা ঢুকে গেল বাক্সটার ভিতর। সামি নড়ল না। যেমনটি দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থেকেই বিভার দিকে অপলক চেয়ে রইল। কী যেন আছে ওই তাকিয়ে থাকার মাঝে। অমন মাদক চোখের ভয়াবহ চাহনি বিভা এর আগে কোনোদিন দেখেনি। তার বুক ধড়ফড় করতে থাকল। গলা শুকিয়ে কাঠ

‘আসবি না?’

‘কোথায়?’

‘বাসায়।’

‘এসে কী হবে?’ অদ্ভুত হাহাকার নিয়ে প্রশ্ন করল সামি।

বিভা আকস্মিক হাত বাড়িয়ে সামির নতুন কেনা আড়ংয়ের পাঞ্জাবিটার বুকের কাছে ছোবল দিয়ে ধরে দুমড়ে-মুচড়ে হ্যাঁচকা টানে ওকে ভেতরে নিয়ে আসলো। ‘বাপরে!’ শব্দটা ছিটকে বেরিয়ে আসলো সামির মুখ থেকে। লিফটের দরজা আটকে গেল আপনাআপনি।

তারপর ওরা দুজন মুখোমুখি। কারো মুখে কোনো কথা নেই, অথচ চারটি চোখে কেবল কথারই প্লাবন।

লিফট ওপরে উঠছিল। সামি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে লিফট থামিয়ে দেবার বোতামটা প্রেস করল। সাথে সাথে যন্ত্রটা থেমে গেল। নিভে গেল বাতি। বাক্সটার ভেতর রইল না কোনো আলো, রইলো না এক রত্তি হাওয়া। ঘুটঘুটি অন্ধকারে কেঁপে উঠল বিভা।

'সর্বনাশ! কী করলি এটা? অনেক গরম, মইরা যামু দোস্ত, লিফট চালু কর।

সামি জেদি গলায় বলল, 'আগে আমার উত্তর দে।'

'কীসের উত্তর?'

'বিয়ে করবি আমাকে?'

'সামি, তুই পাগল!'

'জানা কথা'

'পাগলামো করিস না, দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার, লিফট চালা।' সামি বিভার হাতদুটো শক্ত করে চেপে ধরল।

বিভার হাত ঘামছে, কপাল ঘামছে। সিকিউরিটির লোকরা টের পেয়ে গেলে কী একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে ভাবা যায়!

বিভা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'ছাদে চল, তোর সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি। পায়ে পড়ি এ বাক্সের মধ্যে আমাকে বন্দি করিস না।'

'শিওর?'

'শিওর।'

ছাদে এসে দেখা গেল অন্ধকারের সাথে মিশে ভ্যাপসা একটা হাওয়া ঘাপটি মেরে বসে আছে। অন্ধকার আকাশের শরীর ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা নীল তারা। এগারো তলার ছাদের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে আলোক সজ্জিত ঢাকা শহর। মনে হচ্ছে যেন রাতজাগা জমকাল নগরীর পাহাড় চূড়ায় ওঠে এসেছে ওরা।

বিভার খোলা চুলগুলো ঘামে ভিজে গেছে। সে হাত উঁচু করে প্রথমেই চুল মুড়িয়ে খোঁপা করে নিল। ব্যাগ থেকে টিস্যুপেপার বের করে মুখ মুছল। তারপর জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে, ঢোঁক গিলে বলল, 'কী সমস্যা তোর?' এবার একটু কঠিন দেখাল বিভাকে।

'তোর কী সমস্যা?' প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে সামি।

'আমার তো কোনো সমস্যা নাই! তুই জানিস আমার বিয়ে ঠিকঠাক,

এরপরও তো এসমস্ত ফাজলামোর কোনো মানে হয় না।'

'ফাজলামো মানে?'

'ফাজলামো নয়তো কী? তোকে বিয়ে করতে চাই কি না জানতে চাইছিস? চাইলেই কী আর না চাইলেই কী? ধর আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি তোকে বিয়ে করতে চাই, এরপর, কী করবি তুই হ্যাঁ? শুনি কী করবি?'

'কী আবার করব, বিয়ে করব!' কাঁধ ঝাকিয়ে বলল সামি।

'এতই সোজা?'

'এতই সোজা, তুই একবার বলে দেখ না!'

বিভার বুক থেকে একটা লম্বা শ্বাস বেরিয়ে গেল, অধৈর্য গলায় বলল, 'তোর মধ্যে ম্যাচিউরিটি জিনিসটা একেবারেই আসেনি। বাস্তব জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তোর'।

'তুই বারবার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন? তুই আমাকে চাস নাকি চাস না?' ভারি ক্ষুব্ধ শোনাল সামির গলা। উত্তেজনায় ফুলে উঠল তার কণ্ঠহাড়।

বিভা অস্ফুটে বলল, 'চাই'।

'কী?' কথাটা যেন বিশ্বাস হলো না সামির।

'তুই আমার বন্ধু, তোকে পাশে চাইব না কেন বল?'

'আবার ন্যাকামো!' বিরক্তিতে দু হাত নিজের মাথায় ওঠে যায় সামির। অপ্রকৃতস্থের মতো মাথা চেপে ধরে বলে, 'ওহ্ গড! আর ইউ সিরিয়াসলি দ্যাট ডাম্ব? আমার কথা বুঝতে পারছিস না? আমি জানতে চাইছি বন্ধুর চেয়ে বেশি কিছু কখনো ভেবেছিস কি আমায়? কখনো? একটাবারের জন্যও?'

বিভা সামির চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। অস্থির চক্ষুজোড়া এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল তার।

সামি প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'কথা বল!'

বিভার ঠোঁটদুটো এবার একটু কেঁপে উঠল। চোখের কোলে জমে উঠল মুক্তোর মতো কয়েক বিন্দু জল। বুকের ভিতর তোলপাড় হচ্ছে। জাদুর মতো বদলে যাচ্ছে চারপাশের চেনা জগৎ।

'সব কথা কি বলতে হয়? কিছু জিনিস কি বুঝে নেয়া যায় না?' বিভা তখন অশ্রুরুদ্ধ।

কথাটা শুনে সামি কেমন থমকে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্বাস আটকানো কয়েকটা মুহূর্ত গড়িয়ে যাবার পর সে বরফ শীতল গলায় প্রশ্ন করল, 'আমাকে ভালোবাসিস?'

'এতদিনেও বুঝিসনি?'

'বুঝতে দিলি কোথায়?'

'তোর জায়গায় অন্য কোনো ছেলে যদি অমন হামলে পড়ে চুমু খেত আমাকে, তাহলে কি করতাম জানিস? খুন করতাম!'

সামির মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

ঠিক সে সময় মোবাইলটা শব্দ করে উঠল। রুদ্রর ফোন। ফোন ধরতেই রুদ্র ওপাশ থেকে বলল, 'কী মামা তোমরা কি বিয়াশাদি কইরা, বাচ্চা কাচ্চাও পয়দা কইরা ফেলছ নাকি?'

'কী চাই তোর? পারফেক্ট টাইমিং! ফোন দেয়ার আর টাইম পাইলা না।'

'তাড়াতাড়ি আয় ব্যাটা, কতক্ষণ বইসা থাকমু?'

'আচ্ছা আইতাছি।' ফোন কাটল সামি।

বিভা বলল, 'তুই যা, রুদ্র বেচারা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে।'

সামি নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'তোকে একটা কিস করি?'

বিভা লাল হল, 'নাহ, এটা সাগরসৈকত না, ঢাকা শহর!'

সামি মরিয়া হয়ে বলল, 'একটা, প্লিজ?'

বিভা মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে হরিণীর মতো ছুট লাগাল। সামি পেছন থেকে উঁচু স্বরে ডাকল 'বিভাবরী!'

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিভা। সামি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল, তারপর বড় সুন্দর করে টেনে টেনে বলল, 'আমি তোকে ভালোবাসি!'

বিভা রাজেন্দ্রাণীর হাসি হাসল। রাঙা হলো লজ্জায়। কী যেন একটা বলতে চেয়েও বলল না আবার। ধীর পায়ে সরে গেল জায়গাটা থেকে।

রুদ্র রাস্তার ধারের ড্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সামি দেখতে পেয়ে চড়া গলায় বলে উঠল, ‘শালা কাম সারার আর জায়গা পাস না!’

‘বাথরুম নাই আশপাশে কোনো, কী করমু? তুমি তো প্রেম করতে করতে দুনিয়া জাহান ভুইলা গেছ।’

সামি গাড়িতে উঠে বসল। একটু বাদে রুদ্রও আসল। সামির ঠোঁটে একটা মুচকি হাসি লেগে ছিল। দেখতে পেয়ে রুদ্র বলল, ‘আপডেট কী?’

‘শি লাভস মি!’

রুদ্র পানসে মুখে বলল, ‘এটা কোনো কথা না, বিভা আমাকেও ভালোবাসে। তোর প্রতি ভালোবাসাটা কি ডিফারেন্ট কিছু?’

‘ড্যাম ডিফারেন্ট ম্যান! শি ইজ ইন লাভ উইথ মি!’

‘কও কী মামা? তলে তলে এতদূর?’ বলে রুদ্র শিস দিয়ে উঠল। ‘হু’ করে একটা আনন্দের শব্দ করল মুখ দিয়ে। তারপর বলল, ‘তাহলে? এখন করবি কী?’

‘পালাব।’

‘গ্রেট, কবে পালাচ্ছিস?’ রুদ্রর প্রশ্নের ধরন শুনে মনে হলো পালানোর মতো মহৎ কাজ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই

‘জানি না, বাট পালাব এটা শিওর।’

‘ওয়াও! আমি রিয়েল লাইফে কখনো এসব সিনেমাটিক কাজ কারবার দেখি নাই বুঝছিস? ভীষণ একসাইটেড আমি।’

‘আচ্ছা চল, আকাশের বাসায় যাই, একটা প্ল্যান করতে হবে।

বাড়ি ফেরার পর থেকে হৃদির বুকটা কেমন খালি খালি লাগছিল। গা ভর্তি নববর্ষের জমকালো সাজ নিয়েই মূর্তির মতো বসে ছিল নিজের বিছানায়। আজ বছরের প্রথম দিনটি কাটানোর পর এমন মন খারাপের একটি প্রহর যে ভাগ্যে লেখা ছিল তা কে জানত! গত বছরের পহেলা বৈশাখের দিনটির কথা মনে পড়ছে খুব। মনে পড়ছে আর বুকটা খাঁখাঁ করছে।

তখন ওর জীবনে রবিন ছিল। কে জানত একটা বছর ঘুরে আসার মাথায় রবিন ওর জীবন থেকে এভাবে নেই হয়ে যাবে? কে জানত এক বছর পর ঠিক এ দিনটিতে তার ভালোবাসার মানুষটি আর পাশে থাকবে না এবং একই সাথে

দিনে বিভাকে হারানোর প্রস্তুতি নিতে হবে মনে মনে?

বিভাটা চলে যাবে, এ দেশ ছেড়ে, তাদেরকে ছেড়ে। কথাটা ভাবতেই কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে। জীবন এত কঠিন কেন? কেন জীবনের তাগিদে সবাইকে অমন আলাদা আলাদা বিচিত্র সব গন্তব্য বেছে নিতে হয়? কেন চলার পথটা একটা সময় এসে অমন বৃক্ষের মতো ডালপালা গজাতে থাকে? একটি

মাত্র পথ কেন সবার জন্য বরাদ্দ হয় না?

হৃদির মনে পড়ল স্কুলজীবনের এক কার্তিকের দুপুরের কথা।

তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে ওরা। এগারো কী বারো বছর বয়সের তিনটি মেয়ে হাতে হাত ধরে শপথ নিল সারাটি জীবন একজন আরেকজনের পাশে থাকবে বলে। শপথটিকে আরো বেশি অর্থবহ করে তোলার জন্য অমৃতা সেফটিপিন দিয়ে হাতের আঙুল ফুটো করে ফেলল। এক বিন্দু লাল টকটকে রক্ত সাদা কাগজের ওপর টুপ করে ফেলে ভারি শক্ত গলায় বলল, 'রক্ত দিয়ে শপথ করলাম, সারাজীবন পাশে থাকব!'

সে কমবয়সি বুকে অমৃতার ওই বজ্রসম শপথ কী যে তোলপাড় করে দিয়েছিল! চোখ জুড়ে নেমেছিল কান্নার জোয়ার। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল হৃদি, 'আমার হলো কান্না শপথ, কান্না দিয়ে শপথ করলাম, মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধু থাকব, এক সাথে থাকব।'

বিভা তখন কাগজ কলম নিয়ে লেখতে বসে গেল, বলল 'ওকে, তাহলে আমি নিলাম লিখিত শপথ' বলে সে গোটা গোটা অক্ষরে অমৃতার রক্তের দাগওয়ালা কাগজটায় লিখল, আমি শপথ করিতেছি যে আমি আজীবন আমার দুই বান্ধবী হৃদি এবং অমৃতার সাথে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখব। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তিনজন একত্রে থাকব।' সে কাগজটা এখনো আছে বিভার কাছে।

কী ছেলেমানুষই না ছিল ওরা। পরবর্তী জীবনে ওইসব কথা মনে করে বন্ধুরা কত হেসেছে! অথচ আজ এ স্মৃতিটা মনের পাতায় ভেসে উঠতেই সে পনেরো বছর আগেকার কার্তিকের দুপুরটির মতো আবার তার দু চোখ জুড়ে অশ্রু বন্যা নামল।

মাথার ওপর দিয়ে একটা নীলপেড়ে সুতির শাড়ির আঁচল বাতাস কেটে উড়ে গেল। আকাশ পড়ার টেবিল চেয়ারে বসে ল্যাপটপে লেকচার তৈরি করছিল। পরশু দিন তার চাকরির প্রথম দিন। শাড়ির আঁচল তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সে পেছনে। তার বাপের বউ ঝুমকি ড্রেসিং টেবিলের ওপর গরম দুধ ভর্তি একটি গ্লাস রেখে বেশ কর্তৃত্ব ফলানোর গলায় বলল, 'দুধটা খেয়ে নাও।'

এক নজর দেখে আবার ঘাড়টাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আকাশ বলল, 'নিয়ে যান, খাব না।'

ঝুমকি হেঁটে এসে আকাশের পেছনে দাঁড়াল। কাঁধে হাত রাখল আলতো ভাবে।

'রোজ তোমার এ কেমন নকড়া? কিছু খেতে চাও না, শরীর খারাপ করবে তো!'

এসব অনর্থক ঢং আকাশের একদম ভালো লাগে না। কাঁধে মেয়েটার হাত পড়তেই আকাশ গায়ে গরম খুন্তির ছ্যাঁক লাগার মতো চমকে ওঠে এক পাশে সরে গেল। তাকাল ঝুমকির দিকে, নিত্যকার মতো কঠিন গলায় বলল, 'আপনাকে না বলেছি আমাকে খালি খালি বিরক্ত করবেন না?

কথাটা শুনে ঝুমকির গোলগাল, ফরসা, ধারহীন মুখমণ্ডলে একটি কেমন মেদুর ছায়া পড়ল। ঠোঁট দুটো অনেক কষ্টে নেড়ে বলল, 'তুমি আমার সাথে এমন করো কেন সব সময়?'

'উফ!' আকাশের মুখ থেকে বিরক্তিসূচক শব্দটা অনায়াসে বেরিয়ে আসলো। এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক কীভাবে দেওয়া যায়? প্রায় বছর দশেকের মতো সময়কাল ধরে এ মেয়েটি তার বাপের বউ হয়ে সংসারের রানি সেজে বসে আছে। মায়ের মৃত্যুর ঠিক পঁয়ত্রিশ দিনের মাথায় তার পিতা যখন এ মানবীটিকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছিল সেদিন থেকে আপনাআপনিই আকাশ একে ঘেন্না করা শুরু করেছিল। পিতার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর বয়স ছিল বেশি হলে টেনেটুনে

একুশ, আর আকাশের তখন পনেরো। বয়সে পাঁচ ছয় বছরের বড়, হ্যাংলা পাতলা, ফরসা বোকা বোকা চেহারার, পড়াশোনা কম জানা মেয়েটি কোনোদিক থেকেই তার মায়ের জায়গা নেবার যোগ্য ছিল না। কিন্তু ঠিক প্রথম দিনটি থেকে বোকা মেয়েটা আকাশের মা সাজার নিরবচ্ছিন্ন, নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে চেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে। এ দশ বছরে কোনো দিন আকাশ এর সাথে আগ বাড়িয়ে কথা বলেনি। চোখে চোখ রেখে নরম স্বরে বাক্যালাপ করাত দূরের কথা।

বছর পাঁচেক আগে এক রাতে তার ভয়ঙ্কর জ্বর আসল শরীর জুড়ে। বমি টমি করে একাকার অবস্থা। ঝুমকি সারা রাত জেগে আকাশের সেবা করল। জ্বর পট্টি লাগাল। মাথা টিপে দিল, মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালল। বলতে গেলে তার সেবাতেই আকাশ রাতারাতি সুস্থ হয়ে উঠল। ভোরের দিকে জ্বরে পোড়া চোখদুটো মেলে যখন সে দেখল তারই বিছানায় ঝুমকি বালিশে আলগাভাবে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে, আকাশ তখন গগনবিদারী এক চিৎকার দিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল। ঝুমকি রীতিমতন কেঁপে ওঠে ঘর ছেড়ে পালালো।

পিতার সাথে মায়ের মৃত্যুর পর তার সম্পর্কটা হয়ে গেছে বরফের মতো শীতল। কথাবার্তা খুব একটা হয় না বললেই চলে। বছর দুয়েক আগ পর্যন্তও দু হাজার টাকা করে মাসোহারা পেত সে লোকটার কাছ থেকে। সে সুবাদে তাও যা একটু কথাবার্তা হতো বাপ-ব্যাটার মধ্যে। কিন্তু গেল বছর থেকে তাও বন্ধ। লোকটা এক রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে আকাশকে ডাক পাঠিয়ে ঘোষণা দিলো, 'এই দামড়া ছেলে কোথাকার! আর কতদিন বাপের পয়সা নয় ছয় করবি হ্যাঁ? আজকে থেকে তোর রাস্তা তুই দেখবি, আমি তোকে আর একটা কানাকড়িও দেবো না। বোঝা গেল?'

বস্তুত নয়-ছয় করার মতো বিস্তর টাকা পয়সা লোকটার কখনোই ছিল না। আকাশ অত্যন্ত স্বল্প আয়ের মধ্যে বড় হয়েছে। নিজের সবচাইতে কাছের এবং প্রাণের বন্ধুটির অস্বাভাবিক বিলাসবহুল জীবনযাত্রার নাচন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেও হৃদয়ের চোখে পট্টি বেঁধে ঘুরেছে সে। তবুও বাবা নামের লোকটাকে কোনোদিন সাহস করে বলতে পারেনি, 'আপনি একটা অপদার্থ! আপনার টাকার আমি.....

একদিন বলবে আকাশ। ঠিকঠিক বলবে।

আজকে ঝুমকির দিকে তাকিয়ে খুব কঠিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে।

তার আগেই টুং করে ডোরবেল বেজে উঠল। ঘড়িতে বাজে রাত সাড়ে দশটা। পিতৃবাহাদুর ব্যবসা না ছাইপাশ কী জানি করে তা শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাজে রাত এগারোটা। যেসব রাত্রি সুরাময় হয় সেসব রাত্রিতে বাড়ি ফেরে আরো পরে, বারোটার ঘর ছাড়িয়ে যায় ঘড়ির কাঁটা। অতএব এ সময়টা পিতৃবাহাদুরের ফেরার সময় না। তাহলে কে আসল এ অসময়ে?

দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে দুই ডাকাত ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। ঝুমকি আকাশের পেছন পেছন হেঁটে এসেছিল। ঝুমকিকে দেখে রুদ্র হেসে সালাম দিলো। ঝুমকি উত্তর না দিয়ে গট গট করে হেঁটে নিজের ঘরে চলে গেল। একটু আগে আকাশের সাথে হয়ে যাওয়া বাকবিতণ্ডার ঝাঁঝাল রেশটা এ আগন্তুকদের সামনে দেখানোটা যেন বড্ড জরুরি ছিল।

ঝুমকি চলে যেতেই রুদ্র ফিসফিস করে বলে উঠল, 'উনার কী হইছে? রাক্ষুসীর মতো বড় বড় চোখ মেইলা তাকাইল কেন?'

আকাশ বিরক্তি নিয়ে বলল, 'উনার যা ইচ্ছা হোক, তোদের কী হইছে? এত রাতে জ্বালাইতে আইছস ক্যান?'

সামি আর রুদ্র সোফার ওপর বসল। রুদ্র কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলে ফেলল, 'সামি আর বিভা ঠিক করেছে ওরা পালাবে।'

সামি শুধরে দিয়ে বলল, 'সামি আর বিভা নয়, শুধু সামি। বিভা এখনো পালানোর ব্যাপারে কিছু জানে না।'

আকাশের চোখদুটো আপনাআপনি কপালে ওঠে গেল। মুখ হা করে কয়েক সেকেন্ড বেআক্কেলের মতো চেয়ে রইল সে দুই বন্ধুর দিকে। তারপর কোনো রকমে বলল, 'এসবের মানে কী? পালাবে কেন ওরা? পুলিশে দৌড়াইছে নাকি ওদেরকে?'

'রাম সাগলের বাচ্চা, পুলিশে দৌড়াইব ক্যান, পালায়া বিয়া করব ওরা?' রুদ্রর বলা ছাগল শব্দটা শোনাল 'সাগল'।

'হোয়াট দ্যা ফাক! বিভার তো অভিজিতের সাথে বিয়ে!'

সামি বিরক্ত হয়ে গেল, 'এত ত্যানা পেঁচাস ক্যান, বিভার সাথে আমার কথা হয়েছে। ও আমাকে পছন্দ করে, বুঝছিস?'

এবার আকাশের ঠোঁট জোড়া দুই পাশে প্রসারিত হয়ে উজ্জ্বল একটি হাসির রেখা তৈরি করল।

সাথে হাসল ওর চোখ। মিটমিটে গলায় বলল, 'তোমরা তো মামা ঘাঘু

পাবলিক হ্যাঁ? তলে তলে এতদূর?’

রুদ্র বলল, ‘সব কথা পরে হবে। আগে আমাদের একটা প্ল্যান করতে হবে বুঝছিস? তুই এক কাজ কর, অমৃতার বাসাত কাছেই, ওকে ডাক দে। আর হৃদিরে ভিডিও কল লাগা। সবাই একসাথে বসে প্ল্যান করি।

‘অমৃতার বাসায় গেলেই পারি আমরা। আমার পিতাবাহাদুর একটু পরেই বাড়ি আসবে। মদ টদ খেয়ে আসলে তোদেরকে রাম ধোলাই দিতে পারে, সো কেটে পড়াই ভালো।’ আকাশ বলল।

যেমন বলা তেমন কাজ। খানিকক্ষণের মাঝেই কেটে পড়ল ওরা।

রাত প্রায় এগারোটার সময় অমৃতার বাসার সদর দরজায় তিন মূর্তি এসে হাজির হলো। অমৃতার আম্মি দরজা খুলল। বিস্ময় নিয়ে বলল, ‘এত রাতে? কী ব্যাপার কোনো ঝামেলা হয়নি তো?’

‘না আন্টি, ঝামেলা ঠিক না, তবে অমৃতাকে একটু দরকার ছিল।’ সামি বলল।

দরজার মুখ থেকে সরে দাঁড়িয়ে আম্মি ওদের ভেতরে আসার পথ করে দিলো। ড্রইংরুমে দীপা বসে ছিল ঠ্যাং তুলে সোফার ওপর। হাতে রিমোট নিয়ে টিভির চ্যানেল ঘোরাচ্ছে। তার পরনে একটি কালো থ্রি-কোয়ার্টার ট্রাউজার আর লাল টি শার্ট। থ্রি-কোয়ার্টার ট্রাউজারের নিচে চকচক করছে তার ফরসা পায়ের গোড়ালি। ঘরে ঢোকা মাত্র ওর ওই চকচক করা ফরসা পায়ের দিকে তিন মূর্তির চোখ গেল। তিনজনেই চোখ সরিয়ে নিল সাথে সাথে। দীপা কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত হলো না। যেমনটা ছিল ঠিক তেমন ভঙ্গিতেই অটল থেকে মুখে একটা দারুণ হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘হাই ভাইয়া বাহিনী! এত রাত্রে ডাকাতি করতে আসছ তোমরা?’

‘হুম ডাকাতিই করব বৈকী!’ আকাশ বলল একটু হালকা চালে।

‘কী ডাকাতি করবে শুনি?’ দীপার প্রশ্ন।

‘তোমাকে অন্তত নয়, এতটুকু নিশ্চিত থাকতে পার’ বলে আকাশ হাসল।

দীপা একটু নিভল মনে হয়। ততক্ষণে অমৃতা চলে এসেছে। এসেই সে দীপাকে দেখে একটা খ্যাক দিল, ‘ভিতরে যা! এখানে করছিস কী?’

‘আজিব বাত! কী করব আবার, টিভি দেখি।’ ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে ড্যাম কেয়ারভাবে বলল দীপা।

অমৃতা ওর দিকে একটা তীরের মতো চোখা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বন্ধুদের বলল,

'ভিতরে আয়, আমার ঘরে।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করতেই রুদ্র কেমন একটু ফ্যাকাশে গলায় আকাশকে বলল, 'সিরিয়াসলি? তুই দীপার সাথে ফ্লার্ট করছিলি?'

রুদ্রর কিম্ভূতমার্কা প্রশ্নের ছুরির ফলা এখন বন্ধুদের কাছে ভোঁতা হয়ে গেছে। কেউ আর আজকাল ওর অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে চমকায় না, অপ্রস্তুত হয় না। কিন্তু আজকে আকাশ ওর প্রশ্নটি শুনে বেশ ভড়কাল।

চকিতে তাকাল অমৃতার দিকে। মনে মনে বলল, 'শালা মদনের বাচ্চা, জংলি বেগুনের বাচ্চা, প্রশ্নটা করার আর টাইম পাইলি না হারামি!'

মুখে অবাক হবার ভান করে বলল, 'ধ্যাৎ! কী বলিস!'

রুদ্র দমল না। অমৃতার কাছে নালিশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'এই হারামজাদা তোর বইনের লগে ফ্লার্ট করতেছিল, ট্রাস্ট মি!'

অমৃতা একটু সরু চোখে তাকাল আকাশের দিকে। আকাশ কুঁকড়ে গেল। মনে মনে রুদ্রর গুষ্টি উদ্ধার করতে থাকল। রুদ্রর পেটে কথা থাকে না বলে তাকে জানানো হয়নি যে দীপা কয়েকদিন আগে আকাশের কাছে একরকম বলতে গেলে এপ্রোচই করেছে। সরাসরি ফোনে বলেছে যে আকাশকে তার ভালো লাগে। আকাশ ব্যাপারটা অনেক সূক্ষ্মভাবে হ্যান্ডেল করছে। অমৃতাকে কিচ্ছু জানতে দেয়নি এখনো। বন্ধুদের মধ্যে কেবল সামিই জানে ব্যাপারটা।

সামি প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'এসব আজাইরা কথা রাখ, জরুরি কথা বল। রাত বাজে কয়টা খেয়াল আছে?'

অমৃতাকে ঘটনা খুলে বলার পর প্রথমেই সে বলে বসল, 'দ্যাখ এ কাজে আমি তোদেরকে সাহায্য করতে পারব না। আমি বিভার ফ্যামিলিকে ছোটবেলা থেকে চিনি, ঠিক আছে? আমি একশ ভাগ চাই বিভা আমাদের সাথে থাকুক। কিন্তু ওর পরিবারের মানুষজনকে কষ্ট দিয়ে না। আংকেল আন্টি আমাকে অনেক বিশ্বাস করে। সরি দোস্ত, আই কান্ট হেল্প!

অমৃতাটা বেশি স্পষ্টবাদী। কাঠখোট্টা একদম। একেবারে পেশাদার উকিলের মতো করে বলল কথাগুলো। আকাশ আর রুদ্ররই সামির জন্য মায়া হতে থাকল, আর অমৃতাটা মেয়ে হয়েও অন্তরে কোনো মায়া-দয়া নেই।

'তাহলে কী করতে বলিস, তুই আমাকে?' সামি প্রশ্ন করল ভারি করুণ গলায়।

'দ্যাখ তুই যদি বিভার ভালো চাস তো এখন এসব জিনিসপাতি নিয়ে আর

ঘাঁটিস না, বন্ধুত্বটাকে বন্ধুত্বই রাখ। প্রেমটেম ভুলে যা।'

'তুই তো কখনো এতটা ব্যাকডেটেড ছিলি না অমৃতা, হঠাৎ কী হলো তোর?'

'এত কিছু জানি না। আমি জাস্ট আমার ফ্রেন্ডের ফ্যামিলির সাথে প্রতারণা করতে পারব না। তুই যদি ওর বাবা-মা আর তোর বাবা-মাকে জানিয়ে কাজটা করিস তাহলে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তোকে পালায়ে বিয়ে করার মত দুই নাম্বার কাজে মদত দেওয়া ইজ ইম্পসিবল ফর মি।'

অমৃতাকে ভীষণ ডিটারমাইন্ড মনে হলো।

'ওকে, হৃদিকে ফোন লাগা।' সামি হুকুম করল আকাশকে।

হৃদিতা ভার হওয়া মন নিয়ে মায়ের পাশে শুয়ে ছিল। ছোট ভাই হৃদয়ও সাথে আছে। তিনজনে মিলে টুকটাক গল্প করতে করতে ঘুমে চোখ লেগে এসেছিল। হাতে ধরা ছিল মোবাইল ফোন।

আকাশের ভিডিও কল মোবাইল ফোনটায় কম্পন তুলল। চমকে উঠল হৃদি। মা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। এমন ঘুমো ঘুমো আরামের রিমঝিম পরিবেশটা আকাশের বাচ্চা বরবাদ করে দিলো। হৃদি মহা বিরক্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসলো। ঝাঁপ দিয়ে বিছানায় পড়ে ভিডিও কল রিসিভ করল।

আকাশের ফোনে হৃদির অন্ধকার ঘরটা ভেসে উঠল। কিছু দেখা যাচ্ছে না

শুধু অন্ধকারে হাসছে হৃদির ডায়মন্ডের সাদা নাকফুল।

'কী সমস্যা? এত রাতে কী চাই?' হৃদির প্রশ্ন।

সামি আকাশের হাত থেকে ফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে কোনো রকমের ইন্ট্রোডাকশন ছাড়াই বলল, 'শোন আমি ঠিক করেছি বিভাকে নিয়ে পালাব, তারপর বিয়ে করব আমরা, তোর কী মতামত?'

'এমন গুণ্ডার মতো কথা বলছিস কেন, সামি?' চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করল হৃদি। অন্ধকারেও ওর পাকানো চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল যেন কোটর থেকে।

সামি অবাক গলায় বলল, 'কোনটা গুণ্ডার মতো কথা মনে হলো তোর কাছে?'

'এই যে পালিয়ে যাব, বিয়ে করব, এগুলো কোন ধরনের মামদোবাজি হ্যাঁ? জীবনটা কি সিনেমা মনে হচ্ছে?'

'এর মানে কি আমি ধরে নেব যে তুই আমার পাশে নাই?'

'অফকোর্স আমি তোর পাশে নাই, আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানে বিয়ে হয় না।'

'কে বলেছে হয় না? কোর্ট ম্যারেজ হয়।'

'মোটেও হয় না'

'তুই কিছুই জানিস না, পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে।' এটুকু বলে সামি অমৃতার দিকে ঘুরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুই তো লইয়ার, তুই বল, হৃদি যা বলছে তা কি ঠিক? আইন কী বলে?'

'বিয়ে হলেও হতে পারে স্পেশাল ম্যারেজ এক্টের আন্ডারে। আইন আছে, তবে প্রয়োগ কতখানি বলতে তো পারছি না। সঠিক ধারণা নেই আমার এ বিষয়ে।'

অমৃতার উত্তরে সামি সন্তুষ্ট হল বলে মনে হল না। জেদি গলায় বলল, 'হোয়াটেভার। আই এম গোয়িং টু ম্যারি হার এনিওয়ে, পিরিয়ড।'

ঠিক সমান তালের জেদ গলায় ঢেলে হৃদি বলল, 'না, তুই ওকে বিয়ে করবি না। এটা অসম্ভব।'

'তুই জাহান্নামে যা!' বলে সামি ভিডিও কল কাটল।

তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো, 'তোরা কেউ আছিস আমার সাথে?'

অমৃতা ধারালোভাবে বলল, 'আমার যা বলার আগেই বলে দিয়েছি।'

অমৃতার কথাটা কেমন যেন ছুরির মতো বিধলো গিয়ে মনে। ভেতরের ভাংচুরের একটা অস্ফুট ছায়া পড়ল সামির চোখে। রুদ্র আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোরা?'

আকাশ একটু ভড়কে গিয়ে তাকাল রুদ্রর দিকে। রুদ্রও। দুজনের চোখে চোখে কয়েকটা নীরব বাক্য বিনিময় হয়ে গেল।

অধৈর্য সামি একটা হতাশার নিশ্বাস ফেলে ঘরের দরজা খুলে পা বাড়াল। আকাশ লাফ দিয়ে পড়ে সামির কাঁধ চাপড়ে আহ্লাদি গলায় বলে উঠল, 'আরে! আমি তো আছিই তোর পাশে, এটা আবার জিজ্ঞাসা করা লাগে নাকি?'

রুদ্রও লাফ দিয়ে সামির অন্য পাশে চলে আসলো, বলল, 'আমার দোস্তো যদি চায় তো আমি হলিউড থেইকা জেনিফার লরেন্সরে তুইল্লা নিয়া আসমু, বিভা তো কোন ছাড়!'

মধ্য দুপুরের সূর্য উত্তপ্ত উনুনের মতো জ্বলছে। ভ্যাপসা গরম। অমৃতা দাঁড়িয়ে আছে চিফ মেট্রো পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে। তার গায়ে কালো কোট, হাতে ধরা কালো কুচকুচে গাউন। মানুষের তৈরি নিরবচ্ছিন্ন কোলাহল ভুভুজেলার মতো তীক্ষ্ণভাবে বেজে চলেছে কানে। ধুলো ভরা বাতাসে বিষাক্ত জীবাণুরা নেচে বেড়াচ্ছে মহা আনন্দে। চারপাশে নানা বয়সি লোকজন গিজগিজ করছে। এর মাঝে মহিলা এবং কোলের শিশুও আছে। তবে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে কালো কোট আর কালো গাউন গায়ে দেওয়া দো পেয়ে উকিলদের। একটা পুলিশের জিপ দাঁড়ানো সামনে। তার পেছনে হাতকড়া পরানো আসামিদের বসিয়ে রাখা হয়েছে। আসামিরা জিপ গাড়ির খাঁচার ভেতর থেকে বানরের মতো উঁকিঝুঁকি মারছে।

অমৃতা একজন মক্কেলের অপেক্ষা করছে। মক্কেলের আজ প্রথম শুনানির দিন। এন আই এক্টের মামলায় ফেঁসে যাওয়া মক্কেলটি নিতান্তই সহজ-সরল এবং বেকুব গোছের। কোর্টকাছারি এসেছে ঠিকই সময়মতো কিন্তু সিএমএম কোর্ট খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে শুনানির সময় দুপুর বারোটা। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা পঞ্চাশ বাজে। সিনিয়র তাই অমৃতাকে পাঠালেন বোকা মক্কেলটাকে খুঁজে বের করে কানে ধরে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু লোকটা এ মুহূর্তে ফোন ধরছে না। ফোন ধরলে অমৃতা লোকটার বর্তমান অবস্থানরত জায়গায় গিয়ে তাকে নিয়ে আসত। অমৃতা ফোনের পর ফোন দিতে থাকল লোকটার মোবাইলে।

জামান উকিলের সাথে দেখা হয়ে গেল। জামান উকিলের বয়স পঞ্চাশের ধারে কাছে। প্র্যাকটিস করছে অনেকদিন হলো। কিন্তু লোকে বলে সে আসলে উকিল নয়, দালাল। তার লাইসেন্সটি পর্যন্ত জাল। জাল লাইসেন্স নিয়ে সে বছরের পর বছর আইন চর্চা করে যাচ্ছে। লাইসেন্স জাল হওয়ার খবরটি ভুয়া নাকি সত্য অমৃতা তা জানে না, কিন্তু লোকটাকে সে সঙ্গত কারণেই দুই চক্ষে দেখতে পারে না। পান খেয়ে ঠোঁট থাকে সর্বদা লাল। কথা বললেই ভক ভক

করে কড়া জর্দার গন্ধ উড়ে এসে নাকে লাগে। উপরন্তু এ লোকের নজর খারাপ। কথা বলার সময় সে মেয়েদের চোখের দিকে তাকায় না, তাকায় বুকের দিকে। কঠোর ব্যক্তিত্বের, পুরুষালি চলন বলনের অমৃতাও ওই বদ নজর থেকে রেহাই পায় না। অমৃতার গা ঘেন্নায় রি রি করে। কোনদিন যে সে ঠাস করে লোকটার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় তার কোনো ঠিক নেই।

অমৃতাকে দেখেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তেলতেলে হাসি দিয়ে পান খাওয়া ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বলল, 'লার্নেড! সালাম!'

অমৃতা পানসে মুখে সালামের উত্তর দিল।

'কত নাম্বার কোর্টের মামলা?' বলতে বলতে জামান উকিলের চোখ দুটো লেজার রশ্মির মতো ধপ করে গিয়ে পড়ল অমৃতার শরীরে। অমৃতা ক্রূর চোখে তাকাল জামান উকিলের দিকে। এ দুশ্চরিত্র লোকটার গালে চড় বসানোর সে বিশেষ দিনটি কি আজ? আজ মাথাটা আগে থেকেই ফুটন্ত তেলের কড়াই হয়ে আছে।

অমৃতা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, 'তাতে আপনার বাপের কী?'

জামান উকিল এহেন উত্তর আশা করেনি। তার মুখটা মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেল। বেশ হকচকিয়েও গেছে সে। কোনো মতে বলল, 'না মানে, এমনি জানতে চাইছিলাম আর কী।'

'শুনুন, আমার এখন আপনার এমনি প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় নেই। কাটুন তাড়াতাড়ি। কেটে পড়-ন।

'এমনি' শব্দটা বলার সময় অমৃতা দুই আঙুল নেড়ে বাতাসে কোটেশন মার্ক দেখাল।

আশেপাশে দাঁড়ানো আরও কয়েকজন পরিচিত উকিল দৃশ্যটি দেখল। জামান উকিল অপ্রস্তুত হয়ে জায়গাটা ছাড়ল ঠিকই কিন্তু যেতে যেতে একটা বিষ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে গেল অমৃতার দিকে। এ দৃষ্টির অর্থ হলো, যথাসময়ে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অমৃতা জানে লোকটা যে কোনো উপায়ে প্রতিশোধ নেবে। অন্য কিছু করতে না পারলেও বদনাম রটাতে পিছপা হবে না। যা ইচ্ছে করুক গিয়ে। অমৃতা ওসব সুনাম বদনামের ধার ধারে না।

এদিকে বোকা মক্কেলের খবর নেই। মরেছে নাকি লোকটা?

স্যার ফোন করছেন মোবাইলে। মেজাজটা যে কী ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ হয়ে গেল তা বলার মতো না।

ঠিক সে সময় চোখের সামনে একটা ভারি পরিচিত মুখ দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল অমৃতা। আকাশ দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে সানগ্লাস। মাথায় ক্যাপ।

‘তুই এখানে? কী চাই?’

‘একটা কথা বলতে এসেছি।’ শুকন গলায় বলল আকাশ।

‘আজিব বাত! কথা বলার জন্য তুমি পুরান ঢাকার কোর্ট কাছারি চইলা আসছো? কাহিনি কী? মোবাইল নাই তোমার? ফোন নাই?’

‘কথাটা সামনাসামনি বলতে চাই।’

অমৃতার ঠোঁট বিরক্তিতে বাঁকা হয়ে গেল, ‘তুই জানলি কেমনে আমি এই কোর্টে আছি?’

‘তোর চেম্বারে গিয়েছিলাম, পিয়ন ছেলেটা বলল তুই এখানে।’

‘দ্যাখ আকাশ রাইট নাও আমি খুবই ব্যস্ত।’

‘ব্যস্ত বলেই কথাটা এখন বলতে চাই। যাতে তুই রিয়্যাক্ট করার সময় না পাস।’

‘কী কথা? তাড়াতাড়ি বল!’ ধমকের সুরে বলল অমৃতা।

‘তোর ছোট বোন দীপার সাথে আমার কিছু একটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।’ নিশ্বাস বন্ধ করে আকাশ বলল।

‘কী হওয়ার সম্ভাবনা আছে? কিছুইতো বুঝতে পারছি না!

‘মানে নেক্সট উইকে ওর সাথে খুব সম্ভবত আমার একটা ডেট আছে।’ অমৃতার চেহারায় কোত্থেকে যেন একটা গাঢ় ছায়া এসে পড়ল, ‘মানে কী?’ আকাশ যন্ত্রের মতো হড়বড় করে বলল, ‘আমরা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে রাত জেগে ফোনে কথা বলি।’

‘চমৎকার!’ শ্লেষের গলায় বলল অমৃতা।

‘সো আর ইউ ওকে উইথ দিজ? আফটার অল ও তোর আপন ছোট বোন।’

অমৃতা হতাশ গলায় বলল, ‘আমার কী সমস্যা? তোদের যা ইচ্ছে কর। দীপা একটা এডাল্ট মেয়ে। শি ক্যান মেক হার ওন ডিসিশন। আমার তো কিছু বলার নেই।’

ঠিক সে সময় মক্কেলটিকে দেখল অমৃতা। আকাশের পেছনে গুটিসুটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অমৃতা আকাশকে বলল, ‘তোর যদি দীপাকে পছন্দ হয় তাহলে তুই ওর

সাথে ডেট এ যেতেই পারিস। আই ডোন্ট মাইন্ড।'

বলল ঠিকই, কিন্তু সেদিন আর কোনো কাজে মন বসল না তার।

ছোট পিসিমা ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় শব্দ করে নাক ডাকছে। ধীর লয়ে ওঠানামা করছে তার ভুঁড়িওয়ালা পেট। বিভা তার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে ছিল। ঘরের বাতি জ্বলছে, পাশের ঘর থেকে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। এত হইচইয়ের মধ্যে একটা মানুষ কী করে অমন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে?

আজ বিকেলে বিভার আশীর্বাদের অনুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নভাবেই সারা হয়ে গেছে। আগামীকাল বিয়ে। ওদের সতেরশ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট এখন গিজগিজ করছে আত্মীয়স্বজনে। ফ্লোরিং করার পরেও শোবার জায়গায় টান পড়ে গেছে। অভিজিৎ উঠেছে কলাবাগানে তার এক বন্ধুর বাসায়। তার পরিবারের কেউ কেউ আবার হোটেল ভাড়া করেছে। কলকাতা থেকে আরো আত্মীয়স্বজন এসে পৌঁছুবে আগামী কাল।

'কীরে তুই অমন হা করে কী দেখছিস?' মা কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বিভা খেয়াল করেনি।

'ঘুমোব কোথায় চিন্তা করছি।'

'তুই আজকে আমার সাথে ঘুমা।' বলে মা বিভার মাথায় আলতো করে হাত রাখল।

'কেন? তোমার সাথে শুয়ে আর কী হবে? তোমরা তো আমাকে দেশ ছাড়াই করে দিচ্ছ। বের করে দিচ্ছ তোমাদের জীবন থেকে চিরতরে। এখন আর এসব ঢং করে তো কোনো লাভ নাই।'

মায়ের চোখ দুটো একটু জল টলমল করে উঠল বিভার কথা শুনে।

'সব মেয়েকেই তো এক সময় বাপের ঘর ছেড়ে যেতে হয় রে।'

'সে সময়টা একটু পরে আসলেও তো পারত মা? কেন এই তাড়াহুড়া?'

মা বিভার পাশে এসে বসল। একটু ভয়ার্ত গলায় বলল, 'হ্যারে, তোর অভিজিতকে পছন্দ হয়নি? এমন সোনার টুকরো ছেলে, কী অমায়িক আর ভদ্র ব্যবহার! এমন একটা ফার্স্ট ক্লাস ছেলেকে নিয়ে তোর এত কীসের সংশয়?

বিভা মায়ের দিকে করুণ চোখে তাকাল, বলতে চাইল, আমার তো অমন ফার্স্ট ক্লাস ভদ্র ছেলে সইবে না মা, আমার যে এক ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে আর উচ্ছন্ন ছেলেকে পছন্দ! আমার যে মস্ত এক পাগল চাই সারাটা জীবনভর পাগলামো করার জন্য! ভদ্র, সভ্য মানুষ দিয়ে আমি কী করব?

ভাবল এক কথা আর বলল সম্পূর্ণ অন্য কথা, 'সংশয় নেই, কীসের সংশয়?'

'দেখবি, তুই খুব সুখী হবি ওর সাথে।'

'তোমরা সুখী হলেই আমি সুখী।'

মোবাইলটা ভাইব্রেট হচ্ছে। আকাশের ফোন। বিভা সেলফোন হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে আসলো।

হ্যালো বলতেই আকাশ ওপাশ থেকে অনেকটা চিৎকার করে বলে উঠল, 'এই ডাইনি বুড়ি, তুই আমার ফ্রেন্ডের ওপর বানটান কিছু মারছস নাকি হ্যাঁ? সে তো তোর নামে বসে বসে মালা জপ করতেছে।'

'এমনভাবে বলছিস যেন ওই তোর সব, আমি বুঝি কেউ না?'

'আপাতত তুই আমার কেউ না, আপাতত আমি হলাম পাত্রপক্ষ। মানে বরপক্ষ। আর তুই হইলি আমার হবু ভাবি।' কথাটা শেষ করেই আকাশ হো হো করে হেসে উঠল।

'কী যা তা বলছিস!'

'শোন, আমরা প্ল্যান করে ফেলছি।'

'কীসের প্ল্যান?'

'আজকে রাতে তোকে আমরা কিডন্যাপ করব!' আকাশের গলায় আনন্দের হুড়োহুড়ি। উল্লাস যেন উপচে উপচে পড়ছে তার কণ্ঠ বেয়ে।

কী অসম্ভব এবং অবাস্তব একটা কথা! তবুও বিভা হেসে ফেলল। এতক্ষণের বুকচাপা হাহাকারটা মনের ঘুলঘুলির ফাঁক গলে ফুঁস করে বেরিয়ে গেল। এ পাগলগুলাকে ছাড়া সে থাকবে কী করে কলকাতা গিয়ে? কী করে কাটবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এদেরকে না দেখে, এদের কথা না শুনে? মনে হতেই বিভা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিলো, বলল, 'আবোল-তাবোল বকিস না।'

'মোটেও আবোল-তাবোল না। এখন কটা বাজে ঘড়িতে দ্যাখ। সাড়ে এগারোটা। আমরা দেড়টার দিকে তোর বাসার নিচে আসছি। তুই সুযোগ বুঝে

টুপ করে নেমে পড়বি নিচে। ততক্ষণে তোর বাসার সব লোকজন ঘুমিয়ে যাবে।'

'কেউ ঘুমোবে না, সবাই বিয়ে বাড়িতে আমোদ করতে এসেছে, ঘুমোতে নয়।'

'তুই তৈরি থাকিস, তোকে বের করার দায়িত্ব আমার।'

'বের হয়ে হবেটা কী?'

'কী আবার হবে, বের হওয়ার মানে হচ্ছে তুই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিস, এ বিয়ে তুই করবি না।'

'কিন্তু আকাশ...

'কোনো কিন্তু নয়, আমরা আসছি!' আকাশ ফোন ছাড়ল।

বিভা টের পেল তার বুকের ভেতর কেউ দ্রিম দ্রিম শব্দে ড্রাম পেটাচ্ছে। মনে হচ্ছে দুশ্চিন্তায় সে মরে যাবে। নির্ঘাৎ মরে যাবে!

তখন রাত দুপুর। বয়স্করা মোটামোটি ঘুমের কাছাকাছি চলে গেলেও ড্রইং রুমে বিভার কয়েকটা কমবয়সি কাজিন ফিসফিস করে চাপা স্বরে গল্প করছিল। আকাশ বলেছে দরজা না খুললে সে মাঝরাত্তিরে ডোর বেল বাজিয়ে সবার ঘুম ভেঙে দেবে। অতএব বিভা যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পায়ে পায়ে এসে সদর দরজা খুলে রাখল ওরা এসে পৌঁছনোর একটু আগেই। ফ্লোরে শতরঞ্জি পেতে শুয়ে থাকা বছর পনেরোর এক কাজিন ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, 'কে এসেছে দিদি? এত রাতে?'

'কেউ না, তোরা ঘুমা, আমি একটু ছাদে যাচ্ছি, ঘুম আসছে না তাই।'

'আমরাও যাব, আমাদেরও ঘুম আসছে না।

'মরণ!' এখন এদের ছাদে যাওয়ার বায়না নিয়ে করবে কী বিভা? ঠিক সে সময় দরজার সামনে আকাশ আর রুদ্রকে দেখা গেল। ডিম লাইটের আলোয় দুই ডাকাতের মুখের হাসি উপচে উপচে পড়ছে।

বিভার মেজাজটা এত বেশি খারাপ হয়ে গেল যে, রাগে দুঃখে সে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলল।

'কে এসেছে এত রাতে?' ভীষণ ভয়ঙ্কর শোনাল মায়ের ভয় পাওয়া কণ্ঠস্বরটা বিভার কানে।

চমকে ওঠে তাকাল সে মায়ের দিকে। মা বসার ঘরের বাতি জ্বালালো। দুই আগন্তুককে দেখতে পেয়ে বলল, 'ওমা, তোমরা এই অসময়ে? সব ঠিক আছে তো?'

রুদ্র একটু ভয় পেয়ে গেছে।

আকাশ একটুও বেসামাল না হয়ে রিহার্সাল দেওয়া লেকচার ছাড়ার মতো বলল, 'কিচ্ছু ঠিক নেই আন্টি! বিভাকে আপনারা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন, দেশছাড়া করে দিচ্ছেন এটা কি কিছু ঠিক থাকার লক্ষণ?'

'সব মেয়েকেই একদিন দূরে চলে যেতে হয়।'

এ বাক্যটা মায়ের এখন মুখস্ত হয়ে গেছে। কারণে অকারণে বারেবারে সুযোগ পেলেই সে ডায়লগটা ছাড়ছে। এখনো ফাঁক বুঝে ছেড়ে দিলো।

'সে তো বুঝেছি আন্টি, কিন্তু বিভার শোকে তো আমাদের আরেক বান্ধবী প্রায় মরতে বসেছে।'

মা চমকে উঠল, 'সে কী? কার কী হয়েছে?'

আকাশ অত্যন্ত করুণ গলায় বলল, 'ওই যে হৃদি, হৃদি তো মাথা ঘুরে পড়ে গেছে বাথরুমে আধঘণ্টা আগে। জ্ঞান ফেরার পর থেকে শুধু বিভার নাম ধরে ডাকছে।'

বান্দরটার অভিনয় দেখে বিভার হাসি পেয়ে গেল। দাঁত, ঠোঁট চেপে, মুখ খিঁচিয়ে অনেক কষ্টে হাসি চাপতে লাগল সে।

মা বলল, 'সে কী কাণ্ড! এখন কেমন আছে হৃদি?'

'বিভাকে এক নজর দেখতে না পেলে মনে হয় মরেই যাবে!'

আকাশের অবস্থা দেখে মনে হলো সে কেঁদে দেবে এক্ষুনি।

এবার রুদ্রও যোগ করল, 'জি আন্টি, অবস্থা খুবই সিরিয়াস, বিভাকে যেতে হবে আমাদের সাথে।'

বিভার মা বিপন্ন গলায় বলল, 'এত রাতে বিয়ের কনে ঘরের বাইরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'জীবন মরণ প্রসঙ্গ আন্টি! আপনিই চিন্তা করেন, হৃদির যদি কিছু হয়...'

বিভা মায়ের দিকে তাকিয়ে মরিয়া হয়ে বলল, 'মা প্লিজ, তুমি আর বারণ করো না, আমি হৃদিকে একটু দেখে আসি।'

মা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ গলায় বলল, 'এত রাতে...'

'বারবার এত রাতে এত রাতে করছ কেন? মানুষের অসুখ-বিসুখ কি রাত দিন মেনে আসে?'

'আচ্ছা যা, রাতে তাহলে আর ফেরার দরকার নাই, সকালে চলে আসিস সময় মতো। আমি হৃদির আম্মার সাথে ফোনে কথা বলে খবর নিচ্ছি, তুই যা।

কীভাবে যাবি? গাড়ি আছে?'

'জি আন্টি গাড়ি আছে আমাদের সাথে।' রুদ্র বলল।

হৃদির আম্মাকে ফোন করার কথা শুনে বিভার গলা শুকিয়ে গেল। কিন্তু আকাশের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সেদিকেও সিস্টেম করতে ভোলেনি শয়তানগুলো। বিভা আর জামা পাল্টাল না। লং স্কার্ট, টপ আর স্কার্ফ পরা ছিল। হাতে ব্যাগ আর পায়ে চপ্পল লাগিয়ে বেরিয়ে আসলো বাসা থেকে।

ফিসফিস করে বলল, 'হৃদির আম্মাকে ফোন করবে তো মা, ধরা পড়ে গেলে?

'হৃদিকে বলা আছে, ও ওর মায়ের গলা নকল করতে পারে জানিস না? ফোন হৃদিই রিসিভ করবে। ওই ছেমড়ি তো কোনো হেল্পই করবে না, অনেক কষ্টে এটুকু করতে রাজি করিয়েছি।'

'কেন? হেল্প করতে চায় না কেন?' বিভার প্রশ্ন।

'কী জানি! তোদের প্রেম দেখে মনে হয় হিংসে হচ্ছে।' বলে হাসল আকাশ।

'হ, আরো কিছু।' বিভা উড়িয়ে দিলো কথাটা।

লিফট নিচে নামা পর্যন্ত কেউ আর কোনো কথা বলল না। যেন টু শব্দটি করলে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। মাকে মিথ্যে বলায় বিভার মনটা একটু কেমন খচখচ করছিল। শান্তি পাচ্ছিল না একদম। কিন্তু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে হলেও আর কিছু সময় অন্তত বন্ধুদের সান্নিধ্যে থাকার লোভটা সামলাতে পারল না সে।

নিচে নেমে মুক্ত বাতাসে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আনন্দের চোটে তিনজনে সমস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠল। যেন এমন মুক্তির স্বাদ এ জীবনে এর আগে কখনো পায়নি ওরা। খুশির চোটে রুদ্র বিভাকে প্রায় শূন্যে তুলে ধরে একপাক ঘুরেও ফেলল।

লাল মার্সিডিস বেঞ্চের দরজা খুলে সামি বেরিয়ে আসলো। তিন বন্ধুর উল্লাস দেখতে গাড়িতে হেলান দিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে।

বিভা তাকাল। চারটা চোখ অন্ধকারেও চুম্বকের মতো আটকাল নিমেষের মাঝে। দুজনের মাঝে দূরত্ব ছিল প্রায় দশ কদম। সেকেন্ডের ভেতরে ওই দূরত্বটুকু ঝড়ের বেগে অতিক্রম করল বিভা। সামি দু হাত প্রসারিত করে বিভাকে কাছে টেনে নিল, জড়িয়ে ধরে নিজের হৃদপিণ্ডের সাথে পিষে ফেলতে ফেলতে প্রগাঢ় গলায় বলল, 'এবার তোকে আর ছাড়ছি না!'

বিভার সর্বাঙ্গে তখন সামির হৃদয়ের স্পন্দন। নিশ্বাস ভারী।

আবেগরুদ্ধ গলায় সে বলল, 'আমিও যাচ্ছি না আর কোথাও। আমার আর কোথাও যাবার নেই।'

শেষের বাক্যটা সামির ভেতর বাহির সমস্তটা কেমন ওলটপালট করে দিলো। সত্যিই তো, বিভা আর কোথায় যাবে? পৃথিবীটা ঠিক মাঝখান থেকে দুভাগ হয়ে গেলেও বিভা ঠিক এমনিভাবেই দৌড়ে এসে সামির বুকে পড়বে। বিভার জায়গা যে এই ধুলো মাটির পৃথিবীতে নয়। বিভার জায়গা তার বুকের মাঝে, হৃদয়ের মধ্যিখানে।

আকাশ আর রুদ্র রাস্তার ঘোলাটে ফ্লুরোসেন্ট আলোয় গাড়লের মতো কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল হা করে। যেন সিনেমা দেখছে।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটার পর রুদ্র আকাশের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কান্না কান্না গলায় বলল, 'দোস্ত! আয় আমার কাছে আয়, মিলন দেইখা আমার চক্ষে পানি চইলা আসছে, আমারে তো কেউ এমন কইরা বুকে টাইনা নিল না আজ পর্যন্ত, হায় কপাল!'

আকাশ রুদ্রকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'থাক দোস্ত, মন খারাপ করিস না, সবার কপালে কি আর সব হয়? আমি আছি তোর পাশে।' এটুকু বলে আকাশ সামির দিকে চোরা চোখে তাকিয়ে অবিকল সামির গলা নকল করে বলল, 'এবার তোকে আর ছাড়ছি না।'

রুদ্রও ঠিক বিভার মতো মেয়েলি গলায় বলল, 'আমিও যাচ্ছি না আর কোথথাও। আমার আর কোথাও যাবার নেই।'

সামি আর বিভা হেসে ফেলল ওদের নাটক দেখে। মনে মনে বুঝল ওরা, আজ থেকে শুরু করে বহু দিন পর্যন্ত এই উপহাসের ঠ্যালা সামলাতে হবে। বিচ্ছুগুলো যে ওই সময়টায় সামনে দণ্ডায়মান ছিল তা দুজনেই বেমালুম ভুলে বসেছিল।

গাড়ির ভেতর বিভার জন্য আরো মজার একটা চমক অপেক্ষা করছিল। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই চমকটা দেখে একেবারে উল্লাসে ফেটে পড়ল সে। পেছনের সিটে হেলান দিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে নবাবি চালে বসে আছে তার দুই বান্ধবী, হৃদি আর অমৃতা। বিভাকে দেখে সুর করে দুজনে একসাথে বলে উঠল, 'হ্যালো! মিসেস অভিজিৎ!'

বিভা ওদের দেখে খুশিতে আটখানা হলো ঠিকই, কিন্তু 'মিসেস অভিজিৎ'

ডাকটা বড্ড বেশি কানে লাগল।

পেছনে চারজন গাদাগাদি করে বসল। অমৃতা, আকাশ, হৃদি আর বিভা। ড্রাইভিং সিটে সামি আর তার পাশে রুদ্র।

এমনি করে কতদিন কত পথ একসাথে চলেছে ওরা। এর আগে সামির ছিল একটা ছাই রঙের নোয়া গাড়ি। বছর দুয়েক আগে, সে গাড়িতে করে ওরা গিয়েছিল বান্দরবান। তারপর সে বছরই শীতে গেল সিলেট, অমৃতার দাদাবাড়ি। এ মানুষগুলোর গায়ে গা ঘেঁষে, মনে মন রেখে, কত কত সময় স্রোতের মতো কেটে গেছে। অভিজিতের সাথে কাল বিয়েটা যদি তার হয়ে যায়, তাহলে পরশু দিন নির্ঘাৎ উড়াল দিতে হবে কলকাতায়। তারপর... তারপর আবার কি কখনো এই মানুষগুলোর সাথে ঠিক এমনভাবে...। ভাবতে গিয়ে বিভার দম বন্ধ হয়ে আসলো।

সে আলগা একটা নিশ্বাস ফেলে পাশে বসে থাকা হৃদিকে অভিমানী গলায় বলল, 'খুব যে ডাকলি আমায় মিসেস অভিজিৎ? আমি চলে গেলে আমাকে মিস করবি না বুঝি?'

হৃদি ঘাড়টা জানালার দিকে ফিরিয়ে বলল, 'নাহ! মিস করব কেন? সবাইকেই নিজ নিজ জায়গায় সেটেল হতে হবে তাই না? ইমোশনকে প্রশ্রয় দিলেতো চলবে না!'

হৃদির কথা শুনে বিভার টানা টানা ডাগর চোখ দুটোতে জল টলমল করে উঠল। বাকি পথটায় কেউ আর কোনো কথা বলল না। সবাই কেমন নিজ নিজ ভাবনায় ডুব দিয়ে রইল।

রাত ঠিক দু'টায়, উত্তরা সামির বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা। ভেতরে ঢুকে বোঝা গেল বাড়ির সব মানুষ ঘুমে কুপোকাত। কাজের লোকগুলোও জেগে নেই।

ঘরে ঢোকা মাত্র রুদ্র, অমৃতা আর হৃদির দিকে তাকিয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ গলায় প্রশ্ন করল, আচ্ছা তোরা কি 'আমার আর কোথাও যাবার নেই' সিনেমাটা দেখেছিস?'

অমৃতা অবাক গলায় বলল, 'নাতো!'

রুদ্র একগাল হাসল, 'দাঁড়া এক্ষুনি দেখাচ্ছি।'

যে বলা সে কাজ। আকাশও যেন তৈরি ছিল। রুদ্র 'অ্যাকশন' শব্দটা উচ্চারণ করার সাথেসাথে আকাশ স্লো মোশনে রুদ্রর দিকে দৌড়ে আসতে

থাকল। রুদ্র 'লা লা লা' করে মুখ দিয়ে মিউজিক ছাড়তে লাগল। আকাশের স্লো মোশন দৌড় দেখে হৃদি আর অমৃতা হেসে কুটিকুটি হয়ে গেল। সামি ঘটনা বুঝতে পেরে বিরক্তিতে একবার তাকাল আকাশের দিকে, তারপর নিঃশব্দে হেঁটে বারান্দায় চলে গেল।

বিভার বুকে তখনও অভিমানের হালকা পালকটা সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। রুদ্র আর আকাশের কাণ্ড দেখে প্রথমে হেসে দিলেও সামি ঘর ছেড়ে যাবার পর একটু গম্ভীর হয়ে গেল সে।

আকাশ তখন দৌড়ে গিয়ে রুদ্রর বুকে পড়েছে। রুদ্র আকাশকে জড়িয়ে ধরে ড্রামাটিক গলায় বলছে, 'এবার তোকে আর ছাড়ছি না!'

আকাশ বিভার গলার স্বর নকল করে বলছে, 'আমিও আর কোথাও যাচ্ছি না, আমার আর কোথাও যাবার নেই!'

বিভা ঘরটা ছাড়ল। ছাড়ার সময় তার বন্ধুদের অট্টহাসির শব্দ কানে এসে লাগছিল। ওরা কৌতুক করতে ভালোবাসে সে জানে। কিন্তু আজ বিভার জীবনের এমন এক ঘোর টানাপোড়েনের সামনে দাঁড়িয়ে অমন উপহাসের হাসি না হাসলেও তো পারত!

বিভা ঘর থেকে বেরোনো মাত্র অমৃতার মুখের হাসি ভস করে পালাল। সে ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, ঘটনা কি সত্য? ওরা কি আসলেই সিরিয়াস?'

'দে আর ড্যাম সিরিয়াস। আমার তো এখন ভয়ই লাগছে, মনে হচ্ছে এ দুইটার কপালে দুঃখ আছে!' আকাশ বলল, চিন্তিত গলায়।

হৃদি বলল, চল আমরা ওদের দুজনকে বুঝিয়ে বলি, যে ওরা যা করছে ভুল করছে।'

'বুঝিয়ে এখন কোনো লাভ নেই, এখন ওদের কিছু বোঝার স্টেজ না।' রুদ্র বলল।

'আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়, কোনো একভাবে অভিজিতের সাথে বিভার বিয়েটা বানচাল করে দেই। সামির সাথে কী হবে না হবে তা পরে দেখা যাবে।' আকাশ বলল।

'সেটা পারলেতো আর কথাই ছিল না। এ বিয়ার জন্য তো আমরাও বিভাকে হারাচ্ছি তাই না? কোত্থেকে কোন কোলকাইত্তা বাবু ধইরা নিয়ে আসছে, ক্যান বাংলাদেশে কি পোলা নাই? অমৃতা বলল ঝাঁঝাল গলায়।

'আমরা এ বিয়ে ভেঙে দেই চল!' বলল আকাশ।

'কীভাবে?' হৃদির প্রশ্ন।

'ওর বাবা মাকে গিয়ে বলি অভিজিতের চরিত্র খারাপ।' রুদ্রর অপিনিয়ন। বিদ্রুপের হাসি হাসল অমৃতা, 'তুমি বললা আর উনারা তোমারে কোলে নিয়ে আদর কইরে বিশ্বাস করল। কত শখ!'

'প্রমাণ দিব প্রয়োজনে!'

'কী প্রমাণ?'

রুদ্র গালে হাত দিয়ে হুম হাম করে আকাশ-পাতাল ভাবল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'হৃদি, শোন অভিজিৎকে ফুসলায়ে ফাসলায়ে একটা ইন্টিমেট ছবি তুলে ফেলতে পারবি না? ওই ছবি দেখাব বিভার ফ্যামিলিকে।'

হৃদি চোখ কপালে তুলে বলল, 'ইয়া আল্লাহ্! কী বলে! আমার একটা বদনাম হয়ে যাবে না ওইরকম ছবি তুললে? পরে তো আমার বিয়ে হবে না!'

'আরে তোর বিয়ে নিয়ে ভাবিস কেন? তুই কাউকে না পাইলে আমিতো আছিই।'

হৃদি একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওহ রুদ্র! ইউ আর আ লাইফ সেভার!'

আকাশ বলল, 'জি না, আমি হৃদির ব্যাকআপ। ওর সাথে ডিল হয়ে গেছে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত যদি ও সিঙ্গেল থাকে, বর না পায়, তাহলে ও আমাকে বিয়ে করবে।

শুনে রুদ্রর ক্যাটস আই চোখ সংকুচিত হয়ে গোল মার্বেল হয়ে গেল। হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'কী? এত বড় প্রতারণা? হৃদি তুই তো ভয়ানক মিথ্যাবাদী? তুই আমাদের সাথে ডাবল প্লে করছিস?'

হৃদিকে দেখে মনে হলো সে জীবন মরণ সমস্যায় পড়ে গেছে। সে আঁকুপাঁকু হয়ে বলল, 'আচ্ছা যা, তোরা দুইজনই আমার ব্যাকআপ।'

আকাশ সজোরে মাথা নাড়ল, 'না না এসব মামদোবাজি চলবে না, তোর যে কোনো একজন কে চুজ করতে হবে।

'একজন অমৃতাকে ব্যাকআপ বানা।' নিরুপায় হয়ে বলল হৃদি।

অমৃতা ফোঁস করে উঠল, 'আমি জীবনেও বিয়ে করব না, আমার সাথে এসব ফালতু কথা বইলা লাভ নাই। শুনলে গা জ্বালা করে।'

আকাশ চিমটি কাটল, 'এবনরমাল লোকজনের নরমাল কথাবার্তা শুনলে ওরকম গা জ্বালা করে, এটা স্বাভাবিক।

'এখন কী এসব ফালতু প্যাঁচাল বাদ দিয়ে আসল আলোচনায় আসবা তোমরা?' অমৃতা বলল, গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে।

'হুম আসল আলোচনা' বলে আকাশ ঘরের ভেতর চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে লাগল। অন্যরাও ভাবতে লাগল, কপালে ভাঁজ ফেলে, ভ্রু কুঁচকে গভীর ভাবনা।

বিভার বুকটা কেমন খালি খালি লাগছিল। বদ্ধ বাতাসের মতো একটা হাহাকার ঘুরপাক খাচ্ছিল মনের ভেতর। লিভিংরুমের সাথে লাগোয়া বারান্দাটায় সামি দাঁড়িয়ে ছিল। ওর ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটের ওঠানামা।

'কী ভাবছিস?' সামির পেছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল বিভা।

সামি বিভার দিকে তাকাল। বাড়ির পেছনদিকে বলে বারান্দাটায় রাস্তার আলো আসে না। এ মুহূর্তে তাই চারপাশ ঘুটঘুটি অন্ধকার। মাঝরাতের হাওয়ায় হালকা স্বস্তির ছোঁয়া। দিনের বেলার আগুনের মতো গরমটা এখন আর অনুভূত হচ্ছে না।

'তোকে ভাবছিলাম।' সামি অকপট উত্তর দিলো।

বিভা একটু কাঁপল ভেতরে ভেতরে। তাদের ভেতরে ভালোবাসা থাকলেও প্রেম কখনো প্রকাশ্য ছিল না। অনেক অনেক রাত বিভা নির্ঘুম চোখে জাগনা থেকে সামির কথা ভেবেছে লুকিয়ে লুকিয়ে। সামিকে কখনো সেসব রাতের কথা বলতে পারবে এমন স্বপ্ন দেখতেও ভয় পেত। আজ তার সে ভাবনা ঘরের গোপন দেবতাটি এমন নিঝুম রাত্তিরে একলা দাঁড়িয়ে গভীরভাবে তার কথা ভাবছে, এটা জানতে পেরে নিষিদ্ধ এক ভালোলাগায় তার সারা গা শিউরে উঠল।

সে মোহাচ্ছন্ন গলায় বলল, 'কী ভাবছিস আমার কথা?'

'ভাবছি তোকে যে আমি ভালোবাসি, তোকে যে আমার চাই, এ সত্যটা উপলব্ধি করতে এত সময় লেগে গেল কেন? আরো আগে কেন জানলাম না? আগে থেকে জানলে তোর এসব বিয়েশাদির ঝক্কি ঝামেলা আসতই না। ফ্যামিলির মানুষজনকে আগেই জানিয়ে দিতাম।'

'আমি তো জানতাম, অনেক অনেক দিন আগে থেকেই জানতাম।'

'কী জানতি?'

বিভা সামির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে বলল, 'জানতাম, তুই আমার!'

'তাহলে আগে বলিসনি কেন কখনো?'

'বলে লাভ নেই যে!' বিভার গলার স্বরটা কেমন অন্যরকম শোনাচ্ছিল।

'লাভ নেই মানে?'

'আমার বাবা মা কোনোদিন তোকে মেনে নেবে না।'

'কেন নেবে না? কী নেই আমার? তুই জানিস আমি কার ছেলে?'

বিভা শ্লেষের হাসি হাসল, 'আমি জানি তুই অনেক ক্ষমতাবান বাবার ছেলে। আমার মতো একশটা বিভাকে তুই পয়সা দিয়ে কিনতে পারবি। কিন্তু সামি ঝামেলাটা যে অন্য জায়গায়। ঝামেলাটা হচ্ছে তুই মুসলমান আর আমি হিন্দু। আমার যদি তোর কাছে আসতে হয়, তাহলে আমার পরিবার, বংশ, ধর্ম সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তারপর আসতে হবে।'

সামি হাতের আধখাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অকস্মাৎ বিভার দুবাহু শক্ত করে চেপে ধরল, ভূতগ্রস্তের মতো বলল, 'পারবি না তুই? পারবি না সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে আসতে চিরতরে?'

'তুই পারবি? নিজের বাবা মাকে ছেড়ে আমার সাথে অন্য কোথাও চলে যেতে? এই চেনা পৃথিবী ছেড়ে, অনেক দূরে?'

সামি ঘোরলাগা গলায় বলল, 'সব পারব বিভা, তোর জন্য আমি সব পারব!'

সেলফোনটা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বেজে উঠল ঝনঝন করে।

সামি আর বিভা দুজনেই একটু চমকে উঠল। চমকালো বুঝি মাঝরাত্তিরের গুমোট হাওয়াটাও।

সামি পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখল। আননোন নাম্বার। কয়েক সেকেন্ড একটু ইতস্তত করে শেষমেশ রিসিভ বাটন প্রেস করল। ওপাশ থেকে একটা ভরাট গলা বলল, 'হ্যালো সামি বলছেন?'

'বলছি।'

ও পাশের গলাটা একটু বিরতি নিল। নীরব বিরক্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত কাটল।

'আমি অভিজিৎ বলছি।'

বিস্ময়ে সামির ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁকা হয়ে গেল।

'সরি, বুঝতে পারিনি, কে বলছেন?'

'অভিজিৎ রয়।'

সামি সন্তর্পণে তাকাল একবার বিভার দিকে। বিভার চোখে প্রশ্ন।

'কী চাই?' একটু রুড শোনাল সামির প্রশ্নটা।

'বিভা কি আপনার সাথে?'

পরিস্থিতি সমঝে চলার ছেলে সামি কখনোই না। আজকেও ব্যতিক্রম হলো না। সে বুক চিতিয়ে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, আমার সাথে।'

আবার চুপ করে গেল অভিজিৎ। শুধু নিশ্বাসের শব্দ। অধৈর্য সামি প্রশ্ন করল, 'কেন বলুন তো? ইজ এভরিথিং অলরাইট?'

'এভরিথিং ওয়াজ এবসোলুটলি অলরাইট বাট সাডেনলি সামথিং কেইম আপ।'

'কী হয়েছে?' সামির গলায় উৎকণ্ঠা

'দেখুন নিজের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা আমাদের সবার আছে। সিদ্ধান্তগুলো শুধু সময়মতো নিতে হয়। একটু এদিক-সেদিক হয়ে গেলেই সারা জীবনভর পস্তাতে হয়।

'কী হয়েছে বলুনতো? হোয়াই দ্যা হেল আর ইউ লেকচারিং অন মি?'

বিভা এবার সচকিত হয়ে চাপা গলায় বলল, 'কার সাথে এমন ক্যাট ক্যাট করে কথা বলছিস?'

সামি হাত দেখিয়ে ইশারায় বিভাকে থামতে বলল। ততক্ষণে বারান্দায় বাকি বন্ধুরা এক এক করে এসে হাজির হচ্ছে। সবাই কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে সামির দিকে।

অভিজিৎ বলল, 'আপনার যে বিভার সাথে অ্যাফেয়ার আছে এ কথাটা সরাসরি আপনারা আমাকে বললেইতো পারতেন। লোক মারফত খবর পাঠানোর তো দরকার ছিল না।'

ভীষণ চমকাল সামি। মুখ দিয়ে বলার মতো তাৎক্ষণিক কোনো কথা খুঁজে পেল না। গোঙানির মতো শুধু একটা অস্ফুট শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'হ্যাঁ?' অভিজিত বলে চলল, 'বিভা যদি আমাকে প্রথম দিনই ব্যাপারটা বলে দিত, তবে তো ঘটনা এতদূর এগোত না। আমি জোরজার করে তো আর বিয়ে বসতে চাইতাম না, তাই না?'

'কিন্তু আপনি... আপনি কী করে জানলেন?'

'সে কথা না হয় থাক, আপনি কি ফোনটা একটু বিভাবরীকে দেবেন? কয়েকটা কথা ছিল।'

সামি যন্ত্রের মতো মোবাইলটা এগিয়ে দিলো বিভার দিকে। সে নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে।

বিভার হাত কাঁপছিল। কাঁপছিল গলা। সে ধারণা করতে পেরেছে ফোনটা কার। কোনো রকমে 'হ্যালো' বলল সে ফোনটা কানে নিয়ে।

'আপনার প্রতি আমার কোনো রাগ নেই, এ কথাটা বললে একটা ভীষণ মিথ্যা বলা হবে। এ মুহূর্তে আপনার প্রতি আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। কেন এমনিভাবে ছিনিমিনি খেললেন আপনি আমাকে নিয়ে আর আমার পরিবারকে নিয়ে? কেন এত বড় প্রতারণা করলেন?'

বিভা স্তম্ভিত, শঙ্কিত এবং পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক।

'সে যাই হোক, শুনুন কাল সকালে আমি আপনার বাবাকে বলে দেবো যে বিয়েটা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না সে বিষয়ে আমি মুখ খুলব না, যা বলার আপনিই বলবেন।

বিভাকে যেন বোবা ভূতে পেয়েছে। তার জিব নড়ছে না এক বিন্দুও। কথারা সব হরণ হয়ে গিয়েছে। বুকটায় বড্ড তোলপাড়।

'আর জেনে রাখুন আমি আপনাকে কোনো দিন ক্ষমা করব না।'

ফোনের লাইন কেটে গেল। হৃদি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বিভার পিঠ জড়িয়ে ধরে বলল, 'কী হয়েছে? এমন করছিস কেন?'

'অভিজিৎকে কে যেন বলে দিয়েছে আমার আর সামির কথা। সে বলেছে আমাকে বিয়ে করবে না।' অদ্ভুত ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল বিভা।

কথাটা শুনল সবাই কিন্তু কেউ টু শব্দটি করল না। নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত নেই।

তারপর হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আকস্মিক এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, উচ্ছ্বাস ভরা গলায় রুদ্র বলে উঠল, 'ইয়েস! ইয়েস! এর চেয়ে ভালো খবর আর হতেই পারে না!'

কথাটা যেন টনিকের মতো কাজ করল সবার ভেতরে। অজান্তেই বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে গেল সবার। আকাশ খুশিতে মাখামাখি গলায় বলল, 'যাক, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ বিপদ কাটায় দিছে। বিভাকে এখন আর আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না।

বিভা তখনো একটা কেমন ঘোরের ভেতর ছিল। এই ধরাধামে তার দেহ আছে, কিন্তু মন যেন অন্য কোথাও।

সামি কিছুটা সন্দিহান হয়ে বলল, 'কিন্তু অভিজিৎকে বিষয়টা জানাল কে? এটাইতো আমার মাথায় ঢুকছে না।'

রুদ্র বলল, 'আরে দূর, কে জানিয়েছে কে জানায়নি এসব নিয়ে পরে চিন্তা করলেও হবে। এখনতো মামা পার্টি হবে! পার্টি!'

অমৃতাও সায় দিলো রুদ্রর কথায়, 'একজেক্টলি, ওই ব্যাটা কেমনে জেনেছে সেই ইনভেস্টিগেশন আমরা পরে করব, এখন আনন্দ করার সময়, বিভাবরী ইজ ব্যাক!'

এরপর বিভা আর সামিকে টেনেটুনে ঘরের ভেতর নিয়ে আসলো ওরা।

কিছুক্ষণ বাদে, বন্ধুদের হইহই রইরই এর উত্তাপে বিভারও বুকটা একটু একটু হালকা লাগতে শুরু করল। মনে হলো যেন বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেছে। যদিও কিছুই স্পষ্টভাবে ভাবতে পারছে না সে আপাতত। অভিজিৎ যা বলল তা যদি সে ঠিকঠাক করে ফেলে তাহলে তাদের পরিবারের ওপর দিয়ে মোটামুটি একটা ঝড় বয়ে যাবে তা জানা কথা। তার বাবা হার্টের রোগী। বাবাকে নিয়েই যত ভয় তার। ধাক্কাটা বাবা সইতে পারবে তো? কিন্তু বিভা যদি আজ কাউকে কিছু না বলে সামির সাথে পালিয়ে যেত, আর কোনো দিন বাড়ি না ফিরত তাহলে তো বাবা মরেই যেত।

ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। বিভা অনেক্ষণ পর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

সামি চুপচাপ ছিল। চোরা চোখে বারবার দেখছিল বিভাকে। হুট করে কী যে হয়ে গেল তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে। মনে মনে ঠিক এই জিনিসটাই সে ভীষণভাবে চাইছিল বিগত কয়েকটা দিন ধরে। কিন্তু আজ যখন বিজলি বাতির মতো নিমেষে পূরণ হয়ে গেল ইচ্ছেটি তখন ঠিক সামলে উঠতে পারল না সে। কেমন এলোমেলো আর নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল মনের ভেতরটা।

মাঝ রাতে ওরা সব সামিদের বাড়ির নিচতলার হলরুমে এসে জড়ো হলো। এ হলরুমটিতে বছর চারেক আগে একবার সামির জন্মদিন করা হয়েছিল বেশ ধুমধাম করে। তারপর থেকে বলা যায় ঘরটা প্রায় ইউজলেসভাবে পড়ে আছে। রোজ ঝাড়ামোছা করা হয় বলে অবশ্য পরিত্যক্ত ভাবটা প্রকাশ্য নয়। লাল কার্পেট দিয়ে মোড়ানো মেঝে। কোনো আসবাব নেই। ঘরের এক কোণায় প্রায় তিন চার ফুট উচ্চতার দুটি পাতা বাহার সাজানো। সাদার ওপর নীল কাজ করা পোর্সেলিনের দামি টবে। পাতা বাহারের গায়ে স্ট্রিং লাইট দিয়ে ডেকোরেশন করা। বাতিগুলো জ্বালালে বেশ আলো আঁধারি তৈরি হয় ঘরের মাঝে। মনে হয় যেন এ ঘরটা পৃথিবীর অংশ নয়। মায়াবী অপার্থিব কোনো জায়গা বলে ভ্রম হয়

হঠাৎ হঠাৎ।

রুদ্র প্রথমেই ধুমধারাক্কা গান বাজিয়ে দিলো। বিভার মিউজিক টিউজিক বিরক্ত লাগছিল, সে কপাল কুঁচকে বলল, 'এসব বন্ধ কর তো, ভালো লাগতেছে না!'

রুদ্র বেঁকে বসল, 'বন্ধ করব কেন? এখন পার্টি হবে পার্টি।' বলে সে আর দেরি করল না। হাত পা ছুড়ে উজবুকের মতো নাচতে শুরু করল।

কার্পেটের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসেছিল সামি, তার হাতে কোকের ক্যান। ক্যানে চুমুক দিয়ে হাতের উল্টো পাশ দিয়ে মুখ মুছে পানসে গলায় সে আকাশকে প্রশ্ন করল, 'যা হলো, তা কি ঠিক হলো?'

আকাশ দৃঢ় গলায় বলল, 'অবশ্যই ঠিক হলো, জোরজবরদস্তি বিয়ে দিয়ে একটা মেয়েকে দেশছাড়া করা হলো না, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?'

'আর ইউ শিওর?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর!' এটুকু বলে সামির কাঁধে একটা হাত রাখল আকাশ, মৃদুভাবে বলল, 'জাস্ট চিল! এভরিথিং ইজ মোর দ্যান পারফেক্ট!'

হৃদিতার হাতে চিপসের কৌটা ধরা ছিল। সে চিপস চিবোতে চিবোতে রুদ্রর পাশে গিয়ে হালকা চালে নাচ আরম্ভ করল। বাজছে একটা স্প্যানিশ গান, 'লোকা লোকা লোকা।'

মিনিট দুয়েক বাদে ড্যান্সফ্লোরে সবাই চলে গেল শুধু সামি আর বিভা ছাড়া। সামি বসে রইল হাত পা ছড়িয়ে, আর বিভা হাঁটুতে মুখ গুঁজে।

বাকি চারজন মনোযোগ দিয়ে নাচছে। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না, শুধুই নেচে যাচ্ছে।

ওদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সামি বিভাকে প্রশ্ন করল, 'লোকা মানে কি জানিস?' গানের শব্দের জন্য একটু জোরে কথা বলতে হলো ওকে।

'হ্যাঁ জানি, স্প্যানিশ শব্দ ওটা, অর্থ পাগল।

'আসলেই একেকটা আস্ত পাগল এগুলো, লোকা পারফেক্টা!' স্বগতোক্তির মতো বলল সামি। ওর বলার ভঙ্গিতে বিভা হেসে ফেলল। সে হাসি দুজনের মধ্যকার গুমোট বাতাসটা একটু বুঝি হালকা করল।

সামি তাকাল বিভার দিকে। স্ট্রিং লাইটের আবছা হলদে আলোয় সে দেখতে পেল বিভার মুখে এক টুকরো দুর্বোধ্য হাসি।

তখন সিডি প্লেয়ারে গানের ট্র্যাক পাল্টে গেছে। লোকা লোকা শেষ হয়ে

আমেরিকান মাউথ ফ্লাইটলেস বার্ড চালু হয়েছে। নাচনে ওয়ালারা লাফঝাঁপের পর কার্পেটের ওপর বসে পড়েছে বিশ্রাম নিতে। রুদ্রর অবশ্য বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। সে দুলে দুলে তাল দিচ্ছে অনবরত।

বিভার মুখের হাসিটা তখনও অম্লান। তিন চার হাত দূরে বসে ছিল বিভা। সামি ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে আলতো গলায় বলল, 'নাচবি আমার সাথে?'

বিভা নড়েচড়ে বসল একটু। তারপর হাত বাড়িয়ে ধরল সামির হাত। হাত ধরে দুজন যখন ড্যান্স ফ্লোরে ওঠে আসলো রুদ্র তখন অভ্যাসবশত একটা সিটি বাজিয়ে ফেলল। বাকিরা পুরো দৃশ্যটা দেখেও না দেখার ভান করল।

Have I found you?
Flightless bird, jealous, weeping
Or lost you?
American mouth
Big pill looming

সামি বিভার হাত ধরে ঘুরিয়ে দিলো। লং স্কার্টে চমৎকার ঘূর্ণি তৈরি হলো। ওরা নাচতে নাচতে একটু দূরে চলে এসেছে অন্যদের থেকে। নাচের দমকে বিভার খোঁপা বাঁধা চুল খুলে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠময়। স্ট্রিং লাইটের আবছা আলোয় তার রূপ তখন অপার্থিব। সামি ফিসফিস করে বিভার চোখে চোখে চেয়ে বলল, 'তোকে কখনো বলেছি কি বিভা? তুই যে দেখতে অসম্ভব সুন্দর?'

গানের শব্দ মুখের কথা কেঁড়ে নিচ্ছে। বিভা নাচের তাল ঠিক রেখেই মুখটা সামির কানের কাছে নিয়ে ফিসফিসিয়ে উত্তর দিলো, 'না!'

সামি হাসে, সুরের তালে পা নাড়ায়, বলে, 'তুই খুব সুন্দর, বিভাবরী!' বিভার চোখে চাপা উল্লাস খেলা করে, জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে উত্তর দেয়, 'তুইও...'

সামি হা হা করে হেসে ওঠে, 'আমি? আমি সুন্দর?

'হ্যাঁ, ইউ আর দ্যা মোস্ট হ্যান্ডসাম ম্যান ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড, আই হ্যাভ এভার মেট!'

'আসলেই?'

'আসলেই!'

সামি বিভার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভালোবাসার চোখে অতি কুৎসিত ব্যক্তিও সুন্দর হয়ে ওঠে।'

‘মোটেই না, তুই আমার দেখা পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর পুরুষ। শুধু ভালোবাসা নয়, ঘেন্নার চোখেও তোকে আমার কাছে সবসময় সুন্দর লাগবে।’

সম্মোহনের দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সামি বিভার দিকে, আলো আঁধারির সে মায়াবী ক্ষণে। তারপর ধীরে ধীরে নত হলো। এক গভীর চুম্বনে তার ঠোঁট লগ্ন হলো বিভার ঠোঁটে।

বিভা বাড়ি ফিরল সকাল আটটায়। সারা রাত এক ফোটা ঘুম হয়নি। চোখের কোল জুড়ে কালো দাগ। মুখের ত্বক রুক্ষ। রাতটা এক কথায় স্বর্গের মতো সুন্দর ছিল। কিন্তু কথায় আছে না? সুখের পরেই আসে দুঃখ আবার দুঃখের পরেই সুখ। বিভার এখন সুখ পার হয়ে দুঃখের পালা। দুঃখটাকে এক ঢোঁকে গিলে ফেলতে হবে। মনে মনে এখন সে প্রস্তুতিই নিচ্ছে সে। বিয়েতে না করার পর বাবা মা একটু চিল্লা ফাল্লা করবে, আত্মীয়স্বজনরা নানা কথা বলবে। কিন্তু কয়েকটা দিন কাটার পর সময় ঘটনার ওপর চমৎকার প্রলেপ এঁকে দেবে। এখন শুধু একটু ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই আপাতত।

দুরুদুরু বুক নিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢুকল সে। বসার ঘরের ফ্লোরিং এখনো তোলা হয়নি। বাতি জ্বলেনি। পর্দা টানানো জানালায়। অল্পবয়সি কাজিনগুলা ভস ভস করে ঘুমাচ্ছে এখনো। বাইরে যে একটা কর্মব্যস্ত নিয়মমাফিক দিন শুরু হয়ে গেছে এ ফ্ল্যাটে ঢুকে তা বোঝার উপায় নেই। আধো আলোর ঘুম ঘুম আলসে ভোর ঘাপটি মেরে বসে আছে এখনো এখানে। ডাইনিংয়ে মায়ের মুখোমুখি পড়ে গেল বিভা। তাকাতেই মনে হলো মায়ের মুখখানা অত্যধিক শুকনো। বুকটা ধক করে উঠল।

মা বিভাকে দেখেই সচকিত গলায় প্রশ্ন করল, 'হৃদি কেমন আছে?'

কাল রাতে মাকে বলা মিথ্যে কথাটা মনে পড়ার সাথে সাথে একটা তেতো অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ভেতরটায়। ইস একটা মিথ্যেকে ঢাকতে এখন কত্তগুলো মিথ্যে বলতে হচ্ছে। বিভা শুকনো গলায় বলল, 'ভালো আছে মা, এখন ভালো আছে।' এরপর মা এদিক-সেদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে গোপন গলায় বলল, 'শোন একটা কথা আছে, আমার পাশে এসে বয়।'

বিভা মায়ের পাশে গিয়ে বসল। মা বড় অদ্ভুত চোখে তাকাল তার দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চোখ মুখ নাক সব দেখতে লাগল। নিজের মেয়েকে যেন নিজে চেনে না। বিভা একটু সংকুচিত হলো। তার ঠোঁটে, গালে, কপালে তখনও সামির

ঠোঁটের স্পর্শ লেগে আছে। মা কি কিছু টের পাচ্ছে? নইলে অমন কিম্ভূত চোখে তাকানো কেন? সে হাসার চেষ্টা করে বলল, ‘ওমা, কী হল তোমার?’

মায়ের কণ্ঠে গোপন ভাবটা আবার ফিরে আসল, ‘শোন আজ খুব ভোরে অভিজিত ফোন করেছিল।’

বিভা টের পেল, হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। কম্পিত গলায় বলল, ‘কী বলেছে ফোন করে?’

‘বলল... বলল তার নাকি একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে, আজ দুপুরেই কলকাতা ফিরতে হচ্ছে। আপাতত বিয়েটা হচ্ছে না।’

চাপা এক স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসলো বিভার বুক থেকে। যাক, ঝামেলা কাটল তাহলে!

‘খবরটা শোনার পর থেকে তোর বাবার শরীর খুব খারাপ করেছে। বুকে ব্যথা করছে। আমার তো খুব টেনশন হচ্ছে রে, যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়?’

মায়ের চোখে জল। কান্না চাপতে মুখে আঁচল দিলো মা।

‘কিছু হবে না বাবার। তুমি টেনশন করো না।’

‘আত্মীয়স্বজন সবাই জানে আজ তোর বিয়ে কোলকাতা থেকে গুষ্টিসুদ্ধ সব আত্মীয় চলে এসেছে বিয়ে খেতে, এখন এদের আমি মুখ দেখাব কী করে? এত বড় প্রতারণা করল এ ছোটলোকের পরিবারটা আমাদের সাথে?’ উত্তেজনায় মায়ের ঠোঁট কাঁপছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

বিভা ওঠে পড়ল। বাবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল বাবা বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ। ডান হাতটা বুকের ওপর রাখা।

‘বাবা!’

বিভার ডাক শুনে বাবা ঘাড় বাঁকা করে তাকাল বিভার দিকে

বিভা এগিয়ে এসে বাবার হাত ধরে নরম গলায় বলল, ‘শরীর খারাপ লাগছে?’

বাবার হার্টে গত বছর রিং পরানো হয়েছে। দিনটা এখনও তার স্পষ্ট মনে আছে, মনে থাকবে সারাটা জীবন। সেদিন খুব ভোরে হঠাৎ বাবার ঘর থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসল। কানের ভেতর শব্দটা ঢোকা মাত্র ঘুম ছিটকে পালাল। ধড়ফড় করে ওঠে বসল বিভা। দৌড়ে গেল বাবার ঘরে। গিয়ে আবিষ্কার করল বাবা মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে বুকে হাত দিয়ে। মুখ যন্ত্রণায় কোঁকড়ানো। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে বিকট এক গগনবিদারী চিৎকার।

মা তখন বাড়ি ছিল না। কুমিল্লায় নানাবাড়ি গিয়েছিল সপ্তাহখানেকের জন্য। একটা হিম হিম ভয়ের ঝাপটা এসে বিভার হাত পা জমিয়ে দিয়ে গেল। কী হচ্ছে এসব তার চোখের সামনে? যে লোকটার কখনো হালকা সর্দি জ্বরও হয় না, সে লোকটা হঠাৎ এই কাকডাকা ভোরে এমন ডাঙায় তোলা আধমরা মাছের মতো কাতরাচ্ছে কেন? তার বাবা কি মরে যাচ্ছে? থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে সে মোবাইল হাতে নিয়ে অমৃতাকে ফোন করল প্রথমে। কেন জানে না জীবনে প্রথমবার সম্মুখীন হওয়া চরম বিপদের সময় ভগবানের পরপরই তার অমৃতার কথা মনে হয়েছিল। তারপর ফোন করল বড় কাকাবাবুকে। মিনিট পনেরোর মধ্যে কাকাবাবু চলে এলেন, আসলো অমৃতা। ধরাধরি করে বাবাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। ডাক্তার বললেন হার্টে ব্লক পাওয়া গেছে। রিং পরাতে হবে। বেশ বড় অপারেশন। সে দিনগুলো নারকীয় ছিল। আজ বাবার এই কোঁকড়ানো চেহারাটার দিকে তাকিয়ে বিভার এক বছর আগের সে ভয়ঙ্কর দিনটার কথা মনে পড়ল।

সে বাবার হাতটা ধরে আবারও প্রশ্ন করল, ‘ও বাবা, বল না, কেমন লাগছে তোমার? বুকে ব্যথা করছে?’

‘দরজাটা লক করে আয়, তোর সাথে কথা আছে, তোর মা যেন শুনতে না পায়।’

একটু অবাক হলো বিভা। কী এমন কথা যা মায়ের সামনে বলা যাবে না? দরজা ভেতর থেকে লক করে বিছানায় বাবার পাশে এসে বসল বিভা।

‘বলো’

কয়েকটা সেকেন্ড বাবা অসহায় চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল বিভার দিকে। তারপর ভারী গলায় বলল, ‘কাজটা কি তুই ঠিক করলি?’

‘মানে?’ মুখ দিয়ে অনায়াসে শব্দটা বেরিয়ে আসল।

‘ওই ছেলেটার বাবা ফোন করেছিল আমাকে।’

‘কোন ছেলে?’

বিস্ময়ে নিশ্বাস নিতে ভুলে গেল বিভা।

বাবা জিব দিয়ে শুকনো খড়খড়ে ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে একটা দম নিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

‘তোর বন্ধু।’

‘আমার বন্ধু? আমার বন্ধুর বাবা তোমাকে ফোন করেছিল?’

'হ্যাঁ উনি আমাকে সব বলেছেন। কাজটা কি তুই ঠিক করলি? এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে ফেললি? কবে থেকে এত বেপরোয়া হয়ে গেলি তুই? ওই ছেলের জন্য তুই অভিজিৎকে না করে দিলি?'

বিভা কিছু বলতে পারল না। হতবাক হয়ে চেয়ে রইল শুধু বাবার দিকে। সামির আব্বা কী করে জানল এ ঘটনা? কে জানাল? অভিজিৎ ই বা রহস্যজনকভাবে তার আর সামির মধ্যকার সম্পর্কের কথা জানতে পারল কী করে? কার হাত আছে এসব ভূতুড়ে কাণ্ডের পেছনে?

'অভিজিৎকে না করেছিস কেন? তোর ওই বন্ধুকে বিয়ে করবি বলে? হিন্দুর মেয়ে হয়ে তুই যবন বিয়ে করবি?' বাবার গলা উত্তেজনায় কাঁপছে।

বিভা বিস্মিত, স্তম্ভিত, কুণ্ঠিত!

ক্ষীণ গলায় বলল, 'সামির আব্বা তোমাকে কী বলেছেন?'

'বলেছেন তুই উনার ছেলের গলায় ঝুলে পড়ার প্ল্যান করেছিস, গলায় ঝোলার জন্য নিজের বিয়ে ভেস্তে দিয়েছিস।'

'তাই বলল?' অনেক কষ্টে ঠোঁট দুটো নাড়াল বিভা। মনে হচ্ছে যেন বুকের ভেতর প্রবল গতিতে একটা ট্রেন ছুটছে বিকট শব্দে হুইসেল বাজিয়ে।

'তাইতো বলল। তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নেই তোর? কীসের ভরসায় অভিজিতের মতো একটা এ গ্রেডের ছেলেকে হাতছাড়া করছিস? ওই বাউণ্ডুলে, বাপের ঘাড়ে চড়ে বেড়ানো ফাজিল ছেলেটার জন্য?

উত্তেজনায় বাবার বুকে ব্যথা বাড়ছে। ঘাম হচ্ছে তার। বিভা তড়িঘড়ি করে এক গ্লাস জল নিয়ে আসলো বাবার কাছে। বাবা এক ঢোক জল খেল, তারপর বলল, শেষমেশ আমার এই দুঃখ নিয়ে মরতে হবে যে আমার মেয়ে মুসলমানের ঘরের বউ হয়েছে, তুই কি ধর্মান্তরিত হবার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছিস নাকি?'

বিভার চারপাশটা ঘোলা জলের মতো ঝাপসা হয়ে আসছে। বাবা বলেই চলেছে, 'ছোটবেলা থেকে কখনো কোনোকিছুতে না করিনি তোকে। কলেজে ওঠে একগাদা বন্ধুবান্ধব জোটালি। মেয়ে বন্ধুর সাথে পাল্লা দিয়ে তোর ছেলে বন্ধুও বাড়তে থাকল, একদিন তোর মা আপত্তি করে উঠল, তুই বললি, ওরা তোর শুধুই বন্ধু, একদম আপন দাদার মতো সম্পর্ক তাদের সাথে, আজকে কোথায় গেল সে দাদাগিরি শুনি? বিশ্বাস করেছিলাম তোকে। এ মূল্য দিলি আমাদের বিশ্বাসের তুই?'

বিভার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামতে থাকল।

মা দরজা ধাক্কাচ্ছে।

বাবা বলল, ‘যাও দরজা খুলে দাও, আর দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।’

টলমল পায়ে বেরিয়ে আসলো বিভা ঘর থেকে। বড় কাকাবাবু এসেছেন। বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে এখন। বিয়ে ভাঙার খবরটা মা কাউকে দেয়নি এখনও। আপাতত বাবার অসুস্থতা নিয়েই সবাই চিন্তিত।

মা বিভাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, ‘তুই কি অভিজিতের সাথে একটু কথা বলবি? হঠাৎ কী কারণে বিয়ে স্থগিত করল এ ব্যাপারটা জানা দরকার না? আমার তো ভয় হচ্ছে, টেনশনে যদি তোর বাবার কিছু হয়ে যায়?’

বিভার হঠাৎ মনে হলো, সত্যিই তো, তার বাবা যদি মরে যায়?

সে মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রত্যয় নিয়ে বলল, ‘কিছু হবে না বাবার, তুমি বাবাকে গিয়ে বলো সব ঠিক আছে, অভিজিতের সাথে বিয়েটা আমার হচ্ছে, সঠিক সময়েই হচ্ছে ‘

মা হতবাক হয়ে বলল, ‘কিন্তু ওই ছেলে যে বলল...’ কথা শেষ করতে পারল না মা। বিভা বাধা দিয়ে বলল, ‘আহ, যাও তো যা করতে বললাম তাই করো, কথা বাড়িওনা।’

বিভা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসলো ঘর থেকে। রিকশা নিয়ে ছুটল কলাবাগান, অভিজিতের বন্ধুর বাসায়।

অভিজিৎ বসে ছিল ডাইনিংয়ে। চায়ের কাপ হাতে। পাশে তার মা। আরো কিছু আত্মীয়স্বজন। কলকাতা থেকে এরা সবাই বিয়ে খেতে এসেছিল ঢাকায়। যেকোনো কারণেই হোক বিয়েটা এখন আর হচ্ছে না। এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যও তার সামনে করা যাচ্ছে না। সে একবার জানিয়ে দিয়েছে বিয়ে করবে না, ব্যস করবে না। তাকে ঘাঁটানোর সাধ্য কারও নেই।

কী কারণে ছেলে বিয়েতে নাকচ করে দিলো তা হাজার চেষ্টা করেও জানতে পারলেন না অভিজিতের মা। মেয়েটিকে তার বড় ভালো লেগেছিল। বংশটিও বনেদি। ছেলের মতিভ্রমের কারণ জানার জন্য তিনি উদগ্রীব।

বিভা ঢুকল সাইক্লোনের মতো। তার চোখদুটো ফোলা। এলোমেলো হয়ে চুল পড়ে আছে পিঠময়। তাকে দেখাচ্ছে বিধ্বস্ত।

বিভার ঝটিকা আগমন সবার মাঝে একটা চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করল। কেউ বিভাকে এমন বেশে এ মুহূর্তে আশা করেনি। অভিজিৎও না।

বিস্ময়ে স্থবির হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে বিভার দিকে। তারপর সন্দিহান হয়ে বলল, ‘তুমি এখানে?’

বিভার হাতদুটো আপনাপনি জোড় হয়ে বুকের কাছে ওঠে আসল। হাতজোড় করে অশ্রুরুদ্ধ গলায় সে বলল, ‘অভিজিৎদা প্লিজ! তুমি আমায় বিয়ে করো! প্লিজ!’

ছুটির দিনগুলোর বিকেলে অমৃতা দৌড়োয়। একটা রিকশা নিয়ে চলে যায় ধানমন্ডি লেকে। তারপর টানা পয়তাল্লিশ মিনিট ঘড়ি ধরে লেকের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত দৌড়োয়। গতির মাঝে এক অনাবিল মুক্তি খুঁজে পায় সে। দৌড়ের গতি বাড়ার সাথে সাথে গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। মনে হয় বুঝি এ ঘামের সাথে তার শরীর এবং মনের এ যাবৎ কালের সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে ঝরে যায়।

আজকেও একটা ছুটির দিন। জ্বলন্ত উনুনের মতো সারা দুপুর জ্বলেছে সূর্যটা। এখন এ বিকেলের কোলে এসে কিছুটা নিভু নিভু হয়েছে তার তেজ। একটুও বাতাস নেই। গাছের পাতাগুলো মূর্তির মতো স্থির।

অমৃতা দৌড়োচ্ছিল, ধানমন্ডি সাত নম্বর লেকের রাস্তা ধরে। তার গায়ে সাদা স্পোর্টস টি শার্ট, কালো ট্রাউজার। পায়ে কালো কেডস। দু কানে গোঁজা হেডফোন। তাতে আর্টসেলের নতুন অ্যালবামের গান বাজছে। সে দৌড়াচ্ছে ঝড়ের বেগে। দৌড়োতে দৌড়োতেই খেয়াল হলো মোবাইলটা ভাইব্রেট হচ্ছে। পায়ের গতি একটুও না কমিয়ে পকেটে রাখা ফোনের এনসার বাটন প্রেস করল অমৃতা। ফোনের ওপাশ থেকে বিভা বলল, 'হ্যালো অমৃতা, শুনতে পাচ্ছিস?'

দৌড়ের দমকে হেডফোনের ছিদ্র দিয়ে অমৃতার কানে শব্দগুলো একটু আবছা হয়ে প্রবেশ করল। হাঁপ ধরা গলায় অমৃতা বলল, 'হ্যাঁ বল'

'অমৃতা শোন, খুব জরুরি কথা আছে তোর সাথে।'

'বলে ফ্যাল।'

'তুই কোথায়? তোর গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন?'

'দৌড়াচ্ছি।'

'থাম তুই, কথা আছে।'

'আরে বল না, আমি শুনছিতো!'

'অমৃতা প্লিজ! থাম তুই।' প্রায় চিৎকার করে উঠল বিভা।

অমৃতার গতি শ্লথ হলো। তারপর ধীরে ধীরে থামল পা। উবু হয়ে দু হাত

দিয়ে দু হাঁটু চেপে ধরে জোরে জোরে মুখ হা করে নিশ্বাস ফেলল সে বার কয়েক। তারপর সটান দাঁড়িয়ে বলল, 'থেমেছি, এখন বল, কী এমন দুনিয়া উল্টানো ঘটনা ঘটল শুনি?'

'অমৃতা, আমি অভিজিৎকে বিয়ে করছি, যেমনটা কথা ছিল।'

অমৃতা আঁতকে উঠল।

'কী বলছিস?'

'সত্যি বলছি।'

অমৃতা কয়েক মুহূর্ত স্থবির হয়ে রইল। তারপর জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁটদুটো একবার ভিজিয়ে নিয়ে ধারালো গলায় বলল, 'ইম্পসিবল! ইউ ক্যান্ট ডু দিস টু সামি। ও এটা নিতে পারবে না। এত কিছুর পরে তুই হুট করে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারিস না বিভা।'

'নিতে হচ্ছে।'

'নিতে হলে আগে নিসনি কেন? গতকাল রাতে এত কাহিনি করার কী দরকার ছিল? কেন তুই সামির সামনে বিয়ে নাকচ করার অভিনয় করেছিলি?'

'উফ অমৃতা তুই আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো কিছু না শুনেই আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছিস।'

'কী হয়েছে খুলে বল'

'সামির আব্বা কী করে যেন পুরো ঘটনা জেনে গেছেন। উনি ফোন দিয়েছিলেন আমার বাবাকে। বাবাকে বলেছেন যে আমি সামির জন্য আমার বিয়ে বাতিল করেছি। তুই বুঝতে পেরেছিস ঝড়টা কোন দিক থেকে এসেছে? তোরা যে প্ল্যানটা করেছিলি সেটা সম্পূর্ণ ভেস্তে গেছে। বাবা জেনে গেছেন যে অভিজিৎ নয় আমিই বিয়ে ভেঙেছি, তাও আবার একটা মুসলমান ছেলের জন্য। যার সাথে আমার বিয়ে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'সামির আব্বা কী করে জানল?'

'ওই লোকটা একটা ঘাঘু পাবলিক, আমি দুই চক্ষে দেখতে পারি না ওই ব্যাটাকে। ওই ব্যাটা ফোন দিয়ে আমার বাবাকে কী না কী বলেছে ভগবান জানে, এরপর থেকে আমার বাবা অসুস্থ হয়ে গেছে।' শেষটায় বিভার গলা রুদ্ধ হয়ে আসলো। অমৃতা টের পেল বিভা কাঁদছে।

'আহ কাঁদিস না। তুই কোথায়?'

'বাসায়।'

'থাক তাহলে, আমি আসছি।'

'না, অমৃতা না!'

বিভার মুখের 'না' শব্দটা আচমকা বহু দূর থেকে উড়ে আসা গতিময় এক ধারালো তীরের মতো বিঁধলো অমৃতার বুকে।

সে মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল, 'না মানে? কী বলতেছিস তুই?'

'বাবা বলেছে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার কোনো বন্ধু আমার বাড়িতে আসতে পারবে না। অমৃতা, দোস্ত, বাবা মাত্র হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন, অবস্থা বেশি ভালো না। এমন অবস্থায় আমি বাবার মুখের ওপর কিছু বলতে পারতেছি না, তুই বুঝতেছিস?'

অমৃতা নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। তার নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। বিভা এই কথাগুলো বলতে পারল? বিভার বিয়ে হয়ে যাবে আর অমৃতারা কেউ তার বাসায় পর্যন্ত যেতে পারবে না? বিভাকে বউ সাজা অবস্থায় এক নজর দেখতে পাবে না? এটাও কি সম্ভব?

অমৃতা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, 'ফাজলামো রাখ, আমি আসতেছি।'

'দোস্ত প্লিজ! আমি চাই না আমার জন্য বাবার কোনো ক্ষতি হোক, আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না কোনোদিন।'

'আর ইউ ফাকিং কিডিং মি?' অস্ফুটে বলল অমৃতা।

'আমি খুব সরি, দোস্ত আই এম সো সরি।'

বিভা এখন ডুকরে কাঁদছে। টের পাচ্ছে অমৃতা। হেডফোনের ছিদ্র ছিঁড়েফুঁড়ে ওর কান্নার বিলাপ কানের ভেতর প্রবেশ করে হৃদয় তোলপাড় করে দিচ্ছে।

দিশেহারা অমৃতা অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'তোর বিয়ে হবে আর আমরা তোর পাশে থাকব না? এটা কোন ধরনের ফাইজলামি?'

'সামিকে দেখিস।' বিভা বলল, কান্নার ঢোঁক গিলে।

অমৃতা কিছু বলার আগেই লাইন কেটে গেল। বিপবিপ শব্দে কানেকশন ছিন্ন হওয়ার পর অমৃতা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'বিভা হোল্ড অন! কথা শোন আমার!'

বিভা শুনল না। সাথে সাথেই আবার ডায়াল করল অমৃতা বিভার নম্বরে। অনেকক্ষণ রিং বাজার পর মেশিন কণ্ঠ বলে উঠল, 'আপনি যে নম্বরে কল করেছেন তা এ মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

হতভম্ব অমৃতা মিনিট দুয়েক সময় শূন্য মাথা আর শূন্য দৃষ্টি নিয়ে ভর দুপুরের লেকের পারে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার ভেতরটা কাঁপছে এক অজানা শঙ্কায়। বিভা তাহলে চলেই যাচ্ছে? এই দেশ ছেড়ে? তাদেরকে ছেড়ে?

অস্থির অমৃতা আর কিচ্ছু ভাবতে পারছিল না। ভেঙে পড়া তার ধাতে নেই। তার ভেতরটা লোহার মতো শক্তপোক্ত। প্রবল ঝড়ের মাঝেও কী করে শক্ত হাতে খুঁটি ধরে রেখে সারভাইভ করতে হয় অমৃতার তা ভালো মতো জানা আছে। কোনো প্রকার দুর্বলতাকে সে প্রশ্রয় দেয় না।

কিন্তু আজ নিজের বুক থেকে ভাঙনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সামিকে কী করে জানাবে সে এ খবরটা? গাধাটা যে বিভাকে সত্যিই ভালোবেসেছিল! স   ইতে পারবে কি এ আঘাত?

অমৃতা হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতেই অন্য বন্ধুদের ফোন করল। সবাইকে বলল সামির বাসায় মিট করতে, এখনই।

বিভা মোবাইল সুইচড অফ করে দিয়ে হাঁটুতে মুখ রেখে কান্না চাপার বৃথা চেষ্টা করতে করতে ফোঁপাচ্ছিল। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। বাইরে থেকে বাবা ডাকল, 'বিভা মা, দরজা খোল।'

বিভা দৌড়ে ছুটে গেল বাথরুমে। বেসিনের কল ছেড়ে চোখ মুখে পানি ছিটাল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিল ভালো করে যেন কান্নার ছিটে ফোঁটা দাগও মুখে লেগে না থাকে।

দরজা খুলে দিতেই বাবা ঘরের ভেতর ঢুকল।

'তোর মুখটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

বিভা জোর করে মুখে একটা হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে বলল, 'খাইনি তো কিছু সকাল থেকে, আজ উপবাস যে!'

'ও, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। শরীরটা কি খারাপ লাগছে মা?'

'না হালকা একটু মাথাটা ঘুরাচ্ছে, ও ঠিক হয়ে যাবে, তুমি চিন্তা করো না।'

'তুই যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিস মা, এটা তোর জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত, তুই খুব সুখী হবি।'

এ কথা শুনে বিভার চোখদুটো মুহূর্তে কেমন একটু ভাসা ভাসা হয়ে উঠল। 'তাই যেন হয় বাবা, তাই যেন হয়!

'আর মনে রাখিস, আমরা বাবা-মা যা করলাম তোর ভালোর জন্য করলাম।'

'মনে রাখব বাবা, নিশ্চয়ই মনে রাখব।'

বাবা এগিয়ে এসে বিভার মাথায় হাত রাখল। বিভা হাতটা ধরে বলল, 'তোমার বুক ব্যথা কমেছে বাবা?'

'কিছুটা কম।' বলে বাবা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, 'আজকাল টেনশন একদম নিতে পারি না রে মা! হৃদপিণ্ডটা বেশি দিন টিকবে না, যে কোনো দিন কলাপ্স করে যাবে।' কথাগুলো বলার সময় বাবার মুখখানা শিশুর মতো অসহায় দেখাল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বিভার বুকটা।

'অশুভ কথা বলো না বাবা, এসব বলতে নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুই একটু চান করে নে, সারারাত ঘুমাসনি, চেহারাটা দেখতে খুব খারাপ লাগছে।

বিভা একটু ম্লান হাসল, 'সমস্যা নেই, পার্লারের ভারি মেকআপ সব মলিনতা ঢেকে দেবে।

বাবার হাতটা আবার ধরল বিভা। বাবার হাতের চামড়া কেমন খসখসে হয়ে গেছে। ক্ষয়াটে চামড়ার ওপর দিয়ে ভেসে আছে নীল নীল রগ। দেখলেই কেমন রুগ্ন রুগ্ন লাগে। বিভা বাবার রুগ্ন হাতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঝিম ধরা গলায় বলল, 'বাবা, আমার বন্ধুরা আমার বিয়েতে আসতে চায়। বিয়েবাড়িতে ওদের উপস্থিতি নিষেধ জানতে পেরে খুব মন খারাপ করেছে ওরা।'

'বিভা শোন, সারাটা জীবন তুই বন্ধু বন্ধু করে পাগলামো করেছিস। তোর বন্ধুদের ওপর কোনোদিন আমরা কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি। প্রতিদানে কী পেলাম? তোর সবকটা বন্ধু আমাদের ঠকাল। ওরা কেউ তোর ভালো চায় না।

'বাবা প্লিজ!'

'বিয়ে চলাকালীন সময়ে আমি কোনো ঝামেলা চাই না, ওই বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলেটা যদি মণ্ডপে এসে কোনো রকম অনর্থ করে? তাহলে আমাদের মান-সম্মানের কেমন বারোটা বাজবে তা আঁচ করতে পারছিস? আজ রাতে বিয়েটা হয়ে যাক। কাল সকালে ওদের আসতে বল।'

বাবা আর দাঁড়াল না।

বিকেলের মধ্যে বিভার পার্লারে চলে যাওয়ার কথা সাজগোজ করার জন্যে। মাসতুতো পিসতুতো বোনরা মিলে বিউটি পার্লারে যাবার দলটা বেশ বড়। প্রায়

বারো তেরো জনের মতো হবে। সবাই মিলেঝুলে হই হুল্লোড় করে বাসা থেকে বের হতে যাবে ঠিক সে মুহূর্তেই বাবা ঘোষণা করল পার্লারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, মায়ের একজন বাঁধা বিউটিশিয়ান আছে বাড়ি এসে এটা সেটা করে দেয় প্রায়ই, সে মেয়েটিকেই ডাকা হবে বউ সাজানোর জন্য।

বিভা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে শুনল কথাটা, হজম করল। কিচ্ছুটি বলল না। এমনিতেও বউ সাজা নিয়ে তার মনের মাঝে এ মুহূর্তে কোনো উত্তেজনা কাজ করছে না। জবরজং শাড়ি পরে, ভারী গয়না গলায় ঝুলিয়ে সং সাজতে হবে এটা ভাবতেই কেমন বিরক্ত লাগছে। পার্লারে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা বাতিল হলো বলে তাই মনে মনে একটু বাঁচলোই বিভা। কিন্তু অবাক লাগছে বাবার মানসিক অবস্থা টের পেয়ে। এত ভয় পাওয়ার মতো কিছু আছে কি? এখনও কি বাবার মনে কোনো সংশয় আছে এ বিয়ে নিয়ে? তিনি কি ভেবেছেন যে বিভা পার্লারে যাবার নাম করে সামির সাথে পালিয়ে যাবে? আর ফিরবে না? কিংবা সামি বাড়ির সামনে ওত পেতে বসে আছে? বিভা বাড়ি থেকে বেরোলেই কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে? কথাগুলো মনে হতে আপন মনে হাসল বিভা। সত্যি যদি এমন কিছু করতে পারত সে! যদি পালিয়ে যেতে পারত সামির সাথে! যদি পারত বিভা!

ঠিক এ মুহূর্তে তার ইচ্ছে হচ্ছে দূর বহু দূর থেকে দৌড়ে গিয়ে সামির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। লক্ষ্য চুম্বনে ভরিয়ে দিতে তার মুখ। আহা এ জন্মে তা আর হবে না। আজ হতে সামি পরপুরুষ। আর সে পরস্ত্রী। কী করে যে ছেলেটা বন্ধুত্বের খোলস ছাড়িয়ে হঠাৎ প্রেমিক হয়ে গেল। আবার প্রেমিক থেকে পরপুরুষ! রূপান্তরগুলো এত দ্রুত হলো যে বিভা ঠিক হিসাব মিলাতে পারছে না।

'তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?' সৌদামিনী বলল। কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিভা খেয়ালই করেনি। সৌদামিনীর পিছে আরও কয়েকজন আছে।

'কিছু হয়নি, মাথাটা খুব ধরেছে। একটু একা থাকতে দেবে আমাকে বৌদি?'

'ওমা কেন দেবো না? এ কেমন কথা?' বলে সৌদামিনী ঝটপট ঘরের কপাট দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার একটু বাদেই আবার মা আসলো। ভীষণ উত্তেজিত গলায় বলল, 'তোর নাকি শরীর খারাপ লাগছে? কী হয়েছে?'

বিভার চোখ দুটো দেখে তখন মনে হচ্ছে চোখে আলতা পরেছে সে। গালদুটো ফোলা। চুল আউলা-ঝাউলা। মা কাছে আসতেই বিভা মাকে জড়িয়ে

ধরল, কান্নার ঢোঁক গিলে বলল, ‘মা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে!’

‘কেন? কী হয়েছে? কী রকম লাগছে? বল না আমায়!’ মায়ের চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

বিভা কিছু বলল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

বিভা কিছু না বললেও মায়ের মন বুঝি টের পেয়ে গেল। বরফ শীতল গলায় মা বলল, ‘তুই কি অন্য কাউকে ভালোবাসিস?’

এবার বাঁধভাঙা বন্যায় ভাসল বিভা, খুলে দিলো মনের আগল, ‘বাসি মা, অন্য একজনকে ভালোবাসি আমি, এত ভালোবাসি যে তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে মনে হচ্ছে আমার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছে।’

মা স্তম্ভিত হয়ে গেল। অস্ফুটে বলল, ‘কে সে?’

‘জানতে চেয়ো না মা, তুমি জানতে চেয়ো না।’

বেলা একটার সময় অমৃতা, আকাশ আর হৃদিতা সামির বাড়ি আসলো। রুদ্রকে পাওয়া গেল না তার ঘরে। এর মানে বাড়িতে নেই সে। সামির বেডরুমের দরজা বন্ধ। দারোয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল সে বাড়িতেই আছে, তবে ঘুমুচ্ছে এখনও।

তিন ডাকাত দৌড়ে গিয়ে হামলে পড়ল সামির শোবার ঘরের দরজায়। একটা মাঝারি গোছের হইহল্লা লাগিয়ে দিলো ওরা দুপুর বেলার অলস বাড়িতে। হইচই শুনে প্রায় মিনিট পাঁচেক পর সামি দরজা খুলল। তার পরনে হাফ প্যান্ট। গা উদোম। চোখ দুটো ঘুমের ভারে ছোট হয়ে আছে। চুল পাগলের মতো এলোমেলো। সে চিড়িয়াখানার চিড়িয়া দেখার মতো বিস্মিত নয়নে তিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হইছে তোদের? প্রবলেমটা কী মামা?'

তিন মূর্তি সংকুচিত হলো। তাদের মুখমণ্ডলে এতক্ষণ যে মেঘাছন্ন ছায়াটি বিরাজমান ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে তীব্র এক অস্বস্তিতে রূপান্তরিত হলো।

সামি বিরক্ত গলায় বলল, 'দূর বাল, ঘুমাইতেসিলাম একটু, ঘুমটা ভাঙায় দিয়া এখন জোকারের মতো দাঁড়ায় আছে সবগুলা, হইছে কী বলবি তো!'

অমৃতাই কথা বলল প্রথম, 'ভেতরে আসতে দে!'

'ও হ্যাঁ, আয়।' দরজা থেকে সরে দাঁড়াল সামি।

ওরা তিনজন ঘরের ভেতরে ঢুকল।

ঘরের ভেতরটায় কাঁপন ধরা শীত ঘাপটি মেরে বসে আছে। এয়ার কন্ডিশন চলছে বলে বারান্দার দরজা, জানালার গ্লাস সব আটকানো। ভারী পর্দা টানানো জানালায়। এক রত্তি আলো ঢোকার উপায় নেই। সামি জানালার পর্দা সরাল। বেলা দ্বিপ্রহরের ঝকঝকে সূর্য কিরণ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জানালার কাচে।

সামি গায়ে টি শার্ট চড়াল। এলোমেলো চুলগুলোয় চিরুনির মতো হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'এখন বল, কী হইছে?'

আকাশ বলল, 'নাহ, তেমন কিছু না।'

সামি সন্দিহান হয়ে বলল, 'তেমন কিছু না মানে কী? এমনি এমনিই আমার

সাধের ঘুমটা বানচাল করলি?'

হৃদি পরিস্থিতি সামলানোর ঢঙে বলল, 'হুম এমনিই, তোকে.... তোকে দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

অমৃতা তখন মনে মনে গালাগাল দিচ্ছিল নিজেকে। কোন দুঃখে সাতপাঁচ কিছু চিন্তা না করেই সামির কাছে চলে এলো ওরা? একটু সময় নিয়ে বুঝেশুনে আসা উচিত ছিল। অবশ্য সত্যটা তো তাকে জানতেই হবে। আজ অথবা কাল। লুকোচুরি করে লাভটা কী হবে? সবাই মিলে একত্রে বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে। সামি তো এখানে একা নয়। সামিকে ওরা ভেঙে পড়তে দেবে না। শক্ত খুঁটি হয়ে সামির পাশে দাঁড়াবে ওরা চারজন।

অমৃতা সামির মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখ রাখল সরাসরি ওর চোখে।

'সামি, বিভা ফোন করেছিল একটু আগে। আমার ফোনে। বলল আজ সন্ধ্যায় ওর বিয়ে।'

সামি অবাক গলায় বলল, 'বিয়ে মানে? কার সাথে বিয়ে?'

'অভিজিতের সাথে।'

সামি স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বলল, 'কেন? বিয়েটা তো ভেঙে গিয়েছিল।'

অমৃতা একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে যেন সাহস সঞ্চয় করল। তারপর বলল, 'ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু তোর আব্বা কী করে যেন সমস্ত ঘটনা জেনে গিয়েছিলেন এবং বিভার বাবাকে ফোন করে সব বলে দিয়েছেন, অতএব আমরা যে প্ল্যানটা করেছিলাম বিয়েটা নাকচ হবে অভিজিতের পক্ষ থেকে এবং নাকচ হবার কারণ বিভার বাবা-মা জানতে পারবে না, বিয়ে ভাঙার সম্পূর্ণ দায় চাপবে অভিজিতের ওপর, সেই প্ল্যানটা পুরোপুরি ভেস্তে গেছে।'

'ওয়েট ওয়েট, এর মানে আমার আর বিভার ব্যাপারটা তোরাই জানিয়েছিলি অভিজিৎ কে?'

'ঠিক তাই, আমরা জানিয়েছিলাম এবং রিকোয়েস্ট করেছিলাম বিভার বাসায় যেন তোদের দুজনের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু না বলে। সে কথা রেখেছিল, কিছু বলেনি। কিন্তু তোর আব্বা ফোন দিয়ে সব জানিয়ে দিয়েছেন, এর পরপরই বিভার আব্বা অসুস্থ হয়ে গেছে। তুই তো জানিস আংকেলের হার্টের প্রবলেম আছে।'

এ কথায় কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল সামি। অবিশ্বাস ভরা চোখে অমৃতার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পাশে রাখা চেয়ারের হাতল চেপে ধরল

শক্ত করে। মনে হলো যেন তার দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।

এরপর আর একটা কথাও না বলে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজা খুলল মনীষা। খুলেই খুব জরুরি গলায় বলল, 'ওহ রুদ্র! আমি তো ভুলেই গেছি তোমাকে ফোন করার কথা, রাইয়ান বাড়িতে নেই।'

'বাড়িতে নেই মানে? কোথায় গেছে?' রুদ্র অবাক।

'তুমি বসো, একটু জিরিয়ে নাও, ভর দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে এসেছ। ভারি সেজেগুজে এসেছ আজ? অন্য কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

কথাগুলো বলতে বলতে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল মনীষা। রুদ্র একটু লাজুক হাসল। তার পরনে সাদা পাঞ্জাবি। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুলগুলো রিবন দিয়ে ঝুঁটি বাঁধা। গালের জংলা দাড়িগুলোও শেভ করেছে আজ। হেসে বলল, 'আজ শুক্রবার তো, জুম্মার নামাজ ছিল। তাই পাঞ্জাবি পরেছি।'

'ওহ তাই বলো, তুমি একটু বসো, আমি আসছি, কী খাবে বলো? চা নাকি ঠাণ্ডা কিছু?'

'চা খাব, সাথে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিয়েন।

'নিশ্চয়ই' বলে খাবার ঘরের দরজার ওপাশে অদৃশ্য হলো মনীষা।

রুদ্র সোফায় বসল। রাইয়ানের গুনে গুনে আর মাত্র দশদিন পরে এ লেভেল পরীক্ষা। সময়টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে রুদ্র রাত জাগার ক্লান্তি উপেক্ষা করে পড়াতে এসেছে। এসে দেখা গেল ছাত্রই নেই। এহেন ফাঁকিবাজির কোনো মানে হয়? মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। রাতে এক ফোটা ঘুম হয়নি। সকাল আটটা থেকে নটা নাগাদ এক ঘণ্টা বিছানায় গা এলিয়েছিল শুধু। শরীর এখন কড়ায়গণ্ডায় রাত জাগার প্রতিশোধ নিচ্ছে। মনীষা ফোন করে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করে দিলে এখন হয়তো সে বাড়ি বসে আরামসে ঘুমাতে পারত। এ ভাবনার পাশাপাশি মনে একটা অদ্ভুত খেয়াল আসলো। এক দিক থেকে ভালোই হয়েছে মনীষা ওকে আসতে বারণ করেনি আর করেনি বলেই রুদ্র আজ এ নির্জন দুপুরে মনীষাকে একটু একলা পেল। আচ্ছা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল না করার পেছনে কি অন্য কোনো কারণ আছে? কোনো গোপন সুপ্ত অভিলাষ?

ছি, রুদ্র ভীষণ খারাপ হচ্ছে কিন্তু! নিজেকে নিজে শাসায় সে।

মনীষা আসে হাতে চায়ের কাপের ট্রে নিয়ে। সাথে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি তাকে রোজকার মতই সুন্দর দেখাচ্ছে। একটা ক্রিম রঙের সুতির শাড়ি তার পরনে। মুখে কোনো প্রসাধন নেই তবুও কী স্নিগ্ধ তার রূপ!

রুদ্র গ্লাস হাতে নিয়ে পানি খেল ঢকঢক করে। হাতের উল্টো পাশ দিয়ে ঠোঁট মুছল। তারপর বলল, 'কোথায় গেছে রাইয়ান? বিকেলে গেলেও তো পারত।'

'ওর বাবার কাছে গেছে।'

রুদ্র ভারি অবাক গলায় অকপট প্রশ্ন করল, 'বাবার কাছে গেছে মানে?'

এ প্রশ্নে মনীষা একটু অপ্রতিভ হলো, সংকুচিত গলায় বলল, 'না মানে ওর বাবা তো সেন্ট্রাল রোডে থাকে, একটা দরকারে ডেকে নিয়েছে আজ। একটু জরুরি।'

রুদ্র বেআক্কেলের মতো তাকিয়ে থাকল। সে জানে না এ ধরনের একটা পরিস্থিতির বর্ণনা শোনার পর আসলে ঠিক কী বলা উচিত। রাইয়ানের বাবাকে সে এ ফ্ল্যাটে একদিনও দেখেনি। ভেবেছে কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকেন তাই রুদ্রর সাথে টাইম মেলে না। কিন্তু ভদ্রলোক যে স্ত্রী-পুত্রকে ফেলে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বাসস্থান গড়তে পারেন এ ভাবনাটা ঘুণাক্ষরেও তার মনে আসেনি।

কিছু বলার না পেয়ে রুদ্র একটু কোণঠাসা হয়ে রইল।

'অবাক হয়েছ?' মনীষার প্রশ্ন।

'না না, অবাক হওয়ার কী আছে?' অস্বস্তি নিয়ে বলে রুদ্র।

'চা টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

রুদ্র চায়ের কাপ হাতে নিল। তার মনের ভেতরের আরেকটা মনে এখন অনেক অনেক প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য আঁকুপাঁকু করছে। মনীষা কি তবে সিঙ্গেল মাদার? ডিভোর্সড? কী সমস্যা হয়েছিল রাইয়ানের বাবার সাথে?

মনীষা ওর সাগরের মতো গভীর চোখ দুটো মেলে রুদ্রকেই দেখছিল, আর মিটিমিটি হাসছিল।

'কখন আসবে রাইয়ান?' অনেকক্ষণ পরে কথা খুঁজে পেল রুদ্র।

'আজ রাতটা থাকবে ওখানে, কাল দুপুরের মধ্যে চলে আসবে। তুমি কি কাল বিকেলে আসতে পারবে একবার?'

'কাল বিকেলে... জি পারব মনে হয়।'

'ছেলেটাকে নিয়ে খুব চিন্তা হয়, আচ্ছা ওর লেখাপড়ার কী অবস্থা? ইম্প্রুভ হচ্ছে কোনো? তোমার কী মনে হয়?'

রাইয়ানের পড়ালেখার খুব বেশি খারাপ অবস্থা বলে কখনোই মনে হয়নি রুদ্রর। একেবারে ফার্স্টক্লাস গোছের ছাত্র না হলেও সে মোটামুটি ভালো ছাত্র। তবুও মায়ের মন বলে কথা। দুশ্চিন্তা তো হবেই।

রুদ্র খানিক সময় কিছু একটা ভেবে নিয়ে বলল, 'ওর ব্রেইন ভালো, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে পড়তেই চায় না। আরেকটু মনোযোগী হয়ে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি চাই এ লেভেলে ওর এ গ্রেড থাকুক।'

'থাকবে ইনশাআল্লাহ্, আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন ও যেন নিয়ম করে একটু পড়তে বসে।

'আসলে ওর বাবা আর আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর থেকে ছেলেটা একটু কেমন অমনোযোগী হয়ে গেছে। আগে কিন্তু ও এমন ছিল না।'

রুদ্র হাবার মতো চেয়ে থাকে। কী বলবে খুঁজে পায় না।

মনীষা প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'তোমার খবর বলো, কেমন আছ?'

'ভালো, খুব ভালো।' বলল রুদ্র। হালকা একটু আড়ষ্টতা কাজ করছে তার ভেতর।

'খুব ভালো?' বলে মনীষা চোখ নাচায়। খানিকটা ফিচেল গলায় আবার বলে, 'খুব ভালো থাকার মতো কোনো খুব ভালো সংবাদ আছে নাকি?'

রুদ্র হাসে, 'আছে বৈকি, আমার দুই বন্ধুর মধ্যে গতকাল ফাইনালি প্যাঁচআপ হয়ে গেছে।

'কেন ঝগড়া চলছিল নাকি?'

'ঠিক ঝগড়া না, আসলে ওদের ভেতর প্রেম ছিল কিন্তু কেউ কাউকে বলতে পারছিল না, অবশেষে বলতে পারল এবং আরো মজার ব্যাপার হলো আমার বান্ধবীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল অন্য জায়গায়, সে বিয়েটাও ভেঙে গেছে। এখন ওদের লাভ লাইফ মোটামুটি স্যাটেলড।'

'চমৎকার! তুমি তোমার বন্ধুদের খুব ভালোবাসো তাই না?'

এ প্রশ্নটা লোকে আজকাল প্রায়ই করে। কারণটা সঠিক জানে না রুদ্র। বন্ধুদের প্রসঙ্গ উঠলেই লোকে ইনিয়ে-বিনিয়ে সুযোগ বুঝে প্রশ্নটা করে বসে। মনীষাও ব্যতিক্রম হলো না।

রুদ্র মনীষার দিকে সরাসরি তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বলল, 'ভালোবাসি কি না জানি না, তবে ওদেরকে ছাড়া আমি লাইফের একটা দিনও কল্পনা করতে পারি না। আসলে আমার জীবনটা এখন ওদেরকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে।'

'বাহ! তুমি তো খুব সুন্দর করে কথা বলো!'

রুদ্র মৃদু হেসে বলল, 'হঠাৎ হঠাৎ বলি, কিন্তু বন্ধুদের সাথে থাকলে আমি ভীষণ বাজে ভাষায় কথা বলি। ওসব শুনলে আপনি খুব রেগে যাবেন। আর এই মাত্র করা প্রশংসাটা ফিরিয়ে নিতে চাইবেন।

'অসম্ভব! মিছে কথা, তুমি বাজে ভাষায় কথা বলতেই পার না! তুমি অত্যন্ত সুইট এবং ভদ্র একটা ছেলে।' কথাটা বলে মনীষা প্রশ্রয়ের হাসি হাসল।

প্রশংসা শুনে কানের ডগা লাল হয়ে গেল রুদ্রর। মাথা নামিয়ে আস্তে করে সে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ! '

মনীষার যেন হঠাৎ মনে পড়ল, 'এই যা, দুপুর প্রায় একটা বেজে গেল, এসো তুমি আজকে আমার সাথে খাবে।

'না না! আমি বাসায় গিয়ে খাব।'

মনীষা একটু নিভলো, 'কেন? বাসায় কেউ অপেক্ষা করছে বুঝি?'

'আরে নাহ, সেরকম কিছুই না। আমার বাবা-মা চিটাগাং থাকেন। এখানে থাকছি বন্ধুর বাসায়। বাড়িতে খাবার নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করার মতো আসলে এখানে কেউ নেই।'

'তাহলে মানা করলে কেন?'

'না এমনি, ভাবলাম আপনার আবার ঝামেলা হবে।'

'কীসের ঝামেলা! আসলে আজ তো ছুটির দিন, সবসময় ছুটির দিনগুলোয় আমি আর রাইয়ান একসাথে লাঞ্চ করি। সপ্তাহের অন্যদিনগুলো আমার অফিস আর রাইয়ানের প্রাইভেট এসব নিয়েই কেটে যায়। তাই আজ একা একা খেতে খুব খারাপ লাগবে।'

রুদ্র হেসে বলল, 'ওহ এই কথা? নিশ্চয়ই আমি জয়েন করব আপনার সাথে, ইট উইল বি এন অনার।'

রুদ্র ভেতরে ভেতরে উড়ছিল। মুখের হাসিতে সে উড়ন্ত মনের ছায়া পড়ল খানিকটা।

মনীষা রুদ্রর উচ্ছল বিড়াল চোখদুটো থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ!'

কিছুক্ষণের মাঝেই টেবিল সাজানো হয়ে গেল। সাদা ভাত, মুগের ডাল, ফুলকপির তরকারি আর কৈ মাছ ভাজা। খাবার টেবিলে বসার পর মনীষা বলল, ‘খাবারের আইটেম কিন্তু একেবারেই কম, তুমি প্লিজ মাইন্ড করো না।’

‘কী যে বলেন, মাইন্ড করার প্রশ্নই আসে না, আমি এমনিতেও তেমন পেটুক নই। এক পদ তরকারি দিয়েই ভাত খাওয়া হয়ে যায় আমার।’

‘বাড়িতে তোমার কে কে আছে?’ প্লেটে ভাত বেড়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করল মনীষা।

‘বাবা, মা, আর বড় বোন। বোনের অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু শ্বশুর বাড়ি খুব কাছে হওয়ায় রোজ একবার করে চলে আসে আম্মার কাছে।’

‘মেয়েরা মায়ের কাছাকাছি থাকাটাই ভালো।’

‘আপনি কোথায় জব করছেন?’ রুদ্রর প্রশ্ন।

‘একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে। ভালোই দেয় ওরা, আমার আর রাইয়ানের মোটামুটি চলে যায়।’

ঠিক সে সময় রুদ্রর মোবাইলটা বাজল।

অমৃতার কল।

রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে হড়বড় করে অনেকগুলো কথা বলে ফেলল অমৃতা। রুদ্রর হাসিমাখা মুখটায় চকিতে একটা গাঢ় ছায়া পড়ল। ভ্রু দুটো কুঁচকে গেল তার।

মনীষা সবেমাত্র প্লেটে ভাত, তরকারি নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করেছে। রুদ্রর দিকে চোখ পড়তেই একটু আতঙ্কিত গলায় বলল, ‘কী ব্যাপার সব ঠিক আছে তো?’

রুদ্র ফোন কাটল। তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র তার মাথার ওপর থেকে ছাদ উড়ে গেছে।

মনীষা আবার প্রশ্ন করল, ‘ইজ এভরি থিং অলরাইট?’

রুদ্র খুব ভারী একটা নিশ্বাস ফেলে অস্থির গলায় বলল, ‘আই এম সরি মনীষা! আমাকে উঠতে হবে।’

‘খারাপ কোনো সংবাদ?’

‘আমার বান্ধবীটার বিয়ে ভাঙার কথা ছিল কিন্তু ভাঙেনি, আজ সন্ধ্যায় ওর বিয়ে হচ্ছে পরিবারের পছন্দের ছেলের সাথে। হঠাৎ কী করে যে সব পাল্টে গেল কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আর এদিকে আমার যে বন্ধুর সাথে ওর প্রেম ছিল

সে বন্ধুটি একদম পাগলা কিসিমের। যেকোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। আমার এক্ষুনি যেতে হবে ওর কাছে। আই হ্যাভ টু গো।'

'ওহ! তাহলে তো খুব ঝামেলার কথা!' বিষণ্ন শোনাল মনীষার গলা। 'আমি কথা দিচ্ছি, আরেকদিন আপনার সাথে অবশ্যই লাঞ্চ করব অথবা ডিনার। আজকে আমায় মাফ করে দিন!

হক সাহেব ইলেকশনে জেতার পর বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেছে। ছুটির দিনগুলোতেও এখন বাড়িতে নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটে। নিচতলার বৈঠকখানায় বিকেলের পর থেকেই চলতে থাকে মিটিং, সে সাথে পাল্লা দিয়ে চা নাশতার মহড়া। ভৃত্যরা কাপের পর কাপ চা বানাতে গিয়ে হিমশিম খায়। কোনো কোনো ছুটির বিকেলে আবার সবাইকে চমকে দিয়ে হাজির হয় মিডিয়া।

এসব হই হট্টগোলের বিন্দু মাত্র রেশও সামির কাছে পৌঁছে না। সে তার তিনতলার নির্জন কক্ষটিতে ভারি নির্বিঘ্নে দিন যাপন করে। কোনোদিন ভুলেও উঁকি মেরে দেখতে আসে না নিচতলায় কী এমন ঈদ উদযাপিত হচ্ছে।

আজ ব্যতিক্রম এক ঘটনা ঘটল। বিকেলের একটু আগেই বৈঠকখানা লোকজনে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। সামি ঝড়ের বেগে অনেকটা দৌড়ে এসে বৈঠকখানার দরজাটা খুলল। ঘরের ভেতর জমাট বাঁধা ঠাণ্ডা। এসি চলছে। জানালার পর্দা সরানো বলে কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যরশ্মি ঢুকে ঘর আলোকিত করে রেখেছে। প্রায় আট দশজন মানুষের ভেতর মধ্যমণি হয়ে বসে কথা বলছেন হক সাহেব। সামির ঝটিকা আগমন তাঁর মুখের কথা কেঁড়ে নিল। কুঞ্চিত কপাল নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ চোখে তিনি চাইলেন তার একমাত্র আদরের পুত্রটির দিকে।

'আব্বা, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'বলো!'

ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মুখে কোনো কথা নেই। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সামির দিকে।

সামি তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। প্রায় বেহেড। আক্রোশে ফেটে পড়ে সে কৈফিয়ত চাইবার ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি কি বিভার বাসায় ফোন দিছিলা?'

এ প্রশ্নে হক সাহেব কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন। ছেলের কাণ্ডজ্ঞানের এহেন অভাব দেখে যথেষ্ট বিরক্তও হলেন কিন্তু প্রকাশ করলেন না। স্থির গলায় বললেন,

'তুমি বাইরে অপেক্ষা করো, আমি আসছি।'

খানিক বাদে তিনি এসে বসলেন লিভিং রুমের সোফায়। চাকর-বাকরের মাধ্যমে সামির আম্মাও খবর পেয়ে গেছেন। তিনি শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছেন নিচে। এসেই হইহই শুরু করে দিলেন, 'আমার বাচ্চাটার কী হয়েছে?

সামি ধমকে উঠল, 'আম্মা প্লিজ চুপ করো! জরুরি কথা বলতেছি!'

আম্মা বেচারি চুপ করে গেলেন। পিতা-পুত্রের বাকবিতণ্ডার মাঝে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে লাগলেন।

হক সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'বলো, কী জানতে চাও?'

তুমি বিভার বাবাকে ফোন দিয়েছিলে?'

'বিভা কে? ওই হিন্দু মেয়েটা?'

প্রশ্নের ধরনটা গায়ে জ্বালা ধরাল সামির। সে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ওই হিন্দু মেয়েটা আমার বন্ধু, এ খবরটা তো তোমার জানার কথা ছিল।'

'জানা ছিল, কিন্তু বন্ধুর চেয়ে বেশি কিছু হবার মনোবাসনা সে নিজের ভিতরে লালন করছে এ খবরটা জানতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।'

সামি ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'তুমি কি আমার পিছনে স্পাই লাগিয়েছ?'

হক সাহেব চুপ করে রইলেন। উত্তর দিলেন না। তার এই মৌনতা সম্মতির দিকেই ইঙ্গিত করল।

'কবে থেকে?'

'যেদিন থেকে প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।'

'আশ্চর্য! আমার কি পার্সোনাল লাইফ বলতে কিছু নাই?'

'অবশ্যই আছে!'

'এটা কেমন পার্সোনাল লাইফ? আমি আমার বন্ধুদের সাথে কী করলাম কী বললাম সে খবর তোমার কাছে যায় কেমনে?'

'খবরটা আমার কাছে আসা জরুরি ছিল, তাই এসেছে। এর চেয়ে বেশি কিছু তোমার জানার প্রয়োজন নেই।'

'তুমি কি আমার বেডরুমে হিডেন ক্যামেরা লাগাইসো?'

'না।'

'তাহলে?'

'এই বাড়িতে আমার লোকজন সর্বদাই সজাগ থাকে। তাদের ওপর কান খাড়া করে রাখার নির্দেশ আছে। তারা আদেশ পালন করেছে শুধু। ঘটনা

এতটুকুই।'

সামির মুখটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। কয়েকটা সেকেন্ড অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল সে তার বাবার দিকে, তারপর অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন এমন করলে তুমি?'

'প্রয়োজন ছিল।'

'প্রয়োজনটাই বড় হয়ে গেল তোমার কাছে? আমার কথা একবারও ভাবলে না?'

তোমার কথা ভেবেই কাজটা করা হয়েছে। আর তাছাড়া মেয়েটার জন্যও এ বিয়ে খুব জরুরি ছিল। শুধু শুধু তুমি একটা মেয়েকে ঝুলিয়ে রাখবে কেন? বিয়ে তো করতে পারতে না কোনোদিন, ওর পরিবার রাজি হতো কি না কখনো এদিকটা একবারও ভেবে দেখেছ? এখন ভালোয় ভালোয় মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাক, আর এদিকে তুমি তোমার নিজের জীবনে, নিজের ক্যারিয়ারে মনোযোগ দাও।'

এটুকু বলে হক সাহেব ওঠে পড়লেন, জরুরি গলায় বললেন, 'আমার সময় নেই, মিটিং চলছে।'

আম্মা এতক্ষণে মুখ খুললেন, 'সামি শোনো, বাবা আমার! তোমার আব্বা যা করেছেন তোমার ভালোর জন্যই করেছেন। তোমার আব্বা ওই ভদ্রলোককে ঘটনাটা না জানালেও আজ বাদে কাল ওঁর কানে যেতই সত্যটা। তখন আরো অনেক বেশি ঝামেলা হতো। বরং এখন ভালো হলো যে মেয়েটার বিয়েটা ভাঙল না। মেয়েটা সেটেল হয়ে গেল।'

'ও! তুমিও তাহলে এ ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলে, বাহ চমৎকার!' একটা গভীর হতাশার নিশ্বাস বেরিয়ে আসলো সামির বুক থেকে।

'ষড়যন্ত্র নয়, আমরা যা করেছি বুঝেশুনেই করেছি।'

'এত বেশি বুঝতে গেলে কেন তোমরা?'

হক সাহেব একটু উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, তা বোঝার মতো জ্ঞান বুদ্ধি তোমার এখনও হয়ে ওঠেনি। বাপের হোটেলে খাও বলে টের পাওনা কত ধানে কত চাল। বাইরের দুনিয়াটা শ্বাপদসংকুল। তোমাকে আমার সমস্তটা দিয়ে আগলে রেখেছি। লাট সাহেবের জীবনযাপন করছ। তোমার বয়সে থাকতে আমরা এসব কিচ্ছু পাইনি।'

সামি কেমন অদ্ভুত বিষাদ মাখা গলায় বলে উঠল, 'লাগবে না আমার

লাটসাহেবের এ জীবন!'

'কী বলতে চাও তুমি?'

সামি এবার বাবার চোখে চোখে তাকাল, দৃঢ় গলায় বলল, 'এমন প্যারাসাইট লাইফ আমার লাগবে না। আমার ইচ্ছা, মূল্যবোধ, মতামতের যেখানে কোনো দাম নেই, সে জীবন যতই বিলাসবহুল হোক না কেন আমার কাছে লোভনীয় নয়।

'পেয়ে গেছ তো তাই দাম দিতে জানছ না, তোমার বয়সে থাকতে আমরা এমন একটা জীবনের জন্য তড়পাতাম। তোমার বন্ধুরাও তড়পায়, তোমার প্রাণের অধিক প্রিয় বন্ধুরা।'

সামি বিকারগ্রস্থ গলায় আলুথালুভাবে বলল, 'সবচেয়ে বড় কথা আমার কোনো প্রাইভেসি নেই। এভাবে আমি থাকতে পারব না।

'কী করতে চাও?'

'আমি চলে যাচ্ছি।'

আম্মা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'চলে যাচ্ছি মানে? কোথায় যাবি তুই?'

'জানি না।' ঘোর লাগা গলায় বলে সামি।

হক সাহেবের মুখের ভঙ্গিতে একটি বিহবল ভাব ফুটে উঠল। তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কিছুটা সময় নিলেন। তারপর বললেন, 'যেতে চাইলে যেতে পার, কিন্তু জেনে রেখ, এ বাড়িতে না থাকলে তোমার পেছনে আর একটা কানা কড়িও খরচ করা হবে না। তোমার জীবনের দায়ভার সম্পূর্ণ তোমার নিজের।'

'তাই হবে।' বলল সামি

আম্মা উদ্ভ্রান্তের মতো চিৎকার করে বললেন, 'এসব কী বলছিস তোরা?' এটুকু বলে হক সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলতে জ্বলতে বললেন, 'তুমি এসব কী বলছ? আমার ছেলেকে বের করে দিচ্ছ তুমি?'

সামির আব্বা চুপ। তার চোয়াল শক্ত। চক্ষুদ্বয় স্থির।

'একটা কানা কড়িও তোমার আর খরচ করতে হবে না আমার জন্য। টাকার বিনিময়ে তুমি আমার স্বাধীনতা কিনে নিয়েছ।

হক সাহেবের চোখ দুটো কিঞ্চিৎ ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি প্রস্তরীভূত হলেন।

'আমি যাচ্ছি।'

আম্মা দৌড়ে আসলেন, 'কী সব আজেবাজে কথা বলছিস তুই এসব হ্যাঁ? যাচ্ছিস মানে? কোথায় যাচ্ছিস?'

হক সাহেব বরফ শীতল গলায় বললেন, 'সামির আম্মা! ওকে যেতে দাও, কয়েকদিন বাইরের দুনিয়াটা দেখে আসুক, তারপর সুড়সুড় করে বনের পাখি বনে ফেরত আসবে। পেটে খাবার না পড়লে প্রেম ভালোবাসা লেজ তুলে পালাবে।'

'বাবা হয়ে তুমি এমন কথা বলতে পারলে? এত নিষ্ঠুর তুমি কী করে হলে? আমার একটা মাত্র ছেলে!'

'তোমার একটা মাত্র ছেলের যদি তোমাকে প্রয়োজন হয় তাহলে ঠিকঠিক তোমার কাছেই ফেরত আসবে। একটু শান্ত হও।'

কথাগুলো বলে একটু থামলেন তিনি তারপর সামির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'আর হাঁ আজকের পর থেকে তোমার ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার নিজের। তোমার গায়ের কাপড়, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ সমস্ত কিছু আমার টাকায় কেনা। মনে রেখ।'

সামি পকেট থেকে তার আই ফোন সেভেন প্লাস বের করে রাখল বুক শেঙ্কের ওপর। তারপর বের করল মানিব্যাগ। এমনকি হাতের ঘড়িটাও খুলে নিল। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে। চোখের দৃষ্টি ভারি অস্থির। জিনিসগুলো বুকশেক্ষের ওপর একটু বেশি সময় নিয়েই রাখল। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি!'

আম্মার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে থাকল।

সামি বেরিয়ে যাবার পর হক সাহেব সোফার ওপর বসে পড়লেন ধপ করে। স্ত্রীকে বললেন, 'সামির মা, তোমার ছেলে বাইরের দুনিয়ায় আমার সাপোর্ট ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টাও টিকতে পারবে না। দুদিনের মধ্যেই ফেরত চলে আসবে। তুমি চিন্তা করো না। এ শিক্ষাটা ওর দরকার ছিল। একটু বুঝুক যে সোনার চামচ মুখে নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে, সে সোনার চামচটা আকাশ থেকে আচমকা পড়েনি, সেটা গড়ে উঠেছে তার পিতার বহুদিনের রক্ত পানি করা শ্রম দিয়ে।'

বাড়ির সদর দরজার সামনে বন্ধুরা অপেক্ষা করছিল। ততক্ষণে রুদ্রও চলে এসেছে।

লিভিং রুম থেকে মাথা হেঁট করে সামি বেরিয়ে আসতেই ওরা সবাই

সামিকে ঘিরে ধরল। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলল না।

সামি কারো চোখে চোখে চাইলো না, মাথা নত অবস্থাতেই শক্ত গলায় বলল, 'চল!'

হেঁটে বেরিয়ে আসলো ওরা, মাঝ দুপুরের তেজি রোদ মাথায় নিয়ে। পোর্টিকোতে একলা পড়ে রইল সামির লাল মার্সিডিজ বেঞ্চ। রাস্তায় নামার পর অমৃতাই প্রথম কথা বলল, 'কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?'

সবাই সামির মুখের দিকে তাকাল। তার মুখটা এখন ভারি মেঘলা, প্রবল কালবৈশাখী ঝড়ের আগে আকাশ যেমন কালো মেঘে মেঘে থমথমে হয়ে থাকে, ঠিক সেরকম।

হৃদি সামিকে প্রশ্ন করল, 'তোর গাড়ি নিলি না কেন?'

সামি এ প্রশ্নের উত্তরে একটু হাসার চেষ্টা করল। ক্ষীণ গলায় বলল, 'ওটা আমার গাড়ি না, আমার বাপের গাড়ি।'

রুদ্র বলল, 'তুই কি ঝগড়া করছিস আংকেলের সাথে?'

'বাদ দে, চল বিভার বাসায় যাই।'

'বিভার বাসায় যাওয়াটা কি এখন ঠিক হবে?' আপনাআপনি কথাগুলো বেরিয়ে আসলো হৃদির মুখ থেকে।

অমৃতা বলল, 'বিভার বিয়েতে আমাদের যাওয়া নিয়ে রেস্ট্রিকশন আছে। ওর আব্বা বলেছেন বিয়ে পড়ানোর পর আমরা বিভার সাথে মিট করতে পারব। তার আগে না।'

'আমি কি বিয়া খাইতে যাব নাকি? আমি যাব ওই হালার পুতরে পিটাইতে। তোরা কেউ যাবি আমার সাথে?'

আকাশ সামির পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'দোস্ত শোন, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর।'

সামি আকাশের হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিলো, 'মাথা ঠাণ্ডাই আছে, তোরা কেউ আমার সাথে যাবি নাকি বল।'

আকাশ থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

রুদ্র বলল, 'কী করতে চাস তুই?'

'ওই হারামজাদারে পিডায়া শোয়ায় দিব। আর বিভারে উঠায় নিয়া আসব।'

হৃদি শ্লেষের একটা হাসি হেসে বলে উঠল, 'অসম প্ল্যান!'

সামি আগুন লাগা চোখে তাকাল ওর দিকে, ধমকে ওঠে বলল, 'তোর কাছে

কি কথাটা ফাইজলামি মনে হইলো?’

হৃদি ধমক খেয়ে মিইয়ে গেল, চিঁচিঁ করে বলল, ‘না ফাইজলামি মনে হবে কেন?’

সামি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে সিংহের মতো গর্জে ওঠে বলল, ‘তোরা কি আমার লগে আছস? নাকি নাই?’

বন্ধুরা কয়েকটা সেকেন্ড কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। স্থিরচিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

এক সময় রুদ্র বলল, ‘আমরা অবশ্যই আছি তোর সাথে।’ সে যে যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছে তা তার গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল।

সামি হুঙ্কার দিলো, ‘তাহলে চল!’

কেউ কোনো বাক্য ব্যয় না করে সামির পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। পাগলটা কোথায় যাচ্ছে, কী অনর্থ করতে যাচ্ছে তা আল্লাহ মালুম!

বিকেল চারটায় নিকেতনে বিভাদের ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে এসে পৌঁছলো ওরা। এসে দেখা গেল বিয়ে বাড়ির গেট সাজানো হচ্ছে। নানা লোকজনে ভরে আছে জায়গাটা।

ওরা এসেছে দুটা সিএনজি নিয়ে। সামির বাসে অথবা রিকশায় চড়ার অভ্যাস নেই, তাই বন্ধুরা সবাই মিলেই ডিসিশন নিয়েছে টাকা একটু বেশি খরচ করে হলেও আজকে তারা সামিকে কোনো রকমের উটকো কষ্ট দেবে না।

সিএনজি থেকে নেমে এপার্টমেন্টের উল্টা পাশের ফুটপাতে জড়ো হয়ে দাঁড়াল ওরা পাঁচজন। বৈশাখী সূর্য তখনও জ্বলছে। গরমটাও মারাত্মক। ঘেমে-টেমে একদম গোসল করে ফেলার মতো অবস্থা।

এখান থেকে চারতলার ফ্ল্যাটের বিভার ঘরের জানালা দেখা যায়। বন্ধুরা এসে প্রথমেই জানালাটির দিকে নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, বিভাকে এক নজর দেখার আশায়। এর আগে কোনো দিন এমন চোরের মতো উঁকিঝুঁকি মারতে হয়নি তাদের। তাদের বন্ধুত্বের মাঝে কখনো কোনো দেয়াল ছিল না, ছিল না কোনো তৃতীয় পক্ষ। অথচ আজ বিভার জীবনের একটি বিশেষ দিনে এসে তারা কতটাই না পর আর অবাঞ্ছিত হয়ে উঠল। ভাবতে অবাক লাগে।

বিভার ছায়াও দেখা গেল না জানালার আশেপাশে। সামি আদেশ দিলো, 'ফোন লাগা ওরে!

'কারে?' রুদ্রর প্রশ্ন।

'আমার শ্বশুররে! গর্দভ কোথাকার কারে আর ফোন দিবি, বিভারে ফোন দে।'

আদেশ পালন করা হলো। প্রায় তিন চারবার বিভার ফোনে ডায়াল করা হলো। জানা গেল যন্ত্রটা বন্ধ। সংযোগ হচ্ছে না।

অস্থির সামি রাস্তা পার হয়ে এপার্টমেন্টের সামনে চলে আসলো। পেছন পেছন আসলো বাকিরা।

গেইটের সামনে বিভার পিসতুতো দাদা তাপস দাঁড়িয়ে ছিল। সামিকে

ষাঁড়ের মতো তেড়ে আসতে দেখে সে পথ আটকে দাঁড়াল। সামিকে যে সে চেনে না তা নয়, খুব ভালো করেই চেনে। একবার তাদের কোম্পানির লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিল কাজে সামির আব্বার সাহায্যও নিয়েছিল সে, সামির মনে আছে। এরপর থেকেই তাপস সামিকে দেখলে তেলতেলে হাসি দিত। খাতির জমানো আলাপ করত। কিন্তু আজকে তার মুখের চাউনি অন্য কথা বলছে। মনে হচ্ছে তার সামনে দাঁড়ানো সামিকে সে চেনেই না। উটকো ফালতু লোক বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে লোকে যেমন করে পথ আটকে দাঁড়ায়, তাপসের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও আজ ঠিক সেরকম।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

সামি কিন্তু তাপসের প্রশ্নটার দিকে কর্ণপাতও করল না। তাপসকে পাশ কাটিয়ে সে কলাপ্সেবল গেইটের ভেতরে ঢুকে গেল।

অঘটনটা ঘটল তখনই। হইহই করে তিন চার জন হোঁৎকা গোছের লোক এগিয়ে এসে সামিকে রীতিমতো ছেঁকে ধরল। বোঝা গেল লোকগুলোকে তাপসই ইশারা করেছে।

একজন ক্ষুব্ধ গলায় প্রশ্ন করল, 'কী চাই?'

'ওপরে যাব।' সামি উত্তর দিলো গমগম করে।

'যাওয়া যাবে না, নিষেধ আছে।

'হু দা হেল আর ইউ?'

'ইংরেজি মাড়াবেন না, আপনাকে ভেতরে ঢুকতে না দেওয়ার নির্দেশ আছে আমাদের ওপর।' এ লোকটার কথায় স্পষ্ট কলকাতার টান।

মুহূর্তও গড়াল না, রাগে রি রি করতে করতে সামি সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো।

বাকি দুজন ঝড়ের গতিতে এসে সামির দু হাত দু দিক দিয়ে চেপে ধরল।

আকাশ সাথেসাথে পেছন থেকে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'কী ব্যাপার হচ্ছেটা কী? হাত লাগাবেন না বলে দিলাম, ছাড়ুন বলছি!'

'দাদা হাত কে লাগিয়েছে আগে সে প্রশ্নটা করুন? উনিই তো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন প্রণব বাবুকে।

সামি সাপের মতো ফুঁসছিল।

অমৃতা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনারা ছাড়-ন ওকে, হাত ছেড়ে দিন।'

হৃদি বেশ ঘাবড়ে গেছে। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে তাপসকে বলল, 'তাপসদা

প্লিজ, ওই লোকগুলোকে থামতে বলুন, আমরা বিভার কত দিনের বন্ধু! আমাদের সাথে ওর বিয়ের দিন এমন আচরণ করা কি ঠিক হচ্ছে?'

তাপস হৃদির কথা খুব একটা পাত্তা দিলো বলে মনে হলো না। যেমন দাপুটে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে।

আর অন্য তিন বন্ধুর মাথায় তখন রক্ত ওঠে গেছে। রুদ্র আর আকাশ তেড়েমেড়ে লোক দুটোর হাত থেকে সামিকে মুক্ত করতে গেল।

'ওই ব্যাটা কথা কানে যায় না? হাত না লাগাইতে কইলাম।' চেঁচিয়ে উঠল রুদ্র।

দুটো দলের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। অমৃতাও বাদ থাকল না। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িওয়ালা চোয়াড়ে চেহারার এক লোকের ভুড়িতে সে ঘুসি বসিয়ে দিলো।

এমন সময় সিঁড়িঘরের দিক থেকে একটা পরিচিত গলার স্বর ভেসে আসলো, 'এই থামো তোমরা, সবাই থামো বলছি!'

বিভার আব্বা নেমে এসেছে নিচে।

'কী হচ্ছে এখানে? বলি কী হচ্ছে এসব? এটা ভদ্রলোকের বাড়ি!'

প্রণব নামের লোকটা কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে সামির দিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠল, 'কাকাবাবু, এই তো সে ছেলে যার ওপর আপনি নজর রাখতে বলেছিলেন। এই ছেলে জোর করে ওপরে ওঠে যেতে চাইছিল।'

সামি বিভার আব্বার চোখে চোখে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, 'আমি একবার বিভার সাথে দেখা করব।

বিভার আব্বার মুখে হঠাৎ করেই একটি ক্রূর ভাব চলে আসলো।

'তুমি এ মুহূর্তে বিদেয় হও, গেট লস্ট!' এটুকু বলে অমৃতাদের দিকে চোখ দিয়ে বলল, 'তোমরাও! দয়া করে এখান থেকে বিদেয় হও।'

অমৃতা এ কথা শুনে সাথে সাথে বন্ধুদের আদেশ করল, 'চল বের হই।' সামি গোঁ ধরা গলায় বলল, 'আমি যাব না, বিভার সাথে একবার দেখা না করে আমি কোথাও যাব না।'

বিভার আব্বা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এ মুহূর্তে যদি তোমরা এখান থেকে বিদেয় না হও তো আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব!'

বন্ধুরা সামির হাত ধরে টানতে টানতে গেটের বাইরে নিয়ে আসলো। হৃদি বলতে লাগল, 'এত অপমানের পর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

চলে আয়।'

বাইরে এসে ফুটপাতের ওপর ধপ করে বসে পড়ল সামি। তার মুখখানা দেখাচ্ছে পাণ্ডুর। চোখ দুটোতে দুরূহ হতাশা।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভারি মায়া হলো হৃদিতার।

বুকের ভেতর থেকে একটা দলা পাকানো কান্না হুড়মুড়িয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল গলা বেয়ে। মুখে ওড়না দিয়ে সে কান্না চাপানোর চেষ্টা করল। পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অমৃতা ওর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আরে বোকা কাঁদিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলল বটে, কিন্তু তাকেও দেখাচ্ছে ভারি বিবর্ণ।

আকাশ অনেকটা ক্ষীণ গলায় অমৃতাকে প্রশ্ন করল, 'তুই কি জানিস বিয়েটা কোথায় হচ্ছে? বাড়িতেই? নাকি কোনো কমিউনিটি সেন্টারে।

'জানি না রে, কমিউনিটি সেন্টারেই তো হওয়ার কথা ছিল। প্ল্যান কি চেঞ্জ হয়েছে কি না কে জানে!

ঠিক সে সময় সামি হঠাৎ কাতর স্বরে বলে উঠল, 'আচ্ছা বিভাকে কি শুধু একবার দেখার কোনো উপায় আছে? শুধু একবার?'

বিভাকে সাজানোর জন্য তিনজন বিউটিশিয়ান এসেছে।

একজন হেয়ার ডো করছে, একজন হাতে মেহেদি পরাচ্ছে এবং তৃতীয়জন মুখ সাজাচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলছে এই সাজুগুজুর পালা। ঘর ভর্তি আত্মীয়স্বজন গিজগিজ করছে। মাছির মতো ভনভন করে একটানা কথা বলে যাচ্ছে সবাই।

বিভার মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম করছিল। তার চায়ের নেশা মারাত্মক। এ মুহূর্তে প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে চায়ের। মনে হচ্ছে এক কাপ চা এক নিমেষে অবসান ঘটাতে পারে সমস্ত যন্ত্রণার। চেয়ারের গদিতে পিঠ এলিয়ে দিয়ে বিভা তখন ঘোরলাগা চোখে শুধু একটা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ দেখছিল। বুকের ভেতরটা কেমন যেন খরশান হয়ে আছে। মনে হচ্ছে কয়েক মণ ওজনের এক বোঝা জোর করে সেখানে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনো অনুভূতি কাজ করছে না। শুধু হুহু করে উড়ে বেড়াচ্ছে এক রক্ত পানি করা হিম হিম খরশান হাওয়া।

সাজগোজের দিকে বরাবরই তার ঝোঁক ছিল মাত্রারিক্ত। নিজেকে যত্ন করে সময় নিয়ে সাজানোর মাঝে সে আবিষ্কারের আনন্দ খুঁজে পেত। গত একটা বছর ধরে তার ঝোঁকটা একটু একটু করে ব্রাইডাল মেকআপের দিকে হামাগুড়ি দিচ্ছিল। ফেসবুকে অনেকগুলো ব্রাইডাল মেকআপের গ্রুপও ফলো করে রেখেছিল সে। কার কাছে সাজবে, কীভাবে সাজবে, কোন ধরনের মেকওভার হবে সমস্ত কিছু তার প্ল্যান করা ছিল। এমনকি কোন ফটোগ্রাফারকে বিয়ের অনুষ্ঠানে ছবি তোলার জন্য ঠিক করা হবে এ নিয়েও জল্পনা-কল্পনা চলছিল। এর মানে এই না যে বিভা বিয়ে করার জন্য মরে যাচ্ছিল। তার শুধু একবার মন মতো বউ সাজার খুব শখ ছিল।

কিন্তু এ কথাতো ঠিক আজ খুব ভোরে, সামির বাসায় বন্ধুরা সবাই গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার পর, ভোরের সোনাবরণ আলো যখন প্রথম জানালায় এসে টোকা দিলো, তখন একটি ভারি সুন্দর পবিত্র স্বপ্নের জন্ম হলো। স্বপ্নটি পায়রার মতো উড়ে উড়ে মনের বদ্ধ কপাট খুলে দিলো। বিভা চোখ চেয়ে দেখল সামির

সাথে তার বিয়ে হওয়ার দিনটি।

তার বিয়ের শাড়ির রংটি কেমন হবে? কাতান শাড়ি পরবে? নাকি মসলিন? নাকি লেহেঙ্গা পরবে? সামির শেওয়ানির রংটা কী হলে ভালো হয়? হৃদি অমৃতা ওরাই বা কীভাবে সাজবে বিয়ের দিন? অমৃতাটা কি সেদিনও শাড়ি টারি কিছু পরবে না? সে ঠিক করল তার বিয়ের দিন সে অমৃতাকে শাড়ি পরতে বাধ্য করবে। হৃদি বলেছিল বিভার বিয়েতে ওরা নাচবে। মনে মনে ঠিক করল সে নিজেই সে নাচের কোরিওগ্রাফার হবে।

তারপর....

বিয়ের পর এ বাড়িতে সামির সাথে তার নতুন জীবনের শুরু। বিভাকে দূরে যেতে হবে না। ছেড়ে যেতে হবে না এই দেশ আর প্রাণের শহরটাকে। বাবা-মা কাছে থাকবে। কাছে থাকবে বন্ধুরা। কাছে থাকবে সর্বক্ষণ ভালোবাসার মানুষটা।

ইস, এত সুখ এ জীবনে ধরবে তো?

না ধরল না। সাদা রঙের স্বপ্নের সে পায়রা কপাট বন্ধ করে দিয়ে উড়াল দিলো দূর অজানার দেশে। আর ফিরবে না সে। বিভা জানে।

বিভার চোখের কোণ বারেবারে ভিজে যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আই মেকআপ।

বিউটিশিয়ান মেয়েটি এবার একটু ধমকের সুরেই বলল, 'এভাবে কান্নাকাটি করলে তো আপু আপনার মেকআপ এখনই নষ্ট হয়ে যাবে। রাত পর্যন্ত থাকবেন কী করে?'

কোনো এক আত্মীয়ের মুখ থেকে শোনা গেল, জামাই রওয়ানা দিয়েছে কিছুক্ষণের মাঝেই পৌঁছে যাবে। বিভার বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে গেল।

অবশেষে অভিজিৎ রাজি হয়েছিল। শেষমেশ ভেঙে যাওয়া বিয়েটা আবার জোড়া লাগল।

অভিজিৎ তার মায়ের সামনে বিভার এহেন লজ্জাহীন মিনতি দেখে একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। বসা থেকে ওঠে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলেছিল, 'কী বলতে চান, এদিকে আসুন' বলে সে ভেতর দিককার একটা ঘরে নিয়ে গেল বিভাকে।

বিভা বলল, 'অভিজিৎ দা প্লিজ এই বিয়েতে আপনি না করবেন না।'

অভিজিৎ ভ্রুকুটি করে সন্দিহান চোখে তাকাল বিভার দিকে

'কিন্তু কেন? আপনি তো অন্য একজনকে ভালোবাসেন।'

বিভা চোখ নামাল, বোকার মতো স্বীকারোক্তি করল, তার সাথে আমাকে বিয়ে দেবে না আমার পরিবার! '

অভিজিৎ শ্লেষের হাসি হেসে বলল, 'ভারি স্বার্থপর তো আপনি, আপনার ফ্যামিলি আপনার প্রেম মেনে নিচ্ছে না বলে আমার জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইছেন? আমি কী দোষ করেছি বলুন তো? আমি কেন জেনেশুনে এমন একটা দাম্পত্য সম্পর্কের দায় মাথা পেতে নেব? যে দাম্পত্য জীবন আমাকে কোনো দিন সুখী করবে না?'

বিভার মাথায় তখন কোনো যুক্তি খেলছে না। একটা অজানা, অদেখা বিপদের আশঙ্কা তার সারা শরীরকে তীরের মতো বিদ্ধ করে চলেছে। কেন তা সঠিক জানে না বিভা, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল অভিজিৎ তাকে বিয়ে না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সে কাঁপা অন্তর নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলে উঠল, 'এই বিয়ে না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

অভিজিৎ বিভার প্রতিমার মতো কাজলটানা জল টলমল চোখদুটোর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করে, 'সর্বনাশ? কীসের সর্বনাশ?'

বিভা অস্ফুটে বলে, 'জানি না। সঠিক জানি না কিন্তু আমার মন বলছে, বিয়েটা হওয়া খুব জরুরি।

হঠাৎ মাসতুতো বোন সেতুর গলার স্বর বিভার ভাবনার ঘরের দরজায় হালকা করাঘাত করল। সেতু ডাকছে, 'বিভাদি! ও বিভাদি!'

বিভা ঘোর ভাঙা গলায় আস্তে করে উত্তর দিলো, 'উঁ?'

সেতু এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা ভালোভাবে একবার পর্যবেক্ষণ করল। তারপর মুখ নামিয়ে আনল বিভার কানের কাছে, খুব নিচু গলায় বলল, 'বিভাদি তোমার বন্ধুরা নিচে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি একটাবার বারান্দায় যাও।'

কেঁপে উঠল বিভা। নড়ে গেল হাত এবং চোখের পাতা। আরও একবার নষ্ট হলো চোখের সাজ।

সেতু লেজ গুটিয়ে পালাল জায়গাটা থেকে।

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ওঠে দাঁড়াল সে। মেয়েগুলোকে বলল, 'তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি।'

নিশ্বাস বন্ধ করে দৌড়ে আসলো ঘরের পাশের লাগোয়া ঝুল বারান্দায়। তখন শেষ বিকেলের আকাশে পলকা পলকা মেঘ। গেটের পাশের কড়ুই গাছের ডালে হাওয়া বইছে মৃদুমন্দ। গ্রিলের কাছে এসে দেখল রাস্তার ওপারে ভিখিরির মতো শুকনো চোখমুখ নিয়ে অবনয়নে দাঁড়িয়ে আছে তার পাঁচ বন্ধু।

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ওরা কতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছে? দুপুরে কিছু খেয়েছে কি খায়নি? সবাইকে অমন জীর্ণ আর খরাগ্রস্ত দেখাচ্ছে কেন?

ওরা মুখ তুলে এদিকটাই দেখছিল। বিভাকে দেখা মাত্র বিদ্যুৎ চমকানোর মতো পাল্টে গেল তাদের মুখশ্রী। ক্লান্ত মুখগুলোয় ভোরের উদ্ভাসিত আলোর মতো ভেসে উঠল প্রশান্তির হাসি। হৃদির চোখজোড়া দেখেই বুঝে ফেলল বিভা, এতক্ষণ কেঁদেছে পাগলিটা। অমৃতার দুচোখ দিয়ে এখনও আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছে। বিভাকে যেন বলছে ওই চোখের ভাষা, তুই ভয় পাস না, সব ঠিক আছে, ঠিক থাকবে।

আকাশ হাসছে, সাথে হাসছে ওর চোখ জোড়া।

রুদ্র হাত পা নেড়ে কী যেন হড়বড় করে বলল। ট্রাফিকের শব্দ আর মানুষের কোলাহল কেটে শব্দগুলো বিভার কান পর্যন্ত আসতে পারল না।

সামি দলটা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তার হাতদুটো প্যান্টের পকেটে ঢোকানো, চোখে রোদ চশমা। বিভা চিনে ফেলল এটা সামির সানগ্লাস না, গ্লাসটা সে ধার করেছে হৃদির কাছ থেকে। নিজেকে আড়াল করার জন্য রোদ চশমার আশ্রয় নিয়েছে গাধাটা। বিভার চোখ বাষ্পান্বিত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে ১ কাচের দেওয়ালের মতো ভাঙছে চারপাশ। সামি কেন সানগ্লাস পরে আছে? ওই চোখদুটো কি বিভা আর কোনোদিন দেখতে পাবে না?

বিভা অশ্রুরুদ্ধ গলায় স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, ‘সামি চশমা খোল, আমার চোখে চোখে একবার তাকা, শেষবারের মতো একবার তাকা, প্লিজ, তোর পায়ে পড়ি!’

সামি বুঝি শুনতে পেল বিভার আকুতি। হঠাৎ চোখ থেকে গ্লাসটা খুলে নিল। চাইল বিভার চোখে চোখে। সে চোখের ভেতর দিয়ে বিভা ওর সমস্ত হৃদয় দেখে ফেলল। থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁর ঠোঁট দুটো। বুক ভেঙে নামল দুকূল ছাপানো কান্না।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে তাদের ডাক পড়ল ওপরে। বিভার আব্বাই ডাকালেন, কাজের লোকের মারফত। সারাদিন ওদের কারও কিছু খাওয়া হয়নি। শরীর দুর্বল।

এর মাঝে সামি ঘটিয়েছে আরেক কাণ্ড। বিভা বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর পর, বিভাকে এক নজর দেখেই কেটে পড়েছে জায়গাটা থেকে। প্রথমটায় বন্ধুরা কেউ তেমন গা করেনি। প্রায় আধা ঘণ্টা সময় পার হয়ে যাবার পর সামির মোবাইলে ডায়াল করে দেখা গেল ফোন বন্ধ। সবাই মিলে পাগলের মতো ফোনের পর ফোন করতে থাকল। প্রতিবার একই উত্তর, আপনি যে নম্বরে ফোন করেছেন তা এ মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অগত্যা সামির আব্বার কাছেই ফোন করতে হলো। জানা গেল সামি বাড়ি থেকে বেরোবার আগে মোবাইল, মানিব্যাগ, ঘড়ি, গাড়ি সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে তারপরই বেরিয়েছে। এ খবর পেয়ে ওদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল।

হাজার দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়েও গোঁ ধরে বিভার বাসার সামনে সেঁটে রইল সবকটা। বিভার সাথে দেখা না করে এক পাও নড়বে না তারা।

বিভা বসে আছে ড্রয়িং রুমে। তার গায়ে বিয়ের শাড়ি। গলায় কানে ভারী গহনা। সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে তার সিঁথি ভর্তি লাল রঙের সিঁদুর।

ঘরভর্তি নানা অচেনা মানুষজন। যে সোফায় বিভা বসেছে সে একই সোফায় অভিজিৎ আর অভিজিতের মা বসে আছেন।

বন্ধুদের দেখে বিভা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

অমৃতা এগিয়ে গিয়ে সরাসরি অভিজিতের মা কে বলল, 'আন্টি প্লিজ আমাকে একটু জায়গা দেবেন? আমি বিভার বন্ধু, অনেক দূর থেকে এসেছি ওর সাথে দেখা করতে, দেখা করে এখুনি চলে যাব।'

অভিজিতের মা খানিক বিরক্ত হলেও কথাটা রাখল। জায়গাটা ছেড়ে ওঠে দাঁড়াল।

অমৃতা বিভার পাশে বসল।

বিভা খুব শক্ত করে অমৃতার একটা হাত ধরল। এখন আর তার কান্না পাচ্ছে না। ভেতরটা খটখটে শুকনো খড়িমাটির মতো হয়ে গেছে। অনুভূতি শূন্য।

‘কখন যাচ্ছিস ইন্ডিয়া?

‘কাল বিকেলে ফ্লাইট।’

অমৃতা খুব মৃদু গলায় বলল, ‘অল দ্যা বেস্ট দোস্ত। তুই একদম সঠিক কাজ করেছিস। উই আর প্রাউড অফ ইউ। নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছিস। মনে রাখবি নিউ ইজ অলওয়েজ বেটার। আর আমাদের কারও মনে কোনো দুঃখ নেই। তোর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই।’

বিভা উত্তরে কিছু বলল না। কেমন বিভোর চোখে অমৃতার দিকে চেয়ে রইল শুধু। অমৃতা বিভাকে একবার জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। জমকালো শাড়ি আর গয়নার ওপর দিয়ে অবশ্য ঠিকমতো জড়ানো গেল না।

সে অবস্থায় বিভা অমৃতার কানে কানে কেমন স্বপ্ন সমাচ্ছন্ন গলায় বলল, ‘দোস্ত, তোর মনে আছে তো তাই না? আমাদের একটা বৃষ্টিমহল হবে?’

‘মনে আছে। আমাদের স্বপ্নের বৃষ্টিমহল একদিন সত্যি হবে ইনশাআল্লাহ। আর সে দিনটা খুব বেশি দূরে নেই।’

বিভা হাসে, অদ্ভুত গলায় বলে, ‘বৃষ্টিমহল হবে, কিন্তু সে বৃষ্টিমহলে আমি থাকব না।’

অমৃতা মৃদু ধমক লাগায়, ‘বাজে বকিস না তো, তুই কেন থাকবি না? আর প্রয়োজনে বৃষ্টিমহল তুলে নিয়ে যাব তোর কাছে।

বিভা এবার আর কিছু বলে না, চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর একটু ইতস্তত হয়ে বলে ‘দোস্ত, সামিকে দেখিস। ও যেন ভালো থাকে।

‘তুই চিন্তা করিস না, ও খুব ভালো থাকবে।’ অমৃতা ওঠে পড়ল। তার গলায় হালকা কাঁপন ধরেছে। চোখের কোণ হয়ে উঠেছে জলসিক্ত।

কিন্তু অমৃতা জায়গাটা থেকে সরল না। অভিজিতের পাশে এসে দাঁড়াল।

অভিজিৎ ভাবলেশহীন গলায় বলল, ‘কিছু বলবেন?’

তার কথার ধরনে বোঝা গেল অমৃতাদের উপস্থিতি এ মুহূর্তে সে খুব একটা উপভোগ করছে না বরং বিরক্তই হচ্ছে। তার বিরক্তির কারণটা হয়তো যৌক্তিক কিন্তু অমৃতার তাতে কিছু যায় আসে না। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে কর্তৃত্বের গলায় বলল, ‘বিভাকে দেখবেন।’

অভিজিৎ কৃত্রিম হাসল, ‘এটা কি অনুরোধ নাকি হুমকি?’

‘যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন, কিন্তু শুনে রাখুন বিভা যদি ভালো না থাকে, বিভার যদি কিছু হয় মানে খারাপ কিছু হয় তাহলে আমরা আপনাকে ছেড়ে দেবো না।’

‘ছেড়ে দেবেন না মানে? কী করবেন শুনি?’

অমৃতা অত্যন্ত দৃঢ় গলায় বলল, ‘মামলা ঠুকে দেবো আপনার নামে।’

অভিজিৎ শব্দ করে হেসে উঠল, ‘উকিলরা মামলা মোকদ্দমা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না তাই না? তা কেসটা কোন দেশের জুরিসডিকশনের আন্ডারে হবে? বাংলাদেশ নাকি ইন্ডিয়া?’

‘সেটা সময়ই বলে দেবে।’ আর দাঁড়াল না অমৃতা।

আকাশ বিভার পাশে ধপ করে বসে পড়ে বলে উঠল, ‘যেই মাঞ্জা মারছো মামা! কারিনা কাপুর ফেইল!’

রুদ্র আকাশের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ফোড়ন কাটল, ‘কীসের কারিনা কাপুর, আলিফ লায়লা পর্যন্ত ফেইল। আমি তো প্রথমে বুঝিনাই যে এইটা তুই, মনে করছি লাস্ট মোমেন্টে বিয়ের কনে বদলায় গেছে মানে তোর জায়গায় অন্য কাউরে বসায় দেওয়া হইছে। পরে ভালো মতো চায়া দেখলাম না এইটা তুইই, আলিফ লায়লা ভার্সনের বিভা।’

বিভা হেসে ফেলল। অনেকক্ষণ বাদে সে মন থেকে হাসল। এ জোকারগুলা আশেপাশে থাকলে বাতাসে হাসির নানা উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এ জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি মিস করবে সে দেশ ছাড়ার পর।

আকাশ পকেট থেকে মোবাইল বের করতে করতে বলল, ‘নারে দোস্ত, সুন্দর লাগতেছে তোরে, আমার সুন্দর বান্ধবীটার সাথে একটা সেলফি তুইলা নেই।

ছবি তোলার আয়োজন হতে দেখে অমৃতাও ছুটে আসলো। হৃদি একটু দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। ওকেও ধরে নিয়ে আসা হলো। পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে মুহূর্তটা বন্দি করল আকাশের ফোনের ক্যামেরা। বাদ পড়ল শুধু সামি।

পরদিন বিকেলে বিভা যখন উড়ল আকাশে তার প্রাণের শহর, নাড়ির শহর ঢাকাকে ছেড়ে সামিকে তখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বন্ধুরা সব নাওয়া খাওয়া ভুলে হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে জায়গায় জায়গায়।

সামির ক্ষমতাবান পিতা তাঁর একমাত্র পুত্রের সন্ধানে র‍্যাব পুলিশ সব একাকার করে ফেলছেন। দেশের প্রথম সারির কয়েকটা দৈনিক পত্রিকায় নিখোঁজ সংবাদও ছাপা হয়ে গেছে তার নামে। শুধু এই নয়, সন্ধানদাতার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার। এমপি'র ছেলে নিখোঁজ এ খবরটা আবার কোনো কোনো পত্রিকা একটু রসিয়ে রসিয়েও প্রকাশ করল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও খবরটা সয়লাব হয়ে গেল।

বিমান উড়ল আকাশে। বিকেলের সোনা রং রোদ্দুর ভেদ করে ধীরে ধীরে ওঠে আসতে লাগল মেঘের অরণ্যে। বিভার সিট জানালার কাছে। কাচের ভেতর দিয়ে মুখ নিচু করে দেখছে সে নিজের দেশটাকে। ওপরে উঠতেই জমিনটা কেমন ছবির মতো হয়ে গেল, খেলনার মতো ছোট হয়ে গেল, গাছপালা, রাস্তাঘাট, ঘর বাড়ি। ওই পুতুলের মতো বাড়িঘর আর রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে চোখ ভিজে আসে বিভার। বুক খালি লাগতে থাকে। একটু বাদেই সূর্য যাবে অস্তাচলে। রাতের আঁধারে ডুববে সব। শহুরে রাস্তা ঝলমল করবে কৃত্রিম আলোয়। রাত কাটবে, আসবে দিন। রোজকার নিয়মে ব্যস্ত হবে যান্ত্রিক নগরী। তার বাবা অফিসে যাবে। মা ব্যস্ত হবে রান্না নিয়ে। গলির মাথায় সবজিওয়ালাটা সময়মতো এসে হাঁকডাক করবে। দুপুরে ছুটা বুয়া আসবে। ঘরদোর মুছবে, ঝাড় দিবে। দুপুরবেলা খাবার টেবিলে মা একলা খেতে বসবে। বিভার চেয়ারটি থাকবে শূন্য। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামবে টিএসসি চত্বরে। বন্ধুরা আড্ডা দিতে ছুটে যাবে দিনশেষে। চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠবে। জমবে আড্ডা। উঠবে হাসির ফোয়ারা। শুধু থাকবে না বিভা। বিভা চলল। আর কখনও আগের মতো করে ফেরা হবে না তার এ শহরে।

ডুকরে কেঁদে ওঠার আগে বিভা একবার স্বগতোক্তি করল, ভালো থেক আমার প্রিয় শহর! ভালো থেক আমার প্রিয় মানুষগুলোকে সাথে নিয়ে।

এদিকে সামি লাপাত্তা।

টানা তিনটি দিন ঝড়ের মতো কাটবার পর আকাশের মোবাইলে হক সাহেবের ফোন পাওয়া গেল। তখন ভোর ছটা। আকাশ সারা রাত ঘুমায়নি দুশ্চিন্তায়। শেষ রাতের দিকে একটু চোখ লেগে এসেছিল। অনেকটা জড়ানো গলায় সে ফোন ধরল, 'হ্যালো স্লামালিকুম আংকেল।'

'ওয়ালাইকুম সালাম, শোনো গর্দভটাকে পাওয়া গেছে। রাত তিনটার সময় কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। বদ্ধ উম্মাদের মতো রেলস্টেশনের ফকিরদের সাথে বসে ছিল। এখন রমনা থানায় আছে। তোমরা গিয়ে নিয়ে এসো। আমি গেলে জেদাজেদি করবে, হয়তো থানা থেকে বেরোতেও চাইবে না।'

এক সাথে অনেকগুলো কথা বলে হক সাহেব থামলেন। আকাশ 'এখুনি যাচ্ছি' বলে তড়িঘড়ি করে ফোন কাটল। রুদ্র সে রাতে আকাশের সাথেই ছিল। কথাবার্তার আওয়াজ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেছে। সে চোখদুটো আধবোজা করে ঘুমো ঘুমো গলায় প্রশ্ন করল, 'কী হইছে?'

'সামিকে পাওয়া গেছে।'

রুদ্র লাফ দিয়ে শোয়া থেকে ওঠে পড়ে বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ্।'

সামি তার নিজের বাড়িতে কোনো মতেই ফিরে যাবে না। তাহলে কোথায় থাকবে সে? আকাশের বাসার মানুষজনের কোনো ঠিক নেই। রাত দুপুরে তার মাতাল বাবা তুলকালাম কাণ্ড ঘটায়, বউ পেটায়। অমন পরিবেশে সামিকে রাখা যৌক্তিক হবে না। এমনিতেই তার মানসিক অবস্থা নাজুক। এ মুহূর্তে তার প্রয়োজন মোটামুটি স্বাস্থ্যকর একটি পরিবেশ। যেখানে প্রাণ খুলে নিশ্বাসটা অন্তত নিতে পারবে। রুদ্রর নিজেরই ঢাকা শহরে কোনো মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, সামিকে রাখবে কোথায়? হৃদির বাসা একটু কনজারভেটিভ। বাড়িতে ছেলে বন্ধুকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তার বাবা মা আপত্তি জানাতে পারে। অতএব ঠিক হলো সামি কয়েকটা দিন থাকবে অমৃতার বাসায়। বাবা-মার সাথে কথা বলে সমস্ত এরেঞ্জমেন্ট করল অমৃতা। গেস্ট রুমে থাকবে সামি। রুমটা ছোট। এয়ারকন্ডিশন নেই। নেই এটাচড বাথরুম। সামির কষ্ট হবে বৈকি। তবে আপাতত এর চেয়ে ভালো কোনো স্থানের হদিসও তাদের কাছে নেই।

এত কিছু ব্যবস্থা করার পর সামি বেঁকে বসল। সে ভাবলেশহীন গলায় যন্ত্রের মতো বলল, 'আমি কোথাও যাব না, কারও বাসায় থাকব না।'

এবার অমৃতার ভারি রাগ ধরে গেল, 'একটা থাবড়া খাবি! কোথাও যাব না মানে? এখানে এই থানার পুলিশ তোরে সারা জীবন পালবে? নাকি তুই সন্ন্যাসী হবি? শালা সিনেমা দেখানোর আর জায়গা পাস না?'

সামি অমৃতার কথায় কান দিলো বলে মনে হলো না, সে মেশিনের মতো টেনে টেনে বলল, 'আমি কোথাও যাব না!'

ইন্সপেক্টর মহোদয় একই ঘরেই বসে ছিলেন। তিনি মুচকি হেসে অমৃতাকে বললেন, 'এক কাজ করুন আপনারা বাসায় যান, ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি উনাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

সামি আসলো বটে কিন্তু তার ভেতর থেকে আগের সে আমুদে ভাবটা সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে গেছে। সারাদিন গম্ভীর মুখে বিছানায় শুয়ে থাকে। কারও দিকে তাকায় না, কথা বলে না। এ যেন তার নির্বাসিত জীবন। রোজ একবার

করে তার মা দেখতে আসে তাকে। মায়ের সাথেও তেমন একটা কথা বলে না। মা এটা সেটা রান্না করে নিয়ে আসে। সামি অল্প একটু মুখে তুলে বাকিটা রেখে দেয়। মা তার সামনে বসে হাউমাউ করে কাঁদে। সে নিষ্প্রভ হয়ে বসে থাকে। কোনো ভাবান্তর ঘটে না তার মাঝে। দেখতেও তাকে আজকাল লাগে হাড়গিলের মতো। শুকিয়ে হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল ভর্তি অযত্নের দাড়ি। কোটরে ঢোকা বিষণ্ন চোখ।

আসলে বিভা চলে যাবার পর থেকে কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই। আকাশের নতুন চাকরি। সপ্তাহে পাঁচ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা ভার্সিটির ক্যাম্পাসে কেটে যায় তার। রুদ্রর বোনের বাচ্চা হয়েছে, পরিবারের নতুন সদস্যকে বরণ করার জন্য চিটাগাং গেছে সে সপ্তাহখানেকের জন্য। অমৃতা প্র্যাকটিসের পাশাপাশি একটা নতুন কাজে জড়িয়ে গেছে। এনজিও সংক্রান্ত কাজ। উদ্যোগটা ওর সিনিয়রেরই নেওয়া। ইচ্ছেমতো কাজ উসুল করে নিচ্ছেন তিনি অমৃতার কাছ থেকে। তাছাড়া প্রজেক্ট এরিনাটাও পছন্দ হয়েছে অমৃতার। ট্র্যান্সজেন্ডার পিপলদের নিয়ে কাজ। রাত জেগে জেগে প্রজেক্ট প্রপোজাল লেখছে সে। মাঝে মাঝে গ্রুপ ওয়ার্ক করতে হয় কলিগদের সাথে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিটিং চলে, আইডিয়ার আদান-প্রদান হয়। কাজ করতে বেশ লাগে তার।

কাজ নেই শুধু হৃদির। এমবিএ শেষ হলো গত মাসে। চাকরি-বাকরি জুটছে না। রোজ বিকেলে সে সামিকে দেখতে চলে আসে। ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকে। এক তরফা আলাপ চালানোর চেষ্টা করে। এটা-সেটা প্রশ্ন করে সামিকে। সামি বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। আবার হঠাৎ হঠাৎ দিয়েও ফেলে।

একদিন এক কাণ্ড হলো। প্রায় আধাঘণ্টা একচেটিয়া বকবক করে গেল হৃদি কিন্তু সামি একটা বারও মুখ খুলল না। মেঝের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে স্থিরচিত্র হয়ে।

হৃদি দিশেহারা হয়ে একসময় বলল, ‘তুই কোনো কথা বলছিস না কেন? তোর কেমন লাগছে তা তো একবার বল, মনের অবস্থা আমার সাথে শেয়ার কর, দেখবি ভালো লাগবে।’

সামি চুপ। হৃদির কথা যেন তার কানেই ঢুকছে না। হঠাৎ করেই হৃদির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সহ্যের একটা সীমা আছে। সে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, ‘ওই অ্যাসহোলের বাচ্চা! কথা কস না ক্যান?’

সামি নির্বিকার। হৃদি আবার বলল, ‘ওই হারামজাদা, কথা কানে যায় না?

তুই কি কানে কালা? তুই কি বোবা?'

সামি প্রস্তরীভূত, মুখে রা নেই।

হৃদি সাপের মতো ফোঁসফোঁস করতে করতে ঠাস করে একটা আকস্মিক চড় বসিয়ে দিলো সামির গালে। সামি ভীষণ চমকে উঠল। গালে হাত দিয়ে বড় বড় চোখ করে তাকাল হৃদির দিকে। সে চোখে রাগ নেই, ক্ষোভ নেই আছে শুধু সীমাহীন বিস্ময়।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপর হৃদি হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। কান্না সামলাতে দৌড়ে ছুটে গেল বাথরুমে।

সামির আম্মা একদিন অমৃতাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'হ্যারে মা আমার ছেলেটা কি পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? কেমন যেন নির্বোধের মতো চোখ বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকে, কথাবার্তা বলে না। একবার ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?'

অমৃতা সম্মতি দিলো।

তারা বন্ধুরাও কয়েকদিন ধরে একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার কথা ভাবছিল।

ডাক্তার আসলেন। ভালো মতো দেখেশুনে বললেন, চিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। উনি সিভিয়ার ডিপ্রেশনে ভুগছেন। সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। কয়েকটা ওষুধ লেখে দিচ্ছি, এগুলো খেলে উনার ভালো ঘুম হবে। ঘুমটা খুব জরুরি এখন।'

ফুলশয্যার রাতে অভিজিৎ একটা হীরের আংটি হাতে নিয়ে থমথমে গলায় বিভাকে বলল, 'এটা আমার ঠাম্মার আংটি, তোমাকে দিতে বলেছে।'

বিভাকে এ বাড়িতে এসে আরও একবার পুরোদস্তুর বউ সাজতে হয়েছে। শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে, হই হুল্লোড় করে বধূবরণ করেছে বাড়ির লোকজন। এরপর সসম্মানে নিয়ে এসেছে এই বাসর ঘরে। গোলাপ, জুঁই আর বেলিফুল দিয়ে সাজানো ঘর ফুলের গন্ধে ম ম করছে। একটা টিমটিমে কম ভোল্টের ভারি রোমান্টিক আলো জ্বলছে ঘরময়। এয়ার কন্ডিশনের হিম এই ঝুম গ্রীষ্মের রাতে এনে দিয়েছে স্বস্তির বাতাস।

বিভা ফুল ছড়ানো বিছানায় গুটিশুটি হয়ে মাথানিচু করে বসেছিল। অভিজিৎ দাঁড়ানো বিছানার পাশে। তার গায়ে ক্রিম রঙের শেরওয়ানি। মাথায় টোপর। আংটিটা বিছানার পাশ টেবিলে রেখে সে বলল, 'এখানে রাখছি, ইচ্ছে হলে পরে

নিয়ো।'

কথাগুলো বলে অভিজিৎ মাথার টোপর খুলে রাখল। শেরওয়ানি পাল্টে ঘরের জামা পরল। তারপর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

বিভা এদিকে জবরজং সাজ সেজে পুঁটলির মতো ঠেসে বসে রইল বিছানার সাথে।

গতকাল বিয়ের পর থেকেই লোকটার ভাবসাব দেখে গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে বিভার। বিয়ের আগে সে ছিল নিতান্তই সরল, সোজা মেনিমুখো ধরনের একজন মানুষ। আচমকা একটা দুটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলে ফেলত ঠিকই কিন্তু খুব একটা ধার ছিল না ব্যক্তিত্বে। বিভার সাথে কথা বলত সম্মান রেখে। কিন্তু কী আশ্চর্য বিয়ের পর সে মানুষ রাতারাতি পাল্টে গেল। মনে হচ্ছে যেন সে এক নবাবজাদা আর বিভা তার দাসীবান্দি। ভাবটা এমন দেখানো হচ্ছে যেন এ বিয়েতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। হ্যাঁ, মানা গেল শেষটায় বিভা তার পায়ে পড়েছে বিয়েটা করার জন্য। ভেঙে যাওয়া বিয়েটা বিভার কাকুতি মিনতিতে আবার জোড়া লেগেছে। কিন্তু তাতেই কি সে বিভার মাথা কিনে নিয়েছে? একজন ভদ্র মেয়ের সাথে কথা বলার এ কেমন তরিকা?

তাছাড়া লোকটার মা মহিলাটাও বিশেষ সুবিধার নয়। আজ রাতে খাবার টেবিলে তিনি বিভাকে বলেছেন, কাল দুপুরে কিন্তু তুমি রান্না করবে, আমরা নতুন বউয়ের রান্না চেখে দেখব। বিভার বুকটা ভয়ে জমে উঠেছে এ কথা শুনে। বাড়িতে সে কোনো দিন নিজের হাতে রান্না করেনি। শুধু সাজগোজ আর মোটামুটি ধাঁচের পড়াশোনা করা ছাড়া এ জীবনে আর কিছু করেছে কি সে? হ্যাঁ করেছে। মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে নাচটাকে ভালোবেসেছে। বিভা যে খুব ভালো নাচতে পারে তা তো তার শাশুড়ি মা জানেন। কই বললেন না তো, কাল তুমি আমাদের নেচে দেখাবে। যে কাজটা বিভা পারে না, করেনি কোনোদিন সে কাজটিই কেন করে দেখাতে হবে? তাছাড়া একদিনের নতুন বউকে কেউ রান্না করার আদেশ দেয়? কেমন ধারার মানুষ এরা? এ কোথায় এসে পড়ল সে? কী করে কাটবে তার সামনের দিনগুলো এই নিষ্ঠুর, অহংকারী, নির্বোধ মানুষগুলোর সাথে?

বাসরঘরে আসার পর থেকে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে। মনের পর্দায় খানিক বাদে বাদে সামির মুখটা ভেসে উঠছে। আর ভেসে ওঠার সাথে সাথে তার ভেতরটায় ভয়ঙ্কর ধরনের এক প্রলয় বয়ে যাচ্ছে। কেমন যে লাগছে, কী জ্বালায়

যে জ্বলছে এই বুক তা বিভা কাকে বোঝাবে? কে আছে এখানে তার? কেউ নেই। তার বন্ধুরা এখন তার থেকে যোজন যোজন দূরে। একা, সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল বিভা।

অভিজিৎ বাথরুম থেকে বেরিয়ে তোয়ালেটা আলনায় ঝুলিয়ে রাখল। তারপর টুক করে ঘরের বাতিটা দিলো নিভিয়ে। নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেল ঘরটা। বিভা আঁতকে ওঠে বলল, 'একী? বাতি নেভালেন কেন?'

অভিজিৎ নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিলো, 'ঘুমাব তাই।'

রাগে, অপমানে অন্ধ হয়ে গেল বিভা, গলার আওয়াজ আরো বেড়ে গেল তার।

'ঘুমালে ঘুমান, লাইট নিভালেন কেন? আমাকে একটা বার জিজ্ঞাসা তো করবেন! ভীষণ অভদ্র তো আপনি!'

'আপনার লাগলে বাতি জ্বালিয়ে নিন। রাত দুপুরে চ্যাঁচাচ্ছেন কেন?'

বিভা দুচোখে অন্ধকার ছাড়া আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না তখন। সে দিশেহারা হয়ে বলল, 'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, এ তো দেখি ভূতের বাড়ি!'

পরমুহূর্তেই চোখের সামনে আবার সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে অভিজিৎ ধীর পায়ে বিছানায় এসে বসল।

শক্তভাবে বলল, 'ওইদিকে যান, আমি শোবো। আর কী করবেন চটপট করে নিয়ে বাতি নিভিয়ে দিন, আলো জ্বললে আমি ঘুমাতে পারি না।'

সঙ্গে সঙ্গে বিভার কেমন গা গুলিয়ে উঠল। এ লোকটার সাথে একই বিছানায় শুতে হবে তাকে? এত বড় শাস্তি? বিভা এক লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল।

অভিজিৎ একটু শ্লেষের গলায় বলল, 'এমনভাবে নেমে গেলেন যেন আমি একজন অচ্ছুৎ। মনে রাখবেন বিছানাটা আমার। আপনার যদি এখানে শুতে ইচ্ছে না করে তাহলে আপনি মাটিতে কিংবা সোফায় শুতে পারেন। আমি আমার বিছানা ছাড়ছি না।'

বিভা অপমানে জমে গিয়ে ধপ করে সোফার ওপর বসল।

অভিজিৎ পাশ ফিরে শুয়ে হঠাৎ ঠাট্টার গলায় বলল, 'আপনার প্রেমিকটিকে তো আসার সময় দেখলাম না। শেষবারের মতো দেখতে আসলো না যে আপনাকে? বিরহ সইতে না পেরে গলায় দড়ি-ফরি দিলো নাকি আবার? খোঁজ

নিয়েছেন?’

রসিকতার ধরন দেখে বিভা স্তব্ধ হয়ে গেল। তার কান ঝাঁঝাঁ করতে লাগল।

কতটা নিষ্ঠুর হলে একটা মানুষ এরকম সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে? থমকে থাকা কান্নাটা এবার ছুটে বেরিয়ে গেল। চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল মেঝেতে।

এক ছুটির দিনে আকাশ খুব জরুরি ভিত্তিতে ফোন করল অমৃতাকে।

'দোস্ত, মিট কর তো, খুব দরকার।'

ছুটির দিন হলেও অমৃতার তখন কাজের চাপ প্রচুর। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যেই তার প্রজেক্ট প্রপোজাল জমা দিতে হবে। অমৃতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী এমন জরুরি কথা যে এখনই বলতে হবে?'

'বলতে হবে, আয় না তুই।'

'আমি আসতে পারব না, কিছু বলার থাকলে তুই আয় আমার বাসায়।'

ঘণ্টাখানেকের মাঝেই আসলো আকাশ। তখন বিকেল। বাইরে খুব জোর বাতাস। বৃষ্টি নামতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

অমৃতা ওর ঘরে ল্যাপটপ কোলে নিয়ে কাজ করছিল। আকাশ এসেই বলল, 'রাখত এসব আজাইরা কাজ, আমার কথা শোন।'

অমৃতা ভ্রুকুটি করল, 'কী সমস্যা?'

'সমস্যা হইলো তোমাদের এসব আর ভাল্লাগতেছে না, রুদ্র গিয়া বইসা আছে চিটাগাং, সামির বাচ্চা দেবদাস হওয়ার ভং ধরছে, তুমি আছ তোমার প্রজেক্ট নিয়া, আর হৃদি সারাদিন ফ্যাচফ্যাচ কইরা কান্দে, কতদিন চলবে এসব?'

'তুই কি এসব বলার জন্য এসেছিস এখানে? এটাই তোর জরুরি কথা?'

'এটাই জরুরি কথা না বাট এটা ওয়ান অফ জরুরি কথা'স।'

'জরুরি কথাটা বল, তারপর কেটে পড়।

আকাশ সাথে সাথে কিছু বলল না। দাঁত দিয়ে এক দুবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। মাথা নিচু করে নিজের পায়ের নখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর সাবধানে বলল, 'দীপার সাথে গতকাল আমার ডেট ছিল, মানে আ সিরিয়াস ডেট।'

অমৃতা তেরছা চোখে চাইল আকাশের দিকে, তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আমাকে কেন বলছিস এসব? আমি কি জানতে চেয়েছি যে আমার বোনের সাথে তোর ডেট কেমন ছিল?'

'না সেটা তো জানতে চাসনি।'

'তাহলে তুই এসব কেন আমাকে বলছিস আকাশ? দীপা আমার আপন বোন। আর তুই আমার আপন বন্ধু। আমার জন্য তোদের লাভ স্টোরি শোনাটা যে এমব্যারাসিং এটা কি তুই বুঝতে পারছিস না?'

'ভেবেছিলাম তোর সাথেই ব্যাপারটা শেয়ার করা যায়।'

অমৃতা একটু দোনোমোনো করে বলল, 'আচ্ছা বল।'

'ওর সাথে মনে হয় আমার ব্রেকআপ করে ফেলতে হবে বুঝেছিস? আমার শালা লাকটাই খারাপ। জীবনে প্রথমবারের মতো সিরিয়াস একটা রিলেশন হওয়ার চান্স ছিল, এইটাও হলো না।'

'সমস্যাটা কী হয়েছে তা তো বলবি। ব্রেকআপ করবি কেন? রিজনটা কী?'

'রিজন হচ্ছিস তুই।' যন্ত্রের মতো শব্দগুলো উচ্চারণ করল আকাশ, নিশ্বাস বন্ধ করে।

অমৃতা বিস্মিত, 'মানে?'

'মন দিয়ে শোন, গতকাল... মানে গতকাল দীপা আর আমি... দূর শালা ক্যামনে যে কই, মানে আমরা কিস করতে যাইতেছিলাম বুঝছিস? আমার লাইফের ফার্স্ট কিস, ক্যান ইউ ইমাজিন?'

'না অত ইমাজিন করতে আমি পারব না, কথা শেষ কর, ঢং রাখ তুই।'

'তো কিস করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ আমার মনে হল, আমার সামনে আসলে দীপা বসে নাই, বসে আছিস তুই!'

অমৃতার মুখটা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে দেখাল। কয়েক সেকেন্ড স্থবির হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বরফ শীতল গলায় বলল, 'সবকিছু নিয়ে ফাজলামো ভালো না আকাশ!'

আকাশ চোখ নামাল, মৃদু গলায় বলল, 'ফাজলামো না, সত্যি বলছি। দীপার সাথে তোর অদ্ভুত মিল।

'দীপা আমার বোন, মিল তো থাকবেই।'

'হুম সেটাই, মিল তো থাকবেই, কিন্তু কি জানিস কেন যেন মনে হচ্ছিল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। মানে আমি একটা মেয়েকে চুমু খাব আর সে মুহূর্তে আমার অন্য কারও কথা মনে পড়বে, এটা তো ঠিক না। এটা তো দীপার সাথে অন্যায় হবে।'

অমৃতা অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'তোর যা ইচ্ছে কর, আমাকে জ্বালাস না। কাজ

করতে দে।

‘তোর কিছু বলার নেই?

‘না নেই।’

‘শিওর?’

‘হুম’

আকাশের কপাল কুঁচকে যায়। সেকেন্ড দুই সময় কুঁচকানো কপাল নিয়ে অমৃতার দিকে তাকিয়ে থেকে চড়া গলায় বলে, ‘এত ভাব দেখাচ্ছিস কেন?’

‘ওমা ভাব দেখলাম কই? তোর ইচ্ছে করলে তুই থাক দীপার সাথে, ইচ্ছে না করলে ছেড়ে দে, দীপা অনেক স্মার্ট মেয়ে, একটুও ইমোশনাল না। তোকে হারানোর শোকে পাগল হয়ে যাবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।’

আকাশ জ্বলে ওঠে বলে, ‘তাই? অনেক স্মার্ট তোর বোন তাই না? একদম কোল্ড? এপ্যাথেটিক?’

‘আমি তো সেরকমই জানি।’

‘তোর বোন তো তোর মতোই হবে, ঠিক জেনেছিস।’ কথাগুলো তীরের মতো অমৃতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আকাশ।

আকাশ চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত অমৃতা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

অমৃতার ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশ সামির ঘরের দরজায় এসে উঁকি দিলো। দরজা খোলাই ছিল। সামান্য ঠ্যালা দিতেই খুলে গেল। ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। জানালা দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন বিকেলের মরা আলো এসে মেঝেতে শুয়েছে। একটু ঝড়ো বাতাস বইছে বাইরে। বৃষ্টি নামার পূর্বাভাস।

সামি শুয়ে ছিল। ঘুমোচ্ছিল কি না কে জানে পায়ের শব্দ পেয়ে একটু নড়ে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কে এসেছে। দেখে নিয়েই আবার আগের ভঙ্গিতে ফিরে গেল।

আকাশ এগিয়ে এসে জানালার গ্লাস টেনে দিলো। বলল ‘হাওয়া আসছে তো, শীত করছে না তোর?’

সামি উত্তর দিলো না। বিছানায় ওর পাশে এসে বসল আকাশ। সামির চোখ বন্ধ। আকাশের উপস্থিতি যেন সে টেরই পাচ্ছে না। আকাশ বার দুয়েক গলা খাঁকারি দিলো।

‘দুপুরে কী খেয়েছিস?’

সামি নিরুত্তর।

আকাশ ওর পেটে একটা খোঁচা দিয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'দুপুরে কী খেয়েছিস? কিছু খাসনি?'

'না' ক্ষীণ গলায় বলল সামি।

অমৃতার ওপর চড়াও হওয়া রাগটা আরো বেশি ঘনীভূত হলো এ মুহূর্তে। সামি সারাদিন উপোস করছে আর তিনি পাশের ঘরে বসে রাজকার্য সাধন করছেন। দায়িত্বজ্ঞান বলতে কী কিছু নেই নাকি এ মেয়েটার?

'বিকেল সাড়ে চারটা বাজে, এখনও কিছু খাসনি তুই?'

সামি আবারও আগের সুরেই উত্তর দেয়, 'না'।

তার চোখদুটি আধবোজা হয়ে আছে। হাত ভাঁজ করে রাখা বুকের ওপর।

'চল ওঠ, বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।'

সামি মুখ দিয়ে একটা বিরক্তি সূচক 'চ' কারান্ত শব্দ করে ওঠে বলল, 'এখন ভালো লাগছে না।'

হঠাৎ আকাশের মাথায় এক পাগলা ভূত চাপল। আজকে সে একটা বোঝাপড়া করেই ছাড়বে।

'তুই ওঠে বয় তোর সাথে আমার কথা আছে।' শক্তভাবে আদেশ করল আকাশ।

'উফ বিরক্ত করিস না'

আকাশ অদ্ভুত করুণ গলায় বলল, 'তোর কাছে কি বিভাই সব? আমরা কেউ কিছু না? তোর মা দিনের পর দিন চোখের জল ফেলছে তোর জন্য। তোর আব্বা দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারে না। ওদের জন্য একটুও চিন্তা হয় না? তোর কাছে প্রেমটাই সব?'

সামি একটু নড়েচড়ে উঠল। ভাবলেশহীন চোখে তাকাল আকাশের দিকে। চোখদুটোতে শুধুই বিষণ্নতা। আকাশের বুক কেঁপে ওঠে। ওই দুচোখে এমন সীমাহীন বিষণ্নতা আকাশ এর আগে কখনো দেখেনি।

'আব্বা-আম্মাকে বলিস দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আর আব্বা আমার সাথে যা করেছে এরপর আমি কখনোই আগের মতো করে ফিরে যাব না তার কাছে। আমি এখন আর তার পোষ্য নই, আমি আলাদা হয়ে গেছি। না খেয়ে মরে গেলেও আমি তার আশ্রয় প্রার্থী হব না।' সময় নিয়ে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল সামি।

'এটার মানে কী? তুই কোথায় থাকবি? কী খাবি? আর তাছাড়া আন্টি

অনেক কষ্ট পাবেন। কোনো ডিসিশন নেয়ার আগে উনার কথাটা একবার ভাবিস, তুই একমাত্র ছেলে।'

'হ্যাঁ আম্মার জন্যই হয়তো ওই বাড়িতে আমি ফিরে যাব। কিন্তু আগের মতো না।'

আকাশ একটা বড় নিশ্বাস ছাড়ল। সে জানে কথাগুলো বলা যত সহজ করে দেখানো তার চাইতে অনেক বেশি কঠিন।

'তুই বাড়ি ফিরছিস কবে?'

'জানি না।'

'জানি না মানে?'

'আমার একটু সময় লাগবে, আম্মাকে বলিস আমাকে আরেকটু সময় দিতে।'

'তোর আম্মা সময় দিলেও আমি সময় দিতে পারব না।' আকাশকে হঠাৎ দিশেহারা দেখায়। ভারি একরোখা গলায় সে বলে, 'তোকে আমার এ মুহূর্তে চাই। আই ওয়ান্ট মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ব্যাক রাইট নাউ! আই নিড ইউ!'

সামির ঠোঁটে হঠাৎ একটা ঈষৎ বাঁকা হাসি উদয় হলো। বিভার প্রস্থানের টানা দশদিন পর, এই প্রথম তার মুখে হাসি ফুটল।

'হ্যাং অন! হোয়াট ডিড ইউ সে? বেস্ট ফ্রেন্ড?' বলে সামি আগাগোড়া একবার আকাশকে দেখে নিয়ে আবার সন্দেহের গলায় বলল, 'ডিড ইউ সে বেস্টফ্রেন্ড? আমি ঠিক শুনেছি?' এবারে সামি বেস্টফ্রেন্ড শব্দটা বলার সময় দু আঙুল নেড়ে হাওয়ায় কোটেশন মার্ক দেখাল।

আকাশ একটু লাল হলো। চোখে তার হালকা একটু অস্বস্তির প্রলেপ। সে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বলল, 'তুই ঠিক শুনেছিস!

সামির মুখের হাসি এবার চওড়া হলো, ফিচেল গলায় বলল, 'ইফতেখার আকাশ! তুমি আমার সাথে মামদোবাজি করো, না? যখন যারে সামনে পাও তারেই বলো বেস্টফ্রেন্ড তাই না?'

ভারি আশ্চর্য হলো আকাশ, 'এর আগে কোনো দিন কাউকে বলেছি বুঝি?'

'বলিসনি?'

সামির চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই আকাশ দৃঢ় গলায় বলে, 'নাত। 'আমাকেও তো কখনো বলিসনি আগে!'

'আচ্ছা এখন বললাম তো।'

সামি ঠোঁট উল্টে বলল, 'কই বললি? কিছু তো শুনলাম না।'

আকাশ নিরুপায় হয়ে বলল, 'ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড।'

সামি হো হো করে হেসে ওঠে বলে, 'শালা তুই একটা মাদিপোলা।'

'হ, আমি মাদিপোলা, এখন ওঠ বাইরে যাব।' সামি কিন্তু আর না করল না। বিছানা ছেড়ে ওঠে দাঁড়াল।

ঠিক বেরোবার মুহূর্তেই উঠল প্রবল ঝড়। ধুলো উড়তে শুরু করল বাতাসে। বজ্রপাতের প্রকট শব্দে ইট পাথরের বিল্ডিং কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। থরথর করে কেঁপে উঠল জানালার কাচ।

আকাশরা নিচে নেমে গিয়েছিল। ঝড়ের মুখোমুখি পড়ে আবার ফেরত আসলো লিফটের কাছে। ঠিক সে মুহূর্তে দুই মূর্তিকে দেখল প্রায় দৌড়ে গেইটের ভেতরে ঢুকতে। রুদ্র আর হৃদি।

হৃদি হড়বড় করে বলল, 'যে বাতাস! আরেকটু হলে রিক্শাসহ উড়ায় নিয়া যাইত।'

'নিজেকে অত হালকা পাতলা ভাবার কোনো কারণ নাই। তোমার ওজন যে হারে বাড়তেসে, ঘূর্ণিঝড় ইরমা আসলেও তোমারে উড়াইতে পারব না।' বলল আকাশ, তারপর রুদ্রর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'তুই কখন আসলি চিটাগাং থেকে?'

'এইতো আজ সকালে।'

সামি চুপচাপ ছিল। চাপা একটা অস্বস্তি কাজ করছে তার ভেতর। মনে পড়ল হৃদিতা তাকে সেদিন একটা চড় মেরেছিল। এরপর চারদিন কেটে গেছে, হৃদি এর মাঝে আর একবারও আসেনি। এ মুহূর্তে হঠাৎ প্রশ্নটা জাগল মনে, কেন আসেনি হৃদি মাঝের কটা দিন?

আজকে হৃদি সামির দিকে তাকিয়ে শ্লেষের গলায় বলল, 'কী রোমিও? আপনি বাঁইচা আছেন?'

সামি মৃদু গলায় বলল, 'বেঁচে আছি এখনও।

ওরা ওপরে ওঠে আসল। দরজা খুলল অমৃতার আম্মা। হাসিমুখে বলল, 'বাহ আজ অনেক দিন পর তোমাদেরকে একসাথে দেখলাম। ভালো লাগছে দেখে।

ওরা সবাই একটু লাজুক লাজুক মুখে ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকল। বসার ঘরের সাথে লাগোয়া বারান্দাটায় এসে দাঁড়াল ওরা। বারান্দায় দীপা দাঁড়িয়ে ছিল।

ওদেরকে দেখে জীবনে এই প্রথমবার একটু আড়ষ্ট হলো সে। চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল বারান্দা থেকে। আকাশের দিকে একবারও তাকাল না।

রুদ্র ফিসফিস করে বলল, 'এই ছেমড়ির কী হইছে?'

হৃদি বলল, 'সে তো এখন আকাশই ভালো বলতে পারবে। কীরে তোদের প্রেম কেমন চলছে?'

আকাশ উড়িয়ে দিলো কথাটা, 'আরে দূর, বাদ দে এসব কথা এখন।'

মিনিট না গড়াতে অমৃতাও এসে হাজির হলো। খুশিতে মাখামাখি গলায় বলল, 'আরে বাহ! আজকে তো দেখি সবগুলা শয়তান একসাথে হইছে আবার!'

বাইরে তখন উন্মাদ বাতাস। ধুলোর উড়োউড়ি নেই এখন, আছে সোঁদা মাটির ঘ্রাণ। দমকা হাওয়ায় উড়ে গেছে সামনের বাড়ির রোদে শুকোতে দেওয়া তরুণী মেয়ের ওড়না। ঘুড়ির মতো শূন্যে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে কোন দূরদেশে যেন হারাল সেটা। ওরা মেঝেতে বসল। হঠাৎ তীরের মতো শাঁই করে এসে মেঝেতে পড়ল একটা ছোটখাটো টেনিস বল আকারের বরফ।

হৃদি হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, 'ওয়াও! শীলা বৃষ্টি হচ্ছে!'

ওর মুখের কথা শেষ হবার আগেই বাতাসে ছিটকে এসে বারান্দার মেঝেতে ভেঙে চুরমার হতে লাগল একটার পর একটা বরফের দলা।

আকাশ সচেতন গলায় বলল, 'ভেতরে যা সবাই, গায়ে শীল এসে পড়লে ব্যথা পাবি।

ওর কথাটা কেউ তেমন পাত্তা দিল না। সবাই শীল কুড়ানোতে ব্যস্ত হয়ে গেল। অমৃতা একটা পাত্র নিয়ে আসল কুড়ানো শীল জমাবে বলে। হৃদি খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, 'এ বরফ মুখে লাগাইলে একটা ব্রণও থাকবে না।'

অমৃতা বাঁকা গলায় বলল, 'তাই না? কোন বিশিষ্ট কবিরাজ বলেছে এটা আপনাকে?'

'আমার দাদু বলতেন।

একটু বাদে শিল পড়া বন্ধ হলো। আকাশ থেকে ঝড়তে শুরু করল সাদা সুতোর মতো বৃষ্টি।

রুদ্রর যেন হঠাৎ করেই মনে পড়ল, খুব জরুরি গলায় আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠল, 'ও দোস্ত তোদেরকে তো আমার একটা নিউজ দেওয়াই হয় নাই।'

শুনে সবাই উৎসুক চোখে তাকাল তার দিকে। হৃদি প্রশ্ন করল,

'তোরা কি জানিস, মনীষা যে সিঙ্গেল?'

‘মানে?’ প্রায় চিৎকার করে ওঠে আকাশ।

‘মানে শি ইজ ডিভোর্সড।’

‘আসলেই?’

‘আসলেই। সেদিন কী হইছে শোন...’

‘কী নিউজ?’

এরপর প্রায় মিনিট দশেক সময় ধরে চলল মনীষা বিষয়ক আলোচনা। একসময় আকাশ বলল, ‘এই মনীষা দেখতে কেমন? ছবি টবি আছে তোর কাছে?’

‘আছে তো!’ বলে রুদ্র ফেসবুক ঘেঁটে মনীষার একখানা ছবি বের করল। যে ছবিতে মনীষার পরনে একটি কালো হাফসিল্ক শাড়ি। চুল খোলা পিঠময় আর চোখে কাজল।

অমৃতা দেখে বলল, ‘মামা মহিলাতো অনেক জোস!’ আকাশও যোগ করল, ‘আসলেই শি ইজ সুপার হট!’ এ মুহূর্তে আকাশের মুখখানা দেখে মনে হলো মনীষার হটনেসের জ্বালায় সে মারা যাচ্ছে।

সামি কথাবার্তা বলছে কম। তবুও তার চলন-বলন আজ অনেকখানি স্বাভাবিক। তাকেও ছবিটা দেখাল আকাশ, সে হালকাভাবে বলল, ‘শি ইজ প্রিটি!’

এমন সময় অমৃতার এন্ড্রয়েড ফোনে বিভার ফোন আসলো। সে ফোন করছে স্কাইপে। এনসার বাটন প্রেস করতে না করতেই সবাই আনন্দে হইহই করে উঠল। ফোনের স্ক্রিনে বিভার মুখ ভেসে উঠল। তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি। চোখদুটো একটু ম্লান আর বিষণ্ন। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে নজর কাড়ছে তার সিঁথি ভর্তি লাল সিঁদুর। ওকে দেখতে পেয়েই অমৃতা বলে উঠল, ‘কী বিবাহিতা মহিলা? খবর কী আপনার?’

বিভা ওপাশ থেকে বলল, ‘এই শোন, নেক্সট মাসে মা বাবা আসছেন কলকাতায়। এক কাজ কর না, তোরাও চলে আয়। প্লিজ দোস্ত, খুব মজা হবে।’

কথাটা সবার খুব মনে ধরল। অমৃতা বলল, ‘নেক্সট মানথ একটু বেশি তাড়াহুড়া হয়ে যায়, তবে কথা দিচ্ছি আসব।’

বিভা বাচ্চাদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, ‘না না, পরের মাসেই আয়, তোদের দেখতে না পেলে আমি মরে যাব।’

‘এইতো দেখছিস আমাদের এই যে’ বলে আকাশ দাঁত বের করে হাসি দিলো।

'রাক্ষসের মতো দেখাচ্ছে তোকে আকাশ, মুখ বন্ধ কর!' ধমকে ওঠে বিভা। আকাশ মুখ বন্ধ করে না, আরও বেশি করে দাঁত কেলিয়ে হাসে।

বিভার ফোন পেয়ে সবাই এত বেশি উচ্ছ্বসিত যে কেউ লক্ষ্য করল না সামির মুখে ধীরে ধীরে রক্ত জমে উঠছে। রাগ, উত্তেজনা, ক্ষোভ সব একসাথে উথলে উঠছে তার ভেতরে। বুকটায় বড্ড দাপাদাপি।

সে চট করে সবার অগোচরে ওঠে পড়ল জায়গাটা ছেড়ে। হনহন করে সোজা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে আসলো। টানা দশদিন গৃহবন্দি থাকার পর তার এই প্রথম বহির্গমন।

বৃষ্টিতে তখন চারপাশ সাদা। রাস্তায় প্রায় হাঁটুজল। বড় রাস্তার মোড়ে গাড়ি আর রিকশার বেজায় ভিড়। ময়লা, কালো হাঁটু পানি কেটে কেটে হনহন করে হাঁটতে লাগল সে। তার বুদ্ধি এ মুহূর্তে স্থির নেই। মনের ভেতর নিজের সাথে নিজের চলছে যুদ্ধ।

বিভা তাহলে ভালো আছে। ওর ওই কপাল ভর্তি সিঁদুর আর মুখের এক চিলতে হাসিই সে ভালো থাকার প্রমাণ। অথচ এদিকে বোকা আর পাগল সামি নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে, নাড়ির সম্পর্ক ছেড়ে ব্রহ্মচারী হলো। নিজের মুখে নিজের থুতু মারতে মন চায় ওর। ঘেন্নায় কুঁকড়ে যায় সারা মন।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা গলার আওয়াজ পায় সে। একটা চেনা গলা ডাকছে তাকে, 'সামি, এই সামি' সামি থমকে দাঁড়ায়, পেছন ফিরে অবহেলায় তাকায়। হৃদি এগিয়ে আসছে তার দিকে, বৃষ্টিতে ভিজে, রাস্তায় জমে থাকা পানি মাড়িয়ে।

ওকে দেখে সামি বাস্তবিকই ভীষণ বিরক্ত হলো। তারস্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'কী চাই? বৃষ্টিতে বের হয়েছিস কেন?'

'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'জানি না, আমাকে একটু একা থাকতে দে।'

হৃদি ততক্ষণে সামির কাছাকাছি চলে এসেছে। ঝাপসা চোখে সামির বিষণ্ন চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে সে নরম গলায় বলল,

আমি তোর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি দোস্ত, কিন্তু এভাবে নিজেকে আর কতদিন কষ্ট দিবি?'

সামি নিজেকে আর সামলাতে পারল না, চিৎকার করে বলে উঠল, 'না বুঝতে পারছিস না। তোরা কেউ বুঝতে পারছিস না যে আমার সাথে বিট্রে করা

হয়েছে। আই ফিল বিট্রেড!’

হৃদি এ চিৎকারের মুখে পড়ে একটু হকচকিয়ে গেল। ধড়ফড় করে উঠল বুক। সে মরিয়া হয়ে বলল, ‘সামি, লক্ষ্মী বন্ধু আমার! আমার দিকে তাকা, একটাবার তাকা!’

সামি তাকাল না। রাগের চোটে বড় বড় নিশ্বাস ফেলে ফুঁসতে থাকল অন্যদিকে তাকিয়ে।

হৃদি ওর মুখটা দুহাতের মাঝখানে ধরে নিজের দিকে ঘোরাল, তারপর গভীর গলায় বলল, ‘তোর মনে আছে? রবিন যেদিন আমার সাথে ব্রেকআপ করেছিল, তুই সেদিন আমাকে কী বলেছিলি?’

সামি অস্থির দৃষ্টি দিয়ে দেখে হৃদির মুখটা। তার মাথার ভেতরটা বড্ড এলোমেলো। কিছু সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে।

‘তুই বলেছিলি আমি যেন রবিনকে ভুলে যাই, কারণ তোর বিশ্বাস একদিন আমি আবারও ভালোবাসতে পারব। সত্যিকারের ভালোবাসা। মনে আছে? তুই যে বলেছিলি এ কথা?’

সামি ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তার মনে পড়েছে।

হৃদি একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, ‘আজকে আমিও তোকে একই কথা বলছি, যা হয়েছে সব ভুলে যা। আমার মন বলছে তুই আবার নতুন করে কাউকে ভালোবাসতে পারবি। দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে।’

‘সামি নিষ্পলক চেয়ে রইল হৃদির দিকে, অনেকক্ষণ অবধি কোনো কথা বলল না। বৃষ্টি ধরে এসেছে তখন কিন্তু বাতাসের ধার কমেনি। দাপুটে বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে হৃদির পরনের ওড়না। সামির ভেজা চুল থেকে টুপ টুপ ঝরে পড়ছে বৃষ্টির জল ওর নিজের গালে, গলায় আর শার্টের কলারে।

একটা সময় সামির বুক চিরে ভারী একটা নিশ্বাস বেরিয়ে গেল। হৃদির চোখে চোখে চেয়ে সে কেমন অদ্ভুত বিষণ্ণতা নিয়ে বলল, ‘আমার আর হবে না রে! আগের মতো করে আর কিছুই হবে না!

(প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি)